

‘ভক্তি’

ধর্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা ।

(১৫শ বর্ষ)

(১৩২০ ভাদ্র হইতে ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ।)

ভক্তিভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম পরমিতী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তিভক্তস্য আবেশম্ ॥

সম্পাদক

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি ।

হাওড়া, পোঃ—আন্দুলমোড়ী,

ঝোড়ু— “ভক্তি” নিকেতন

হইতে

ভক্তমণ্ডলী কর্তৃক প্রকাশিত ।

বার্ষিক মূল্য সড়াক ১৯০ দেড় টাকা ।

নমুনা ৮০ তিন আনা ।

দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে

শ্রীম্ভোষ চন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত ।

শ্রীশ্রীরাধাবরণো জয়তি ।
পঞ্চদশ বর্ষের সুচীপত্র ।

—:—

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী ।)

বিষয় ।	লেখক ।	পত্রাঙ্ক ।
মঙ্গলাচরণম্ । (সংস্কৃত)	প্রাচীন ।	১
প্রাণের কথা ।	সম্পাদক ।	২, ৪১, ৮৯ ১১৩,
আশীষ । (পদ্য)	শ্রীমতি রানী দেবী ।	৩
জাতীয়তা কোথায় ?	শ্রীযুক্ত বিশিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন ।	৪
ঐক্যচৈতন্য । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত মন্থ মথন সরকার ।	৭
নিবেদন । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র ভূষণ বিদ্যাবিনোদ ।	৮
পদকার কবি ঈশ্বরচন্দ্র ।	শ্রীযুক্ত কালীহর দাসবহু ভক্তিসাধন ।	৮
শারদীয়া আবাহন ।	শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	১১
নববর্ষ আবাহনে, বুদ্ধ শ্রীজগদ্বাল্লভ শর্ম্মার স্বদত্তঃ বহুত্ব ।		১৭
শ্রীধৃতীর অঙ্গকথা ।	শ্রীযুক্ত—	২১, ৩০, ৬৬
মুরলীতানে । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ ।	২২
মুক্তি ও ভক্তি ।	শ্রীযুক্ত অনুজ্ঞা সরকার, এম, এ, বি, এল,	২৬
মানব জীবনের উদ্দেশ্য ।	শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ ভারতী ইত্যাদি	৩০
ভক্তের ব্যাধি ও বিপদ ।	শ্রীযুক্ত সত্য চরণ চন্দ্র, উকীল	৪৩
আবাহন কি বিসর্জন ।	শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ ভারতী ইত্যাদি	৫০
গোপাল । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে দাস ।	৬৫
বীণীর আবাহন । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ ।	৭২
হত্যাশেষ আবাস । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত নকড়ি রায় গুপ্ত ।	৭৩
স্বিকৃতি । (পদ্য)	প্রভুপাদ শ্রীল নিত্যানন্দ গোস্বামী ।	৭৩
ঐগন্ধের মোহ ও সংসঙ্গ প্রভাব ।	শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস, পাঠক ।	৭৪

বিবর ।

লেখক ।

পত্রাঙ্ক ।

পল্লীবাণীর প্রতিবাদ ।	শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী ।	৭৮
নাগল রাধামাঘবের সমালোচনা ।	শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বহু ভক্তিসাগর	৮১, ১০৫, ১৭০
মুখ্যাতি । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।	৮৮
অনুবোধ । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ ।	১১
বিভূ । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত দিরঞ্জয় ঘোষ কবিবর্ধ	১২
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।	শ্রীযুক্ত দিগন্ত নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ।	১৩
শ্রীকৃষ্ণ কথামৃত ।	শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে দাস ।	১০১, ২০১
শ্রেণিত পত্র । (প্রতিবাদ)	শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র দাস ।	১০৫
ভক্তির সাধন ।	শ্রীযুক্ত অনুজ্ঞা সরকার এম, এ, বি, এল, ।	১০৭
দীনবন্ধু জীবনী ।	শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।	১১৪
জ্ঞান ও ভক্তির একতা প্রণয়ন ।	শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য্য	১২১, ১৬৪,
শ্রী শ্রীরাধাগোবিন্দের হোলী (পদ্য)	শ্রীযুক্ত মধুসূদন সাহা দাস ।	১২৬
অকিকন কৃষ্ণ ভক্ত । (পদ্য)	শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য ।	১২৭
শ্রীগৌরোদয়ের মোহনরূপ । (গীতিক)	শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে দাস ।	১২৯
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।	শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার	ভক্তিরত্ন । ১৩০, ১৭৭
একটি প্রাচীন কিশোরী	শ্রীযুক্ত হরিন্দাস গোস্বামী	১৪৫
কর্তৃত্বজ্ঞ সম্পাদকে বৈষ্ণব সম্পাদক বলিয়া ভ্রম ।	শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী ।	১৫০, ১৮৩, ১৯৪
প্রাপ্তি নীকার ও সংকল্প সমালোচনা ।	সম্পাদক ।	১৫৮
সম্পাদকের বক্তব্য		১৬০
নব বর্ষ আরাধন ।	শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাকান্ত তত্তরত্ন, স্মৃতিভূষণ ।	১৬১
মালা ও তিলক ।	সম্পাদক ।	১৬৪
রাধা ও গোপীকায় আত্ম সমর্পণ ভক্ত ।	শ্রীযুক্ত রাম সহায় বেনাড শাস্ত্রী কাব্য-	তীর্থ । ১৮২
শ্রীল বজ্র সাধু ।	শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য	২০০
পতিভেদ প্রাণোচ্ছ্বাস ।	শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে দাস ।	২০৭

শ্রীশ্রীগৌরানন্দের নিকট প্রার্থনা। (পদ্য)	সম্পাদক	২০৯
জ্ঞান ও ভগবান।	শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর	২১০
মহৎ ধর্ম।	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র সারস্বত শাস্ত্রী	২১৭
মান্য প্রভাব।	শ্রীযুক্ত পদ্ম চরণ চন্দ্র, উকীল।	২২৪
বৈষ্ণব ব্রত তালিকা। (১৩২৪)	সম্পাদক “ভাগবত ধর্মমণ্ডল।”	২২৮
শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমপ্রচার (পদ্য)।	শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র ভূষণ বিদ্যা- বিরোচি।	২৩১
কাম ও প্রেম।	শ্রীযুক্ত নজ্জের কুমার সরকার	২৩৪
ভারতে ধর্ম-বিশ্বব ও শ্রীগৌরানন্দ প্রভাব।	শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র সরকার	২৩৯, ২৬০,
বর্ষশেষে বক্তব্য।	ভক্তি কার্যাবলী	২৫৭
শ্রীশ্রীমদ্ব্যংগের পিতৃবিয়োগ	শ্রীযুক্ত হরিন্দাস গোস্বামী	২৬১
প্রাণের উচ্ছ্বাস (পদ্য)	শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে	২৭১
অপূর্ণ্য রামধর্ম (পদ্য)	শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে	২০২
কলিকালের মাহাত্ম্য (পদ্য)	শ্রীযুক্ত ভবানী চন্দ্র সাহা	২৭৩
চন্দ্রশেখর প্রতিবাদের আলোচনা	শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর	২৭৫
স্বাধু নিন্দা মহাপাপ	শ্রী—	হঃধী। ২৭৮

শ୍ରীশ୍ରীরাধାବମণୋজୟতি ।

ভক্তি ।

(পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র মাস, ১৩২৩ ।)

(শ্রীশ্রী জন্মাষ্টমী ।)

—•—

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী ।

ভক্তিরানন্দরূপা চ নাস্তিভক্ত্যাঃপরং পদম্ ॥

—•—

মঙ্গলাচরণম্ ।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুম্মতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিপ্রিয়ম্ ।

হরিঃ পুরটমুন্দরদ্ব্যতিকদম্বসন্দাপিতঃ

সদা হৃদয়কনকরে ক্ষুরত্ব বঃ শচীনন্দনঃ ॥১॥

বহীপীড়াভিবামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগুণং

কঙ্কাক্ষং কামুককণ্ঠং স্মিতম্ভগমুখং স্বাধরেণ্যস্তরেণুম্ ।

শ্যামং শ্যান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্য

বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতরতং ব্রহ্মগোপালবেশম্ ॥২॥

অদ্বৈত প্রকটীকৃতো নরহরিপ্রেষ্ঠ স্বরূপপ্রিয়ো

নিত্যানন্দসখা সনাতনগতিঃ শ্রীরূপহৃদকেতনঃ ।

লক্ষ্মীপ্রাণপতিগদাধররমোল্লাসী ভগমাখভূঃ

সাক্ষোপাঙ্গ সপার্ষদঃ সদয়তাং দেবঃ শচীনন্দনঃ ॥৩॥

বাক্সাকল্পতরুভাষচ রূপাসিদ্ধভ্য এবচ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥৪॥

প্রাণের কথা ।

—:—

নামের তব গোবিন্দ কলৌড়তঃ শতধিকং

দশাত্ম্যচ্চারণাম্মুক্তিং বিনাপ্যষ্টাঙ্গ যোগতঃ ।

বিচিহ্ন্যানি বিচের্যানি বিচার্য্যানি পুনঃ পুনঃ

রূপংস্য ধনানীষ ত্য়ামানি ভবন্ত য়ে ॥

দয়াময় শ্রীগোবিন্দ ! এই যোর কলিযুগে কলি-কলুষিত হৃদয় জীবের অত
তুমি নামাভাবে তোমার মহিমা প্রকাশ করিয়াছ । তোমা হইতেও যে, তোমার
ভুবন-মঙ্গল নাম বড়, তাহার সহস্র সহস্র প্রমাণ তুমি দেখাইয়াছ । তোমার
প্রতি বাহার অঙ্ক ভক্তি নাই, তোমার প্রতি বাহার ভালবাসা নাই, সেই সকল
অশ্রেয়িকজনগণকে শিক্ষা দিবার জন্য তোমার নাম করিতে, পাণী, তাপী, আচণ্ডাল
আদি করিয়া সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছ । তুমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছ যে,
নাম-বলে সর্বপ্রকার পাপেরই ক্ষয় হইয়া থাকে, নামে হৃদয়ের দুর্কাসনা হুটিল
কপটভাদি দূর হইয়া যায় ও যাবতীয় অন্ধকার বিনাসপ্রাপ্ত হয় । আবার নাম
বলেই তোমাকে লাভ করিবা তোমার সচ্চিদানন্দধন নবকৈশোর-নটবর মোহন
মুরতি দর্শন করিয়া তোমার প্রেমধনে ধনী হইতে পারে । তুমি দয়া করিয়া এত
শক্তি নামে দিয়াছ কিন্তু আমার এমনই হৃদেই যে, তোমাতেও ভালবাসা হইলই
না, অধিকন্তু তোমার এমন নামেও বিশ্বাস জন্মিল না । দয়াময় গোবিন্দ ! আমি
এই ভাবেই কি থাকিব ? দীন দয়াল । এই অধম দীনবীনকে যদি দয়া না
কর তবে যে তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক হইবে ? প্রভো ! তোমার ভুবন-
মঙ্গল অমীরা-মধুর নামে রুচি দাও, আর তোমার নাম লইয়া যেসকল মহাত্মা
কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ করিবার, তাঁহাদিগের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ
করিবার উপযুক্ত শক্তি ও বিশ্বাস দাও । সময় সময় যদিও প্রাণে প্রাণে যেন
বলিয়া দেয় যে, “জীব তোমার নিজ শক্তিতে কোন কাৰ্য্যই হইবে না, সকলই
সেই সৰ্ব্বনিয়ন্তা পরমপুরুষ পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছা” তথাপি যেন কি
এক মোহে পড়িয়া সকল ভুলিয়া যাই, তোমার সে অমোঘ তত্ত্ববাণী শুনি না ।

দীপনাথ !- আজ তোমারই মঙ্গল ইচ্ছায় তোমারই চিত্ত-মোহিকা “ভক্তি”
পঞ্চদশ বৰ্ষে পদ্যপৰ্ণ কৰিল, আমাকে প্ৰাণে প্ৰাণে শিখাইয়া দাও যে, তোমার
সেবা পূজায়, তোমার মঙ্গল-ইচ্ছা পূৰ্ণপূৰ্ণৰ উপযোগী কি ভাব, এবং কি ভাবে
কি ভাষাতেইয়া তোমাকে ডাকিব, তুমি না শিখাইলে আমাকে আর কে
শিখাইবে। তোমাকে কি বলিয়া ডাকিতে হয়, আমিহো তাহা কিছুই জানিনা;—

কি ব'লে ডাকিব ডাকিতে জানিনা কি ব'লে ডাকিলে পাইবে তনিতে।

(আমি) ডাকিব মত ডাকিভাষ যদি দেখা দিতে তুমি হাসিতে হাসিতে ॥

ডাকিবার মত যে তোমাৰে ডাকে,

তাৰে তুমি দেখা দিবে থাক ডেকে,

(আমি) ডাকিতে জানিনা ব'লে কি হে নাথ, পাব না তোমার ঐশ্বৰ্য-হেৰিতে ॥

কি ব'লে ডাকিলে তনিতাৰে পাও,

প্ৰাণে প্ৰাণে আমায় ডাকিতে শিখাও,

(আমি) তাই ব'লে ডাকি ওহে কমলাখি যা ব'লে আমাৰে শিখাবে ডাকিতে ॥

ঐশ্বৰ্যমেশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য।

আশীষ।

—:—

উষাৰ আলোক যবে ফুটে ধীৰে ধীৰে,

নীলাকাশ গিরি সিঁদু তটিনীৰ নীৰে,

‘দেখি যত সৌন্দৰ্য্য অপাৰ

সেত শুভ আশীষ তোমাৰ’!

সন্ধ্যাৰ আধাৰ টুকু যবে মেমে আসে,

শত দীপ জলে উঠে সঁজৈৰ আকাশে

ছায়াপথে খেলে তারকার,

সেও শুভ আশীষ তোমাৰ !

এ জীবন ভরা আছে কত সুখ দুঃখ,
উঠিতে পড়িতে হায় ভেঙ্গে যায় বুক,
যত হেথা তাগি অক্ষয়
সবি প্রভু আশীষ তোমার ।

শ্রীমতী রাণী দেবী ।

“জাতীয়তা কোথায়”

(শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন লিখিত ।)

— :: —

“ভজ গৌরাজ কহ গৌরাজ লহ গৌরাজ নামরে ।

যেজন গৌরাজ ভজে সেই সে আমার প্রাণরে ॥”

ভাই বাঙ্গালি ! যদি গৌর না ভজিলে তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? তোমার জাতীয়-গৌরব-মণি গৌরগুণমণি তোমার ঘরের ছেলে,—তোমার সমাজের ছেলে । যদি তুমি তোমার ঘরের ~~ছেলের~~ গুণ বিস্মৃত হইয়া, পরের ছেলের আদর কর, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ?

বাঙ্গালীর—বাঙ্গালী জাতির যদি কিছু গৌরব করিবার সামগ্রী থাকে, দীন। স্বজাতির যদি একটুও প্রাণ থাকে, এবং স্বাধার উন্নতাদর্শ-চরিত্র হইতেই বঙ্গ ভাষায় “চরিত” লেখার সৃষ্টি ও ভাষার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তাঁহাকে যদি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে না পারিলে, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ?

বাঙ্গালার শীর্ষস্থানীয় নবদ্বীপ নগরে যে একটি ছেলে অবতীর্ণ হইয়া হরিনামের-বন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ প্রাণিত করিয়া ছিলেন, বর্তমান সময়েও মৃদুর আমেরিকায় পর্যন্ত স্বাধার বহু তরু বিরাজ করিতেছেন, যদি তুমি তাঁহাকে না ভজিলে তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ?

ভারতে এ পর্যন্ত যত অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন, আর কোন অবতারই স্বদেশে একটু হন নাই । কলিয় প্রথম মক্যায় গোলকবিহারী স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাজ রূপে পতিত-পাবনী হরিভক্তি-প্রদায়িনী মুরদুলী ভীরে নবদ্বীপ নগরে

অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশের,—তথা ভারতের যে হৃদয়! মোচন করিয়াছিলেন, তাহা বড় বেশী দিনের কথা নয়। তিনি যে আমাদের মত মায়ামুক্ত জীবের নিকট হইতে অশ্রুত হইয়াছেন তাহা এখনও চারিদিক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। তোমার আমার সৌভাগ্যবান উজ্জ্বল দশম কি দ্বাদশ পুরুষ তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তবে কেন তুমি তাঁহাকে না ভজিয়া বুধা কাল কাটাইতেছ? জাতীয়তা হারাইতেছ?

তিনি আমাদের হৃগতি দর্শন করিয়া কত কান্নিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এতই হৃদয়! যে, তাঁহার স্নেহ একবিন্দুও কান্দিতে পারিনা। যিনি আমাদের ঘরে ঘরে থাইয়া আচণ্ডালে দয়া করিয়া হরিনাম বিলাইয়া জীবকে ধন্য করিয়াছেন, যদি আমরা তাঁহার এই মধুর চরিত্রে আকৃষ্ট না হই, তবে আমাদের জাতীয়তা, আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়?

এ পর্যন্ত ভারতে বত বত অবতার হইয়াছেন, খ্রীঃগোবিন্দ অবতারের মত এমন প্রেমাবতার আর কখনও দেখিয়াছি কি? অন্যযুগে অস্ত্রাদি সহযোগে রক্তপাত করিয়াও যে কার্য সাধিত হয় নাই, এ যুগে তিনি কেবল প্রেম-ধারা সেই কার্য সাধন করিয়াছেন। ঐ শুন বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন;—

“রাম আদি অবতারে, জোখে নানা অস্ত্র ধরে, অস্ত্রাদি করিল সংহার।

এবে অস্ত্র না ধরিল, শ্রীকৃষ্ণ করেও না মারিল, প্রেম দিয়ে করিল উদ্ধার।”

পৃথিবীতে কি এমন প্রেমের ঠাকুর আর কখনও হইয়াছে? যদি তুমি এমন প্রেমের ঠাকুর না ভজ, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায়? ❊

এবার তিনি “মার” থাইয়া কলি-কলুষাক্রান্ত কামিনী-কাকন-স্নতত হৃদয় জীবকে নিজ-কপা-বারি বর্ষণে উদ্ধার করিয়াছেন। কত শত গলিতকূট রোগীকে, কত শত মহাপাণী দহা তত্ত্বকে এবং কত শত শত মারাবাদী সম্রাসীকে প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন দয়ালু ঠাকুরকে ফেলিয়া, তুমি আর কাহাকে ভজিবে ভাই?

অগৎ সৌন্দর্যের পিয়ালী। সকলেই সৌন্দর্যের মোহে বিমুগ্ধ হয়। আমার প্রেমের ঠাকুরটী এবার গলিত কাকন-ধারা গায়ে মাখিয়া ভুবন-মোহন বিব-মাতাম সৌন্দর্য লইয়া অগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এমন বিবমাতাম রূপ এবং সৌন্দর্যের একীকরণ ও সমীকরণ আর কোন্ অবতারে হইয়াছিল? যদি

এমন সোণার মানুষ হাতে পাইয়াও তুমি না ভিজিলে, তবে তোমার মন্দ ভাগ্য তির্য আর কি বলিতে পারি ?

তাই বাঙ্গালি ! এখনও কি তোমার পানের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ? এখনও কি তোমার নিজের দোষ তুমি নিজে বুঝিতে পার নাই ? ঘরের ঠাকুর না পুজিয়াই, তোমার এত দুঃস্বপ্ন হইয়াছে ।

তাই ! যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন ? এতদিন ধরিয়া আপন ঘরের ঠাকুর না পুজিয়া যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে । আর কেন অপরাধের মাত্রা বাড়াইতেছ ? এক্ষণে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কৃত-কর্মের জন্য কান্দ, তাহার পদে আশ্র-সমর্পণ কর । নতুবা তোমার কিছুতেই মঙ্গল নাই ; এই পাপেই তুমি রসাতলে যাইতে বসিয়াছ, আরও বাইবে ।

অতএব তাই বাঙ্গালি ! সময় আছে, এখনও ঘরের ঠাকুর, বাঙ্গালীর আরাধ্য ঠাকুর, শ্রীগৌরদেব মহাপ্রভুকে ভজিতে শিখ, জাতিগত বিবেচ ও হিংসা একেবারে ভুলিয়া যাও, প্রাণভরিয়া ঐক্যমন্ত্রে প্রাণগৌর বলিয়া ডাক, কান্দ । আবার ভারতে ধর্মের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিবে । আবার ভারতের নার্কজনীন প্রেম-ধর্মের মোহনমন্ত্রের স্রমধুর ধ্বনিতে সুপ্ত ধর্ম-জগৎ জাগ্রত হইয়া উঠিবে । আবার তাই ! সপ্তকোটি-কণ্ঠ-নির্মানিত প্রাণগৌর শব্দে প্রহুলা বরনী মাতিয়া উঠিবে । কেন আর গোপ-কবিত্ত্ব ? বিলম্ব করিও না । অবিলম্বে বিলম্বের শিরে শত ব্রজ ভাজিয়া পড়ুক । এস, তাই ! ঐক্যমন্ত্রে লব্ধ্যকর্মে, ঐক্যতানে গৌর নাম গাহিয়া ধন্য হই এবং অগতকে ধন্য করি । এস, আপনি মাতিয়া জগৎ মাতাই, আপনি কাঁদিয়া জগৎ কাঁদাই । এস, আমরা আতুল কণ্ঠে মিলিত স্বরে জগতের দ্বারে দ্বারে যাইয়া ঘোষণা করি,—

“ভজ গৌরাজ কহ গৌরাজ লহ গৌরাজ নাম ।

যে জন গৌরাজ ভজে সেই সে আমার প্রাণ ॥”

যদি ইহা করিতে না পার, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? মনে রাখিও,—কেবল বক্তৃতার ছজুপে বা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় মনোবিন্দু ব্যয়ে জাতীয়তা রক্ষা হয় না । জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে, তোমার জাতীয় সম্পত্তি বৈকব-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা কর । তোমার ঘরের ছেলের ভব গাছিতে শিখ, বাঙ্গালীর ঠাকুর, তোমার ঘরের ছেলেটি কি বস্তু তাহা জানিয়া

রাহ। তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাস ; মন দিয়া ভজ । যদি তাহা করিতে
ন্য পার, তবে তোমার জাতীয়তা কোথায় ? ভাই,—

“হর নাই হবে না এমন অবতার ।

সর্ব অবতার-সার গৌর অবতার ॥”

অতএব আর কেন ভাই ভুলিয়া আছ, গৌর ভজ, গৌর নামে মজ, জীবন
ধন্য কর এবং আপনাপন জাতীয়তা রক্ষা কর । জয় গৌর ।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ।

—:—

শ্রীরাধার প্রেমে মুগ্ধ বনমালী, বংশীধারী হরি,
পীতধড়া শিখিপুচ্ছ বনমালা বংশী পরিহরি,
ভেঙ্গাগিমে শ্যাম-রূপ ভেঙ্গাগিমে শ্যামের মরম,
ভ্যজিয়ে বৈকুণ্ঠধাম দেখাইতে প্রেমের চরম
অবতীর্ণ হ'লে হরি গৌর দেহে নবদীপ মাকে
শিখাইতে জনগণে প্রেম-ভক্তি-নিষ্ঠা বিশ্বরাজে !
তাই আজ মজুকণ্ঠে উষ্ণিয়াছে ঐ হরিরোল
তাই করে হৃদ'য়ন ; পুলকের পাগল-হিঙ্গোল
খেলে যায় সর্বদেহে, হ'বাহ ভুলিয়ে বুঝি তাই
জোমের মোহন-হৃদে ঘন ঘন নাচিছ কানাই !
কত শান্তি কত তৃপ্তি কত না আনন্দ মিলে হেথা
বেধা হরি-সঙ্কীর্ণন, বেধানেতে হয় কৃষ্ণ-কথা ।
সর্বভ্যাগে কত হৃথ, কত হৃথ হরিনামে করে
শিখাইলে সঙ্কীর্ণনে ; ভক্তি মুক্তি দিলে আপামরে ।
আর শিখাইলে মাধ, বুধা যত পাণ্ডিত্য-বড়াই
বুধা তর্ক, বুধা জ্ঞান, ভক্তি শুধু জীবেরে ভরায় ।
এই বিশ্ব-পারাবারে “নাম” মাত্র দিলে কণ-মাকৈ,
কবে দিলে প্রেম-বীজ অস্ত্রিমে মিলাতে শ্রামরাজে !

দীন—শ্রীমদ্বৈত মধন সয়কায় ।

নিবেদন ।

—:~:—

নাশি কাঁজে সারাদিন থাকি আনমনে,—

সংসার লইয়া থাকি ছাড়িয়া তোমায় ।

তাব'লে কি হে বঁধু ? যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে,

বাঁধা আছি প্রাণে প্রাণে তোমায় আমার

যাবে গো ছিড়িয়া ? নাকি যে মধু-মুরতি

আমার মলিন এই হৃদয়ের মাঝে—

আপনি দিয়াছ আঁকি, ওগো প্রাণপতি ।

লবে তা' সরায় ? কথা স্মরি মরি লাজে ।

তব দরশন ভীত কুণ্ঠিতার দেহ'

খুলিয়া গুণন কান্ত ! স্নান মুখ চুমি'

আপনি উজ্জলি দেছ প্রেমসিদ্ধ হৃদে ।

কৈদে মরি, ভাবি "কৃত ভালবাস তুমি" ।

যত আমি চা'ব লাখ ! তোমার এ' বাঁধন খুলিতে

আরও বৈধ' প্রেম-ডোরে ; তব তোমা' দিওনা ভুলিতে ।

শ্রীগোপেন্দু ভূষণ চিন্তাবিনোদ ।

পদকার কবি ঈশ্বরচন্দ্র ।

(শ্রীযুক্ত কালীহর দাসবৈষ্ণৱ ভক্তিসার্গার লিখিত ।)

—:~:—

বাংলা ১২৪২ সনের ২৯শে ফাল্গুন আমাদের আলোচ্য এই পদকার ঈশ্বরচন্দ্র মকসুদপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত সাহাঙ্কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জয়কৃষ্ণ, মাতার নাম কমলা। পিতামাতা উভয়েই ভগবদ্ভক্তি ছিলেন। জয়কৃষ্ণ চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া স্ত্রী বিত্তমানে পরলোক

যাত্রা করেন। বকসুন্দর পছন্দনীরে তথ্য হইলে, তাঁহার চারি পুত্র কামার গাঁ গ্রামে মাজুল মণ্ডলবাবুদের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গুরুচরণ কলিকাতা সাহেবদের দালালি করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন এবং জনসমাজে খ্যাতিলাভ হন। দ্বিতীয় ভ্রাতা হরিদাস পারসিক বিজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়া মুন্সী উপাধি লাভ করেন এবং বৈয়াকিক কক্ষে একজন গণ্য মাজ কুর্জবিল্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন।

ঢাকা-বিজ্ঞানপুরের মধ্যে কামার গাঁ একটি হুহুং ও মনোজ্ঞ গ্রাম। ভাগ্য-কুল-কুণ্ডলাজবাড়ীর সন্নিকট বলিয়া আধুনিক সময়ে উহার অী বিবর্তিত হইয়াছে। এখানে কোন দিনই পাণ্ডক বাদক গুলিগনের অভাব নাই। মল গুণে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গীত শাস্ত্রে অনুরাগ জন্মে। সঙ্গীত একহস্তে লোককে নরকে ফেলে, অল্প হস্তে স্বর্গে তোলে; সঙ্গীত কাহাকে বিষ নয়নে দৃষ্ট করে, কাহাকেবা অমৃত নয়নে দৃষ্ট করে, কাহাকেবা পদে ঠেলে, কাহাকেবা কোলে তোলে। ঈশ্বরচন্দ্র নিজ নির্মল-স্বভাবগুণে অমৃত লাভ করিলেন। সৌন্দর্যের রসময় সন্দন কাননে পাঁচটা কজরুকের উৎপত্তি। তদ্বশ্যে তিনি তিনটির সেবা করিয়াছেন। কাব্যশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র চিত্রবিজ্ঞা, স্থপতিবিজ্ঞা ও ভাস্কর-বিজ্ঞা—এই পঞ্চকলাবিজ্ঞান প্রথমতঃ তাঁহার অধিকার হইতে চলিল। কারণ সৌন্দর্য্যস্পৃহা ঈশ্বরচন্দ্রের স্বভাবতী।

মহাত্মা কৃষ্ণকমল গোস্বামি মহোদয়ের নিকট উপদ্রষ্ট হইয়া তদনুকরণে ঈশ্বরচন্দ্র বোধনের উৎসবময় প্রকৃষ্ণতার বাসন্তী, হোরিণীলা, মগরসঙ্গীতন ও বাউল সঙ্গীত নিচয় রচনা ও প্রচার করিয়া বচনার মাধুর্য্যে ও কবিত্ব জন সমাজে লক্ষ্যভিত্তি হইলেন এবং মুন্সী উপাধিতে বিভূষিত হইলেন। সঙ্গীতের অনুরোধে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ব্যুৎপন্ন হইলেন। এখন তিনি কেবল পাণ্ডক নহেন, কবিও। তাঁহার মেধাশক্তি ও প্রতিভা অতি প্রথর।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন ৪০ বৎসর, তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য দুর্গতির হস্তে লাহিত হইতে হইল। কলিকাতার ব্যবসায় উপার্জন বিনষ্ট হইল, মাতা ও তিন ভ্রাতা তাঁহাকে একাকী সংসারে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। নিজের বাড়ীর ইটকালয় ধানও কয়েক বৎসরান্তর মদীসং হইল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র অটল। তাঁহার চিত্ত সঙ্গীত ও কাব্যরসে তরপুর।

কলকৌরব মূল-মন্দাকিনী-জলে বিবোধ । কাব্যাদি কলকৌরব মেধা করিতে
বাইরা পদকরিত ভক্তি-মন্দাকিনীর প্রবাহ পরশ পাইলেন । কালে ভক্তিদেবীর
এতই দয়া হইল যে, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজভক্তদাসে মাধুর্য পীড়ন পিতাইলেন ।
জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রভাকরগণের গ্রন্থনিচয়ে
তঁাহার পরমভক্তা জন্মিল । এই সকল রসিক মহাজনগণ সেবাভূত হইয়াই যেন
তঁাহাকে প্রেরণা-প্রসাদ দান করিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র কৃতার্থ হইলেন । ভক্তগণ
প্রাকৃতার্থ হরণ করিয়া তঁাহাকে পরমার্থ দিলেন । ‘যুগলস্মৃতি’ রসভঞ্জন
নন্দপুণ্যোৎসব-মাধুরী তঁাহার হৃদয়-কন্দরে কল কল করে প্রবাহিত হইল ।

বস্তুর সার রস, রসেরসার মাধুর্য । হার চিত্ত কণ্টক নয়, সুসুখ ; মরু নয়,
সরিৎ—তঁাহার ইহাতে অধিকার । পশ্চিমাঞ্চলের মনোহরসাহী কীর্তন
উদ্দীপক ও উদ্দামক সামগ্রী । উহা চাঁদের সুখ । বিক্রমপুরের পদকীর্তন চাঁদের
সুখ না হউক, পদ্মের মধু । ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেম-প্রবণ চিত্ত সে মধুর একতম
কমল । ঈশ্বরচন্দ্রের ‘হরিলীলা দিব্যদ্বীপী’ পদাবলী গ্রন্থ, আশাশ্রয় বস্তু । উহার
সহস্র ধানি পুষ্পক প্রেমদাস ও শচীনন্দন প্রমুখ কীর্তনীর ভক্তগণ কর্তৃক সাগরে
গৃহীত ও ক্রীত হইয়াছে ।

ঈশ্বরচন্দ্র এখন পরম ভাগ্যবান ও সুখী । তঁাহার সদানন্দ-চিত্তে সদাই
সুখ বিরাজ করিতেছে । সুখী কে, তঁাহার মীমাংসা নাই ; কিন্তু তঁাহার
অবস্থা জেঁথলে উহার সংজ্ঞা স্থির করা যায় । পরম তঁাহার এই সুখ-শীতল-
চিত্তের ভগ্নকোণেও সময় সময় একটু বাষ্পোদ্গম লক্ষিত হয় । উহা
স্বামীতে কৃষ্ণ-সেবা-নিরতা সাক্ষীপত্নী নন্দরাণীর গুণস্মৃতির তাপজনিত । পদকার
এই গ্রন্থ লিখিতে প্রত্যেক অধ্যায়ান্তে যে চিত্তাবেগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে
উহার আভাস পাওয়া যায় । নন্দরাণী স্বামীর অরূপা অরুক্লা ভাষ্যা
সংসারে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর নাই ।

তিনি প্যারীলাল, কিশোরীলাল, রামলাল, রত্নলাল, বিলুলাল, গিরীন্দ্রলাল
ও বিমোদীলাল এই সাত পুত্র এবং শরৎ ও সুশীলা এই দুই সখবা কন্যা এবং
শৌর্য বোহিদ্দাদি রাধিয়া স্বামী সমকে ১৩০৭ সনের কাশ্মীর মাসে ৫৩
বৎসর বয়সে লোকান্তর প্রাপ্ত হন ।

পুৰসিক ভক্ত ঈশ্বৰচক্ৰ আমাৰ এতি সখ্যতাব দেখাইয়া থাকেন। এ অধমের রচিত পদ ছই চাৰিটি লইয়া তিনি দইহাঁকা সবনীর ভাৱ ভাবও বসেৰ ঐচ্ছল্য সম্পাদন কৰিৱাছেন। ওদৰ্ভে বিশেষতঃ তাঁহাৰ পদাবলীৰ পৰ্য্যালোচনাৰ তাহাৰ এতিভাৱ এবং ঐচ্ছিকৰাধাক্কে অসাধাৰণ শ্ৰেয়-ভক্তি লকাৱেৰ পৱিচয় পাইয়াছি।

অকম্পস্বৰ্গে মহাশয় ঈশ্বৰচক্ৰেৰ প্ৰীতিপ্ৰণোদনে তাঁহাৰ এই সংকিৰ্ত্ত কীৰ্ত্তনী লিখিৎ চেট্টা কৰিলাম। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেওঁত্হা তাঁহাৰ নিজ এৰে এৰিত কৰিয়া আমাকে কৃতাৰ্থ কৰিলেম। ভক্তজনেৰ গুণগীতি মঙ্গলকৰ।

ভাগ্যভুলেৰ ব্ৰজোপাধিক জমিদাৰ ঐল ঐনাথ ৱাৰ মহোদয়েৰ মত অৰীত-শাস্ত্ৰ ভণ্ডাৰী ও বসন্তাৰী ভক্তাৱনী যখন কবিতৰ মূলী ঈশ্বৰচক্ৰেৰ এতিভাৱ ও পদ-ৱচনৰ চাতুৰ্য্যে মাধুৰ্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিজ অৰ্থ ব্যৱে ও সহায় উৎসাৰে তাঁহাৰ পদাবলী দ্বিতীয় ভাগ “হৰিলালা নব মালিকা” প্ৰকাশিত কৰিৱাছেন, ওখন তাঁহাৰ গুণপৰা—শ্ৰুত মূল্যৱান। আমাৰ মত লোকে স্বীকাৰ না কৰিয়া থাকিতে পাবেনা। অধিক লেখা বাহল্য, তাঁহাৰ এত্হই উত্তম পৰিচায়ক।

“শাৱদীয়া আৱাহন।”

—::—

“আনন্দময়িৰ আগমনে হাসিছে ধৱণী।

ভক্তবৰ্ণে সাজিছে গো জননী একুতি-ৱাণী।

গাহিছে বিহগকুল,

আনন্দে হ’য়ে আকুল

বহিছে মল্লবায়ু বৃত্ত মন্দ তৱে।

কাঁপায়ে লতিকা লতা,

দোলায়ে পাছের পাভা

ভাসাইয়ে প্ৰেমিকেরে ভক্তি অলনীয়ে॥

আঁৱৰ ধৱংকাল সমাগত। মা দশভূজা এবাৰ ঘোঁটকে আগিতেছেন।
আনন্দময়িৰ ভক্তাগমন এত্ৰেক বৎসৰ এই শৱতেই হইল।

সময় হান্সময়ী আকাশ শুভবেশে সজ্জিত। দিগ্‌বধ নিখিল মূর্তি ধারণ করিয়া পুলকভরে নৃত্য করিতেছে। সত্ত সকারমান্ মেঘ সমূহ অন্তরালে লুকাইত, প্রকৃতিরূপী আনন্দে মাড়োয়া। বিস্তৃত প্রান্তর সমূহ ক্রামল শব্দ পরিপূর্ণ। শরৎকালের রজনীর তমোগৃহ শুভ জ্যোৎস্নাময়ী কান্তি নিরীক্ষণ করিলে হৃদয় স্বতই আনন্দরসে আশ্রুত হয়। এ সময় সাগরসঙ্গতা স্রোতস্বতীর অনলকঙ্গোল অন্তর্ভুক্ত হয়, এ সময় দীন হৃদয়ী রোগী ভোগী সকলেই আনন্দময়ীর আগমনে পুলকিত। শরৎ ও বসন্ত বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি। শত্রু মিত্র, সঙ্কলেই মিলন-রাধীতে বদ্ধ। বঙ্গদেশের লোক পরস্পর ভ্রাতৃত্বে বাহুতে বাহুতে যুক্ত। এ সময়ের আনন্দ আনয়ন করিতে হয় না, নিজেই আসে। হিন্দুদিগের গৃহে গৃহে মা সিংহবাহিনীর আগমন হইয়া থাকে। মা তিনটা দিন থাকিবার পর দশমীকে আবার ছয় মাসের মতন চলিয়া যান। এই তিনটা শুভদিনে বৃক্ষ বঙ্গরী হইতে সমস্ত চলাচল ব্রহ্মার সষ্ট পদার্থ লকলেই আনন্দে মগ্ন। বৈদিকে অম্বলোকন করা যায়, সেইদিকেই আনন্দোচ্ছ্বাস, সেইদিকেই ভক্তির বাধন, পবিত্র মিলন সুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিধাতা মানবগণকে পবিত্র বাধনে বাধিবার জন্যই বোধ হয় এই ঋতুটিকে জগতে পাঠাইয়াছেন। পতিত পাবনী দুর্গা অজ্ঞান অন্ধ সন্তানগণকে জ্ঞান-লোকে আনিবার জন্যই এবং দুর্দান্ত অশুর দল বিনাশ করিবার জন্যই দশদিকে দৃশ্য বাহু বিস্তার করিয়া সিংহবাহিনী মূর্তীতে রত সিংহাসনে বিরাজিত। দেবাদিদেব মহেশ্বর মার মস্তকোপরি অর্ধ নিমিলিত নয়নের অধিষ্ঠিত। মার দুই পার্শ্বে দুই প্রাকৃতিত পদ্মের উপর ধন-ঐর্ধ্য-প্রদায়িনী লক্ষী ও জ্ঞান-গর্ভ-উপদেশময়ী বাণী বীণাপানি বীণাকরে দণ্ডায়মান। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণে ও বামে জগৎব্যাপ্ত তনয়দ্বয় কার্তিক ও গণেশ ময়ূর ও মুষিকে আরোহণ করিয়া জগৎব্যাপী আনন্দ বিধান করিতেছেন।

অবোধ্যাপতি রাজা দশবতের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র, লক্ষ্যতাজ রাবণ-নিধন-মানসে এই সময় মা দশভূজার পূজা করেন, ইহাই শাস্ত্রোক্তি অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। মার তিন দিবস পূজা আরতি করিবার পর চতুর্থ দিবসে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ মার প্রতিমূর্তিকে পূজা সদিলা গলাবন্ধে বিসর্জন করেন। এই দিবসকে বিজয়া দশমী কহে। জানি না ইহা বাঙ্গালার হিন্দুগণের স্মরণ দিন কি হুশের

দিন । প্রকৃতই এই দিন সংসারবাসীকে পক্ষে অতি মহৎ ও পবিত্র । কারণ এই দিন সকলেই পূর্বকৃত বিবাদ বিসম্বাদ, মনোমালিঙ্গ, ভুলিয়া দেবীর নাম স্মরণ করিয়া মিলন রত্নভূতে আবদ্ধ হয় ।

শারদীয়া পূজার কথা মনে হইলে, লোক কত আশার বুক বাঁধে । জননী তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র বিদেশ হইতে আগমন করিবে এই আশার কত পূর্ব হইতেই দিন গণনা করিতে থাকে । প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রিয়-জনের আশার বুক বাঁধিয়া মায় আগমনের আর কত বিলম্ব তাহারই চিন্তায় ব্যস্ত । মা আনন্দমায়ের ভক্তাগমনে ধরায় যে কি অপূর্ব বেশ হইবে, কত বহুবাক্য, আশ্রয় সঞ্জন সকলে আবার একত্রিত হইবে এই আশার আশাসিদ্ধ হইয়া মনে মনে কত কথাই কল্পনা করিতেছে । কিন্তু কি জানি অদৃষ্টের লিখন ও বিধাতার ইচ্ছায় কতদূর অগ্রসর হইবে তাহা বলা যায়না । মায় আগমন-বার্তা মন মধ্যে এইরূপভাবে আলোচনা করিয়া এক দিবস আমি নিম্নার সুকোমল ক্রোড়ে অচেতন হইলাম । বধন এই সুস্থপ্তির শান্তি অনুভব করিতেছি, এমন সময় স্বপ্ন আসিয়া আমার কৈলাস রাজ্যে লইয়া চলিল । স্বপ্নাবশেষে মায় পুণ্ডরীকায়ের নখনাভিরাম অপূর্ব শোভা হেরিয়া পুলকিত চিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি আর আমার হৃদয় চক্ষু দিয়া যেন আনন্দাক্রম প্রবাহিত হইতেছে । এমন সময় একটা ভদ্রানক আর্তিনাদ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল ।

শুন রাত্র অবসান প্রায় । সেই কাতর রোদন-ধ্বনি শ্রবণ মাত্র আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল । নৈশবাতাস নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে হৃদয় একটা পক্ষী রাত্রি শেষ হইয়াছে ইহা সুস্থপ্তির কোমল ক্রোড়ে শান্তিত জগৎবাসীকে জানাইয়া চেতনা সঞ্চার করাইবার জন্য কুজন কবিতোছে । নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম যেন এক যোড়শী নারী বিকষিত পশুর উপর সুবর্ণ খচিত বস্ত্রে আবৃত হইয়া, অলঙ্কারগঞ্জিত পদ্মযুগল নূপুরে পরিশোভিত করিয়া, অধরে ২৫মন্ড হাস্য লইয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা । চকিতে একবার মাত্র সেই অপূর্ব তেজস্বী মূর্তিকে দেখিয়া আমার হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল । চক্ষু কলসাইয়া গেল ; পুনরায় আর যেন আমি চাহিতে পারিলাম না । কিন্তু হৃদয় মধ্যে আর একবার মাত্র সেই অপূর্ব তেজঃপূর্ণ হাস্যময়ী মূর্তি দেখিবার জন্য বাসনা জাগিতে লাগিল ।

কিরংকণ পরে আবার আমি সেই মূর্তির প্রতি চক্ষু ফিরাইলাম। দেখিলাম যে সেই মূর্তি আমার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমার মস্তকের দিকে গুণায়মান হইয়া বিগনিদিত স্বরে কাতর কণ্ঠে আমাকে কহিতেছেন, বাবা! আজ বিজয়া দশমী, আমার স্বামীগৃহে বাহির দিন। আমার সহচরী বিজয়া আস্থিতাছেন। উঠ, আর নিদ্রা বাইওনা। আমি তোমাদের কাছ হইতে আপাততঃ বিদায় লইলাম বটে, আবার শীঘ্রই আসিব। হুঃখ করিওনা বা হতাশ হইওনা আমি তোমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলাম বটে, কিন্তু তোমাদের উপর আমার সত্যতঃ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি রহিল। আমার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই তোমরা জীবনের কঠব্যকাণ্ডে সফল কাম হইবে। তোমার সম্মুখে বিস্তৃত, কর্মক্ষেত্র অনেক কর্ম তোমাকে করিতে হইবে, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, জন্মের উৎসাহ লইয়া, মনে আনন্দ আগুরু রাখিয়া কর্ম-সমুদ্রপানে প্রাধাণিত হও। আমার হারা হইলে বলিয়া হুঃখ বা ক্রোড কিছুই করিওনা আবার আমি আসিব। আবার আমিরা তোমাদের কোমল অংগে হাসি দেখিব, আবার তোমাদের ক্রোড়ে করিয়া তোমাদের বদন চুম্বন করিব, আবার তোমাদের হৃদয়ের মা, মা, ধনী তুলিয়া আনন্দ লাগবে মম হইব।

বর্ষার বারিধারার ন্যায় রক্তিমবর্ণ প্রভাত-সূর্যের ন্যায়, অ্যোংতালোকে চন্দ্র-কিরণের ন্যায়, অমাবস্তার নিশাকাশে দক্ষজ রঞ্জিত ভাষা, শারদীয় পূর্ণিমার স্বচ্ছ নিম্ন চন্দ্রালোকে উজ্জ্বলিত তোমাদের মুখ কমল দেখিরা, বিশ্বের পরিমা, দৃষ্টির নৈপুণ্য সমস্ত প্রাণে প্রাণে অনুভব করিব। এই বলিয়া সেই হাল্যময়ী মধুর-ভাবিনী অপরূপ দেবী মূর্তি সহসা অপসারিত হইয়া আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। আমি সেই গৃহে আর তাঁহাকে কোন স্থানে খুঁজিয়া পাইলাম না। শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কিপ্রগতিতে গৃহের বাহির হইয়া ধাবিত হইলাম। কিন্তু হার। আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। আর একবার মাত্র তাঁহাকে দেখিবার আশায় আমি বহুদূর অগ্রসর হইলাম, কিন্তু কই পাইলাম না। হার প্রভাত। আমার ভূমি হতাশ অন্তঃকরণে দীর্ঘনিশ্বাস কেলাইয়া পুনরায় গৃহে ফিরাইলে। আর একবার মাত্র যদি সেই পবিত্র দেবী প্রতিমাকে আমার সম্মুখে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে একটী কথা অজ্ঞান করিয়া আমার প্রাণের জ্বালা জ্বাটতাম। কিন্তু হইল না; আমার

জাগ্রত আয় বুঝি তাঁহার সহিত দেখা হইল না। সমস্ত স্থান ভ্রম ভ্রম করিয়া
খুজিলাম, কই কোথাওত সেই মাতৃরূপিণী আনন্দময়ীকে দেখিতে পাইলাম
না? তখন আমি উদ্ভাদ প্রায়; বাথ্য ভ্রমতে কি ঘটবেছে বা কি ঘটবে যে
বিবরে আমি সম্পূর্ণ উদ্ভাসীন। কেবল সেই আনন্দময়ী মার পদযুগল ও স্নেহ
দৃশ্য, মমতা ও আশীর্বাদ পূর্ণ দৃষ্টির কথা আমার মানসপটে স্বাত প্রতিঘাৎ
করিতেছে। মুখ্য তথা সমস্ত তখন বিন্মুত্তির অতল অঙ্গে নিমজ্জিত। উদ্ভাদ
প্রায় যখন আমি চতুর্দিকে ঘুরিতেছি, এমনত সময় সহসা আমার চেতনার সকাঃ
হইল। জ্ঞানের স্কায়ে দেখিলাম সেই জগজ্জননী বিশ্ব-প্রতিপালিনী, দানব-
দলনী মা যেন সোম্য মৃতিতে পুষ্কীরন্যায় বিরাজিত রহিয়াছেন। আমার
হৃদয় তখন শান্তিরসে আপ্ত, মানসভ্রম তখন সেই ভক্তি-রস-পানে
উন্মত্ত। তখন আমার অন্তরাঙ্গা পরমাত্মাতে মিলিত। আমি যাকে হৃদয়-
সনে উপবেশন করাইয়া, ভক্তি মাল্যে প্রথমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম।
পরে অনেক কাতরে অনুন্নয় বিনয় করিয়া বলিলাম, মাপো অন্তরদায়িনি! এই
বিজয়া দশমীতে কতলোকের বর আধার ক’রে তুই চলে যাবি; কতলোক
তোম মলিন অক্ষতরাক্রান্ত চক্ষুদেখে বিবাদ সাগরে নিমগ্ন হ’বে। কত সন্তান
তোম কোলে বাবার জন্য ব্যতুল হ’য়ে মা মা রবে ক্রন্দন ক’রবে। কিন্তু মা
অন্তরদায়িনি তুমি কি তাদের দিকে ফিরে চাইবে? আর কি মা মধুর বাক্যে
ভ্রাতাদের তুমি অন্তর দিবে? মা যেন কোন সাত্ত্বিক চিত্র দেখাইয়া আমার
উত্তর দিল, হাঁ বাবা! তোমাদের মঙ্গল হইবে, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।
এই বলিয়া সহসা বায়ু মধ্যে অন্তর হইল। আমি সমস্ত জগতই অন্ধকার দেখি-
লাম। এমন সময় শুশিলাল মাকে শেষ বিদায় দিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রপাঠ
করিতেছেন। কত দীনহীন দরিদ্র সন্তান মার মলিন মুখখানি একবার দেখিয়া
তাঁহাকে খেদ প্রণাম দিবার জন্য গমনাগমন করিতেছে। বাঙ্গালীর গৃহে
বিসর্জন ষাটনা বাগিয়া উঠিল। এদিকে আমাদের অন্তঃ করণে বিবাদ কালিমা
পড়িল। সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া অক্ষতরাক্রান্ত নরবে বিবাদ পূর্ণ আননে
একস্থানে সমবেত হইল। কোথাও এরূপ জনতার সমাগম হইলে, মধুর ও
কর্কশ অক্ষট ও উচ্চৈঃস্রাবিত কথোপকথনে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ উৎখিত
হইয়া থাকে কিন্তু আজিকার লোকারণ্য প্রবল ঝটিকার প্রকালীন নিভন্ধ

প্রকৃতির ভায়, নিকীত নিশ্চল অটবী অথবা অসংখ্য চিত্রিত মূর্তির প্রশংসার
ন্যায় নিশ্চল ও নীরব ! ইহার কারণ কি ? জগৎবাসীগণ আজ ইহার উত্তর
দিতে অক্ষম । তাঁহাদের হৃদয় এখন শোকসাগরে অভিভূত ; এখন তাহারা
মাতৃহারা হইয়া উত্তাল শোক-তরঙ্গে মজ্জমান ; এখন তাহাদের হৃদয় কণাটি
নিষ্কল ; বাহ জ্ঞান শূন্য নিখাস প্রাণস খুল প্রান্তর মূর্তি সদৃশ । পাষণ্ডকার ধারণ
করিয়া তাহারা লুপ্তমান আছে মাত্র ; কিন্তু তাহাদের হৃদয় স্নেহভূমি নয় ।
মাতারা সন্তানগণ আজ তাহাদের অবলম্বন হারাইয়াছে । প্রবলবাণীয়া এখন
তাহাদের কিছু করিতে পারিবে না । হৃৎ দারিদের পাঁড়নে তাহারা তিল
মাত্র বিচলিত হইবেনা, দামোদর কি শত শত বারিধি ও এখন উত্তাল তরঙ্গ
তলে তাহাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না । হায় মারা ! তোমার
ধন্য, তোমার জালে পতিত হইয়া কত শত যোগী ঋষিরা আজও পর্য্যন্ত এক
একবার তাহাদের প্রিয় বস্তুর কথা মনে করে । তোমার ক্ষমতার নিকট সকলই
পরভূত । যে তোমার ত্যাগ করিতে পারিয়াছে সে পরমাত্মা নয় হইয়াছে ;
তাহার অস্তিত্ব আর এই ধরাধামে কিছুই নাই । তাহারই জন্ম সফল সে এই
বিশ্বের পরিমার পাত্র । ধন্য সেই আত্মাকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে
বাঁহার নাম আজও পর্য্যন্ত বিলুপ্ত না হইয়া সুবর্ণঅক্ষরে ক্ষোদিত আছে ।

মাগো শিবানী ! কেন মা তুই মাঝাকৈ সৃষ্টি ক'রে এই নব্ব জনতে
পাঠিয়েছিলি ? কেন মা তুই মনুষ্যের প্রাণ কোমল ক'রে গঠেছিলি ? যখন
আমাদের চক্ষের অন্তরালে থাকিবে বলে তোর মনে বালনা ছিল, তখন কেন
তুই তোর অকৃতি অধম সন্তানগণকে মায়াজালে বদ্ধ ক'রে রেখেছিলি ? মা
সন্তানের উপর কি তোর চাতুরী করিবার ইচ্ছা ? মা, সংসারে কত জীব
আলিতেছে, যাইতেছে তাদের জন্তে আমাদের প্রাণ কীদে কেন ? তোর
কাছে চলে যাবে ; দুদিন পরে আমাদেরও এ ভবের পুতুল বেলা সাজ ক'রে
তোর কাছে যেতে হ'বে ; তবে কেন দয়াময়ী এত বাধা বিঘ্ন এত ভীষণ পরী-
ক্ষায় পীড়ন । তবে কেন তুই মা আমাদের এই কঠোর দায়িত্ব দিয়ে এই
নব্ব ধরাধামে পাঠাস ? এ বিশ্বসংসার কেন মা মায়ায় ? দয়াময়ি ! তুইও
অগ্র পশ্চাৎ সমস্তই জানিস্ তবে সময়ে সময়ে কেন গো জননী এমন মোহেতে
জীব সমাজ হয় । সন্তানেরও কি তোর কাছে পরীক্ষা দিতে হইবে ?

অতএব মা, বাবা আমার ভাগ্যে ঘটে ঘটুক। আমি ভাল জানিনা, মন্দ জানিনা, কেবল তোমায় জানতে চাই, আর তোমায় মহিমাতে চিনতে চাই। এই আশায় আস্থাসিত হইয়া আমি তোমার রক্ত-কমল লতন পদযুগল বক্ষে দারণ করিয়া তোমারই অপেক্ষায় রহিলাম। দেখি মা তুমি কতদিনে এই অধম লতানকে কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া অভয় দায়িনী বাণী শুনাও। অব মা হুগী, জয় মা জ্ঞানদায়িনী তমোনাশিনী দশভূজা। আমি তোমার ওই জগদ্ধাত্রীকণ শ্রবণে, তজ্জি-অশ্রুতে তোমার ওই সুপুরুষোত্তম পদযুগল চিন্তা করি এবং যেন আমার হৃদি সশা আনন্দতানে মগ্ন থাকে।

সেবক—শ্রীদীয়েশ্বরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নব-বর্ষ আবাহণে।

(বুদ্ধ শ্রীজগদ্বাম্প শর্ম্মার অগত বচন।)

হরি বোল হরি!!—আবাব পথ ভুলিলাম না কি? মহা বিপদ হ'য়েছে, রাস্তাগুলো সব বে-গোছ বে রকম হ'য়ে গেছে। যেখানে সরল সিধা রাস্তা ছিল সেটা এখন প্রকাণ্ড কঁকড়া বেড়ায় যেবা। যেখানে চিরদিনই এ'দো ডোবা এবং অদল ছিল সেখানটার আপাত হৃন্দর রাস্তা ক'রেছে। ভুলত' হবেই!!

বুদ্ধ আমি, আমার পুরান অভ্যাস যা বাবা কাজেই সমস্ত ভুল রাস্তা গুলো আমার কাছে অপথ। চলতে গেলেই মনে হয় ঐ বুঝি ভুলিলাম" গিরেছিলাম "বৈকুণ্ঠ-সমাজে" কিছু "আচার" ল'য়ে। কারণ অকতি সারাত্তে "আচার" বড়ই মজবুত। সেখানে "মধু"-মিষ্ট বাক্যে, পুরান ধারার, প্রাণান্ত চেষ্ঠার কিছু কিছু ব্যবহার আছে দেখে বড়ো প্রাণ্টা বড়ই খুসী হ'য়েছিল।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে মা গঙ্গার ধার ধরে' আসছি। কিন্তু পলে পলেই পথ হারা হ'য়ে পড়তে হচ্ছে। ছ'টার জন প্রাচীন বা পুরাতন বংশের—সু-ভক্তের ঈর্ষিতে এই অবধি এসেছি। এ'টা কোন্ স্থান তা'ও বুঝতে পাচ্ছি না। কোথা এলোছি, কি কচ্ছি, ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। সে কি আজকের কথা? মনে পড়ে, সেই নদীয়া, যেখানে বাদ্রালার সমস্ত গুণী-

পথের অমাত্য হ'য়েছিল, যেখানে রঘুবর্মের যেটা ককচন্দ্র ছিল, (যেখানে ককচন্দ্রের) যেখানকার নামের জোড়ে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভুত আন্দোলন হইয়াছিল, সেইখানেই শর্ম্মার এই ভাষা জীবনের অনেক সুখ স্মৃতি পড়ে আছে। আর শুধু শর্ম্মারই বা বলি কেন, বাঙ্গালার এখনও বাকি কিছু গৌরবের বাকি কিছু প্রাচীর আছে তাহা সেইখান কারই "কিছু কিছু" ভাষাশেষ।

"য, রি, র, লা" কথা অতি সত্য। কাল প্রাঘাৎ কোথায় কিলীন হ'য়েছে কে বলবে। কিন্তু আমার নজরে, যেন মনে হচ্ছে সে সব কাগজের কথা।

সেই জব্বাহের ইয়া ইয়া ঐ খানেই নানতিনি "বামিনী বিবি"কে 'ল'য়ে প্রথমে তাঁরু পাঠেন? এইটাই বুঝি স্মৃতিস্মৃতি ছিল? ঠিক হ'য়েছে গো এইবার পথ গেরেছি আমাদের যে শ্রীধাম পুরী যেতে হবে। যাই মা' গঙ্গা ধ'রে।

ভাল কথা—কাল সন্ধ্যার পর আসিবার পথে, একস্থানে বড়ই এক সুন্দর দৃশ্য এবং আনন্দের মেলা দেখে এসেছি। আহা সে কি সুন্দর!!—পথ দিয়ে আসছি আর তাব্‌হি, এ সব হোল' কি? এখন দেখছি—

*—শিম্বোদর পরাবিজা:

অত্রতা বটবোহশৌচা: তিচ্ছাবশ কুটুগ্নিন:

ভগবিনো গ্রামবাসী ন্যাসিনোহ্যর্ষ লোলুপা:

কিন্তু তা' হ'লে "পরিভ্রাণার" কথাটারই বা কি হবে, আর—"প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আপনার মুখে। মুখ নীচ দরিদ্র ভাসাষা প্রেম মুখে" এরই বা কি হবে? এইরূপ সব নানান উর কথা ভাবছি, আর গুটি গুটি যাচ্ছি। দেটা হচ্ছে ঐ ওপারের এক স্থানে। সেখানে বেশ শান্ত নিষ্ক আশ্রম ভাব এখনো কিছু কিছু আছে। এখানকার মত এক ছোড়া হীন টিকি ডোলা গড় গড়ে গাড়ি বা বল-রাজার ধাম আশ্রমের ভোঁক ভোঁক শব্দের যোজন ছোট। শব্দের বিকী ওড়া নাই। বেশ শান্ত ধীর পরিচী।

যাচ্ছি হঠাৎ দেখি একটা 'হুঁড়ী' পথের মধ্যে লোকে লোকারণ্য হ'য়েছে। কি ব্যাপার যে বাপ? সুন্দর, দিব্য পুরাণ পুরাণ স্মৃতি মাথা ধূপ ধূনার গন্ধ; মঙ্গলিক শব্দ নিনাদ; বড় আনন্দ হ'ল। একটু এগিয়ে, জিজ্ঞাসা করে আনলাম অমৃতিষি পূজা। ক'র গো?

আছে ভিড় ঠেলে সেই দিকে গেলাম। দেখি সুন্দর একটা আশ্রম।
ঐবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, আর আছে তথায় এক স্খাশ্রয় প্রতিমূর্তি। আর
দেখিলাম বহু বহু ভক্ত এবং সাধু জ্ঞানীর মণ্ডলী। বহুকালের পর পুরান
দৃশ্যের আভাষ দেখিয়া প্রাণে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হ'ল। কথা ঠিক—

“সাধুনাং দর্শনং পুনাং তীর্থ ভূতাহি সাধবঃ

কালে ফলন্তি তীর্থানি সদা সাধু সমাগম।”

পার্বস্থিত জনৈক সু-চেতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম; এস্থানটী বর্তমান
সময়ে “হাওড়া কৌড়ারবাগান” নামক পল্লী এবং ভবনটী “ভাগবতাশ্রম” নামে “
এস্থলে প্রসিদ্ধ।

একে পথ-প্রান্ত-ক্লান্ত, তা'তে বুদ্ধ প্রায় জরায়াম্, বিশ্রাম স্থান পাইলেই
নিজাবেশ হয়, হইলও তাই। বসে বসে তুলিতে আরম্ভ করিলাম। হঠাৎ
মুদ্রঙ্গ করতাল ষটাদির শব্দে, চট্কা ভাঙ্গিল। দেখি ঐবিগ্রহের আরাট্রিক
কার্য্য আবৃত্ত হইয়াছে এ'কি মঙ্গল আরতি? এ'কি পুণ্য উষা?—কতক্ষণ
নিজা ঘোরে ছিলাম জানিনা; কিন্তু এখনও সন্দেহ যায় নাই, সেই যে
আরাট্রিক সে' কি জ্ঞান-সম্ভার না প্রেম-উষার? কে জানে বাপু!! কিন্তু
দৃশ্য বা দেখে ছিলাম তাহা অর্তি পথিত। শান্ত!! প্রণামারাম!!

সমবেশ সকলেই প্রেম-ভক্তি পুঙ্কিত নয়নে আরাট্রিক অন্তে যেন কি
প্রতীক্ষা করিতেছে। মনে হইল সকলেই যেন কাহার দর্শন আশা করিতেছে।
এমন সময় এক সর্ষাজ সুন্দরী, কিশোরী সেই প্রাঙ্গণে আগমন করিলেন।
সঙ্গে গৃহস্থানী। দেবী মূর্তির উপমা বা বর্ণনা ঠিক করিয়া বলিতে হইলে পুরানো
কথায় বলিতে হয়।

“অন্তঃ প্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়ানি

যোজক তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামো।

সদ্যঃ কৃতার্থয়তি সমিহিতৈক জীবা-

মানন্দসিদ্ধ বিবয়েহু নিমজ্জয়তী”।

দেবী উজ্জ্বলরসালঙ্কারালঙ্কা, শাস্তা, শুভ্রা, স্নিগ্ধ জ্যোতি বিশিষ্টা।

অমূলস্থানে বুদ্ধিগাম, ঐ যে সেই দেবী তিনি স্বধাম-পত “দীনবন্ধু”
পালিতা কন্যা। নাম “ভক্তি”। বর্তমান গৃহস্থানীর বসে, তাঁহার আটরিক

হুচেঙাতেই ইনি এইরূপ শ্রীমুক্তা, পুট্টা হইয়াছেন। আরও ত্রিনিলাম ঐ হুমধাখানেরই প্রতিপাদনে, “ভক্তি” চতুর্দশ বর্ষ উত্তীর্ণ করিয়া পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন এবং সেইজন্যই “ভক্তি” মেবা পরায়ণ সমস্ত হুভক্তের জমায়েতে জন্ম তিথির পূজা হয়। বড় হৃদয়। বড় আনন্দ ॥ বড়ই চমৎকার ॥

বুনিলাম কথা ঠিক—

“ভক্তি”র বৈদ্য নয়তি ভক্তিবৈদ্য নয় দর্শয়তি

ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিবৈদ্য ভূমসী ।

কিন্তু অনেকটী একথা শ্রবণ না। কালের গতিকে ভদ্র “গৃহস্থ” ও কিছু কিছু থাকা, ‘হিন্দুসখা’ ‘বঙ্গমহিলা’ ইত্যাদি চিৎদিনই প্রেম-ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম-প্রসঙ্গে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন তাঁরাই সকলে বিকল্প বোলে ভক্তির প্রচাব নাহাযে ‘হ ব ব র ল’। ছিঃ ছিঃ এ হলো কি উচিত, আমি “বাহাতু বো বুড়ো” আমার কথা কেইবা শুনে আর কাঁকেই বা বলি ? ‘হক্’ বলতে গেলেই গাল খেতে হয়।

আহা সে এক দিন ছিল যখন প্রতিবাসী ‘পল্লিবাসী’ সম জুটিলের কোনও কিছু একটা উৎসব অনুষ্ঠানে পরস্পরের মধ্যে ঠিক আপনার মত জ্ঞান ছিল। সকলেই পরস্পরের স্তম্ভ অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে, কার্যে যোগদান কবিত আনন্দ করিত। আর এখন সবই “ডিগ্‌বাজী” খেয়ে উশটা। আর এ দিকেও ঠিক আছে, জটিলবিব কথা কি ভুল হয় ? তাই এখন “ধর্ম” সঙ্কুচিত্তপো বিরহিতঃ সত্যঞ্চ দূরংগতঃ”

কাল। কাল ॥—তাহা না চলে যা’তে “বিজ্ঞান-বনানন্দ-বনা সর্চিদানন্দ-করসে ভক্তি বোলে ভিত্তি” সে “ভক্তি”র জন্ম তিথি পূজাতে কি হিন্দুসখা হিন্দুসখা, গৃহস্থ, বঙ্গমহিলা প্রভৃতির আপনি এসে যোগ না দিউন ? যারা দূরে থাকতে চান থাকুন, কিন্তু আমার মনে হয় যদি—

অবশ-কীর্জন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আশ্র-নিবেদনের কাণ্ডটা আমবার ইচ্ছা হয়, তা’ হলে ঐ যে “ভক্তি” বাঁকে বাগড়াটে ঋষির পাঁচ রাত্রিতে বলে “জঘীকেন, জঘীকেন সেবনং ভক্তিরুত্তমা” তাহার আশ্রয় লইতেই হইবে, আর তা’ করতে হ’লে তাহার সহজ উপায় এ “ভক্তি”র সাহচর্য করা। কিন্তু আমার “ভৌমরতী”র বক্তব্য কে শুনে ॥

তবে আমি, আমার “অন্তঃ কক্ষঃ বহির্গৌরং ঠাকুরটার কাছে” বসিতেছি এ “ভক্তি” কেন বিন দিন সৰ্বসাধারণে সৰ্বত্র আদর পায়। যেমন ভাবে ধীরে ধীরে শিশু অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উজ্জলরস অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হ’য়ে পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী রূপে উপস্থিত হইয়াছেন—হে প্রভু! যেন তেমনি ভাবে ক্রমশঃ সকল ঐশ্বর্য্যে, শ্রীতে, ভূমিতা হইয়া—

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি ধাম

সৰ্ব্বত্র প্রচাৰিত হযে মোর নাম”—তোমারই এ বাক্যের আংশিক কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতে এ “ভক্তি” সমর্থ্য হন। তাহ’লেই “ভক্তি” ধন্য।

হরিবোল হরি। আবার বুঝি পথ ধারাইয়া যাইগো! ঐ যে পুরধুলী দেখা যাচ্ছে ওঁর তীর ধরেই যাই। ইতি—

শ্রীখুন্তীর-আত্মকথা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তা’ হোক, প্রভুত তময়। কিন্তু যেমো চন্দ্রশেখর বৃদ্ধের, এবং সঙ্গী-গণের জয়ের জার শেষ নাই। তাঁহারা সকলেই চেষ্টা করিতেছেন, কোনও রূপে একবার শ্রীনিমাই চাঁদকে শাস্ত করিয়া, কোনরূপে একবার ঠাণ্ডা করিয়া, গৃহে ফিরাইতে পারলে হয়।

অন্তর্য্যামী, বুঝলেন। একদিন, পৌষ মাসের শেষা শেষি, যে সময়ে ন’দের ঘরে ঘরে “পৌষ পিটে”র আশাদ্ মন্তক ধুম, ঠিক সেই সময়ের এক সন্ধ্যাকালে সকলে এড়া লইয়া “ভাণোয় ভালোর” এসে পৌঁছিলেন। সঙ্গে হুঁচার অনু ছুঁড়ের আশা হইল, “ইয়া এবার ঘরে ঘরে হুঁচারটা সদ্য-তন্তু পিষ্টকের আবাদন করা বাইতে পারিবে।

পথে কিরং পাল্লার সময় ঠিক কি কি ঘটনা হয় তা’র মর্ম্ম ঐ একরূপই অর্থাৎ ঐ ভাব-ব্যাকুল ক্রন্দন, এবং “কিন্তু” মাথা কথা।

ধাঁক। এখন কথা হচ্ছে সকলে, দেখলে বুকে, এতু এবার গরাধাম থেকে এসে আর এক রকম হ'য়েছেন। যারা বুকে বার লোক, যারা বহু দিন থেকে প্রভুর কার্য গুলি প্রাণের আগ্রহে স্বেচ্ছা করছিলেন ; তাঁরা বুকেলেন "সর্ব অবতার সার গোরা অবতারের" পালার "পরিতারা জুর হ'ল।

পাণ্ডিত্য গর্ক, স্বভাব চাকলের স্থলে, স্বর্গীয়, জ্যোতি সহ বিদ্যুৎ ব্যাকুল-ভাব, ঐনিমাই চান্দকে আশ্রয় করিয়াছে। আজ কাল যখন মুখখানি, কি জানি কেল স্নান, করিয়া, যেন কত কি মর্মের ধন খুঁজিতে খুঁজিতে মাথা হেঁট করিয়া নদীয়ার পথে প্রভু ঘরে ঘরে গমন করেন ; তখনকার ভাব দেখে সমস্ত নদীয়ার লোক ভাবে "একি হ'ল ৭"

যারা বুকে তাঁরা দেখে যেন প্রভু আতাবে বলছেন—

"বিজ্ঞান বনানন্দন সচিদানন্দকরসে ভক্তি যোগে তিষ্ঠতি।"

তাঁরা দেখে প্রভু যেন নিজের আচরণে বুঝাইতেছেন—

"অন্যাত্তিলাষিতা শূন্য জ্ঞান কর্মাদানী বৃত্তম্।

আমুহুল্যে কামানুশীলনং ভক্তিরতমম্।"

"কিছু" মাথা ভাবে প্রভু যেন সকলের কাছে কত কি মগরাধী, আজ কাল প্রভু আশ্রয় স্বজনের নিকট যে কোন্ মহা দোষে দোষী, ঘরে ঘরে কথা, ঘরে ঘরে চলা, ঘরে ঘরে বস। জননীর চরণ বন্দন, ঐমতীর সহিত হুঁচারটী মিষ্টালাপ, দিনান্তে অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট একবার গমন এবং বাকি সময়টী চুপ্ চাপ্ থাক। এই হ'চ্ছে এখন দৈনিক কার্য প্রণালি। ইতিমধ্যে আর এক "চকুড়ু বা" হয়েছে। ঐমানু পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ ও মুরারি-গুপ্তের কাছে প্রভু যখন গবার বৃত্তান্ত বলেন তখন সে এক কাণ্ড !! যে বলছে ; যারা শুনছে সকলেরই হৈ হৈ কান্না। প্রভু বতই থেকে থেকে "হা কক কোথা কক" বলে অঝোরে ব্যাকুল ভাবে কান্দেন ঐ জোতারাজ ততই আনন্দে "হরি হরি" বলে কান্দেন। আরে বাপ'রে সে কি ব্যাপার !!! পাড়ার রৈ রৈ কাণ্ড প'ড়ে গেল !!!

বুড়ো মেশো মশায় বললেন ঐ "গো আবার বুঝি গয়ার সেই ভূতটা ঐনিমাইকে আশ্রয় ক'লেন" !!

এঁটা জমে শুকান্নর ব্রহ্মচারীর কুটীরে। শুকান্নর কে ছিল? উদাসীন। বৈকুণ্ঠ উদাসীন, নানা তীর্থ ঘুরে, ঐ আমার সুবর্ণ বর্ণের ঠাকুরটীর চরণের স্থলির চেষ্টায় নবঘীর্ণে এসে গ্যাট্ হয়ে বসে আছেন।

দয়াময়, চিরদিনই দয়াময়। ওঁরই কুটীরে, গঙ্গাতীরে এতু বাহুজ্ঞান হারা হ'রে মাতোয়ারা হ'ন।

সমস্ত নূরিন গত হ'য়েছে কাহারও কিছু জ্ঞান নাই। সকলেই প্রেমভরদে ভুবিয়াছেন। সকলেই মগ্ন। এতু ক্রমাগত “হা নাথ কোথা যাও।” বলে ব্যাকুল ভাবে ডাকছেন। তব্বি রসোদীপক নানা শ্লোক, পাখা আকৃতি করিতেছেন, গড়াগড়ি দিতেছেন কাঁদিতেছেন এবং কাঁদাইতেছেন। এমন সময় ত্রীগদাধর পণ্ডিত বরের ভিতর হইতে, হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে করুণ হইতে করুণ স্বরে কাঁদিয়া এতুকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন। এতুর বাহু জ্ঞান আগমন করিল।

ত্রীগদাধরকে আসিতে না বলিলেও তিনি ব্রহ্মচারীর গৃহে লুকাইয়া সমস্তই দর্শন এবং শ্রবণ করিতেছিলেন। এবং বুঝি বা আত্ম নিবেদনও করিতেছিলেন।

এখন সকলেই চলিল। গৃহের দিকে সকলেই কিরিল, কিন্তু সে সিঁধে ভাবে নহে। ভাবে নাচিয়া, চুলিয়া এবং তখনও কাঁদিয়া। এইরূপে চলনের এইবার প্রকাশ্য প্রকাশ হইল।

শচী মা সৰ্বদাই এতুর জন্য ভয়ে ভীতা, তা'র উপর মেশো ম'শায় ত' আছেনই। যা' হোক ঐ ভাবে কোনও রূপে রাত কাটিল। এতাতে ত্রিনিমাই চাঁদ, জননৌকে, পত্নীকে নানা ভাবে প্রবেশ দিয়া স্নান করিয়া টোলে গড়াতে চলিলেন।

হরি। হরি!!—কে কা'কে পড়ায়!! যে যা প্রশ্ন করে তাহার উত্তরে বা যে কোনও ব্যাখ্যাতেই এতু হরিনামের মহিমা কীতন করেন। ক্রমে জ্ঞান হারা, শেষে নৃত্য। হুঁচারজন নিম্নক আসিয়া দেখিল এবং হাঁসিয়া প্রকাশ করিল “নিমাই পণ্ডিত বোধ হয় গঙ্গা থেকে সদলে ভাং পান্ অজ্যাস ক'রেছে আরে রাম একি উদ্দেশ্যের নৃত্য!!!”

এদিকে ছাত্রদের ভিতর কতক “রাম রাম” শব্দে ভৌতিক ভয়ে ভীত হ'য়ে পু'খী কেলে ছুট দিল। আব হারা কুশালাভের পাত্র তাঁরা অতঃপর সৰ্বদাই এতুর সেবাকারী দাস হইল।

পণ্ডিত নিমাইয়ের টোল ভাঙ্গিল। তত্ত্ব নিমাইয়ের হাটের পতন হইল। প্রেম-ভক্তির বন্যার ডাক্ ছুটিল। যে সকল ছাত্র, যে সকল শাস্ত্র ব্যবসায়ী লয়ার, লর্জন, তর্ক, মীমাংসার দিনরাত চেষ্টামিচি করিত তাহারাই আত প্রভুর লবিত্ত মিশিয়া প্রভুব রূপা-কণায় তাঁহার সহিত একটা সংকীর্ণনেব দল সৃষ্টি করিল।

লম্বাজে, বর্ষে, চিতিহাসে নতন জীবন, ছুতন গুণীর আরম্ভ হটল।

“পরিব্রাণায় সাধুনাং বিনাশাবচ চক্ষুতাং

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সত্ত্বামি যুগে যুগে ॥”

শ্রীমুখের এই ভবিষ্যাবণীর সাফল্যের দিন আসিয়া উপস্থিত হ’ল। যে কীর্তনের মধুব অথচ সাগর তরঙ্গের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ জোছে, বঙ্গভূমি স্লাবিত হইয়াছিল। যে কীর্তনেব, এক এক লহবীতে শুক কান ধুখা তর্ক দ্বয়ে ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং গিয়াছে, যাহার সামান্য জল কণা স্পর্শে কত কত শুক পাষণ ছন্দয় গলিয়া গিয়াছে যাইতেছে এইবার তাহার সূত্রপাত আরম্ভ হইল। জগতের মহা অন্ধকার যেন নব রবি-কিরণে ধীরে ধীরে লীন হইতে চলিল।

প্রভু বলিলেন—

“পড়িলাম্ শুনিলাম্ এককাল ধরি

কৃষ্ণের কীর্তন কর পরিপূর্ণ করি ॥”

শিষ্যগণ বোলেন “কেমন সে কীর্তন ?”

আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন।

“হরষে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥”

শিখা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া

আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লেয়া ॥”

প্রভু প্রথমে এই নাম শিখান; এবং নিজে গান করেন ? কি বল্ছ ?
কোনু সুরে ? বুড়োরা বলেন প্রভু না’কি কেদার রাগে এই নাম গান করেন ?

ক্রমশঃ—

ভক্তি, ১৫শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন মাস, ১৩২৩।

মুরলী তানে ।

যদি—জীবন যৌবন সফল করিবি,
চল সখি । যমুনার কূলে,
সেথা—নবীন নাগর শ্যাম নটবয়
ত্রিভঙ্গিম, কদম্বের মূলে ।
খড়া চড়া পরি' হুবেশ কিশোর
রতিপতি জিনি' তার শোভা,
অথরে মুরলী বাজে মুহু মুহু
কিবা তার হুর মনোলোভা ।
চাহনিতে তার পাগল করে লো
অবশ হইয়া যায দেহ,
রঙ্গের সুগির, *পীরিতির ধারা
সে যে মুখ, ভালবাসা, মেহ ।
ধূমন নাগর পাবি না লো আর,
এমন চন্দয় চোরা সখা,
মন তার পদে বিকাইতে চায়
হ'লে শুধু বারেকের দেখা ।
ঐ শোন সখি । কানুর মুরলী
ফুকারিছে—আয়, আয়, আয় ।
যমুনা পুলিনে চল নিধুবনে—
আর কি লো ঘরে রহা যায় ।

ঐহরেন্দ্র কৃষ্ণ শিত্র ।

মুক্তি ও ভক্তি ।

(শ্রীযুক্ত অন্ত্যাক সরকার, এম, এ, বি, এল লিখিত ।

—:৩:—

ভারতবর্ষের ধর্মদর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় দর্শন সমূহে মুক্তিই মানবের নিঃশ্রেয়সরূপে অব্যবহিত হইয়াছে । ত্রিগুণবদ্ধ জীব অবিদ্যাবশে স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া হৃৎকান্দ্রিক সংসার-চক্রে জন্ম জন্মান্তর নিম্পেষিত হইতেছে । কর্মফলাত্মক এই সংসার-চক্র হইতে তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ করাই পরম পুরুষার্থ । তাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি যে চতুর্ভুজ বলিয়া নিকপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ বর্গ । বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে মোক্ষাবস্থার কল্পনায় ন্যূনাধিক ভেদ থাকিলেও মোক্ষই চরম শ্রেয়ঃ এ বিষয়ে সকলেই একমত । অদ্বৈত বেদান্তমতে “ব্রহ্ম সত্যং জগন্নিখ্যা জীবো ব্রহ্ম নৈবাপরঃ ।” মায়াবশে জীব খণ্ড ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না ; তত্ত্বজ্ঞান সাহায্যে মায়া অপগত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, তখন—

ভিন্যতে হৃদয়গ্রন্থিহৃদ্যন্তে সর্কসংশয়াঃ ।

কীর্ত্তে চান্য কন্ধ্যাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

সাংখ্যমতে পুরুষ (জীব) তত্ত্বতঃ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র বিশ্বক্ৰীড়ায় মোহিত হইয়া পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সহিত ভ্রমবশে একীভূত মনে করিয়া তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছে ; তজ্জন্যই প্রাকৃত স্রষ্টা, হৃৎ ও মোহ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিতে পারিতেছে । তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি হইতে নিজ স্বতন্ত্রতা বুদ্ধিতে পারিলে, মায়াময়ী প্রকৃতি সেই পুরুষের নিকট হইতে স্বতন্ত্রাধা পেরিণীর ন্যায় দূরে অপসারিত হইবে, তখন পুরুষ নিজের নিখুল কেবল সাক্ষী চৈতন্য ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবে । ইহাই কৈবল্য-মুক্তি । যোগদর্শনেরও এই মত । তবে যোগদর্শনে কৈবল্য প্রাপ্তির সাধন-স্বরূপ যোগাচার ও ঈশ্বর প্রণিধান বিশেষরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে । ন্যায় ও

বৈশেষিক দর্শন বটে জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বধাক্রমে দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ হইয়া জীব মোক্ষাপবর্গ লাভ করিবে। বৌদ্ধমতানুসারে দুঃখাত্মক জন্মপরম্পরার কারণীভূত বাসনারাশির বিধ্বংস হইলে জীব নির্বাণ মোক্ষ লাভ করে। জৈনমতে বেদব্রাহ্মণ নির্মূল হইলে কর্ম্মশ্রব রহিত হইয়া জীব কর্ম্মবদ্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অর্হন্ত লাভ করে। এইরূপে সকল দর্শনই মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। মোক্ষ লাভ হইলে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। মোক্ষ প্রাপ্ত ব্যক্তির আর কোন কামনা থাকে না; সর্ববিষয় হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আত্মারাম আনন্দমুগ্ধ হন।

সকল দর্শনেই এবশ্যপ্রকার মুক্তির পরম পুরুষার্থ উক্ত হইলেও ভক্তি মার্গ-বলসী বৈষ্ণবগণ এইরূপ মুক্তির প্রয়াসী নহেন। ইষ্টদেবে নিত্য ভক্তিই তাঁহাদের একমাত্র সাধ্য ও পরম নিঃশ্রেয়স। এই আত্যন্তিক ভক্তিকেই কোন কোন শাস্ত্রে বৈষ্ণব সম্যক মুক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

লীনতা হরি-পাদাজে মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ।

ইদমেব হি নিরূপণং বৈষ্ণবানাং সুসম্মতম্ ॥ (নারদ পঞ্চরাত্র।)

মুক্তিস্ত বিবিধা সাধিষ্যৎকৃত্যুজা সর্বসম্যত।

নিরূপণ-পদনান্নীচ হরিত্তক্তিপ্রদা প্রিয়ৈঃ ॥

হরিত্তক্তিস্বকংপাক মুক্তিং বাহুতি বৈষ্ণবাঃ ।

অন্যে নিরূপণরূপাক মুক্তি মিচ্ছন্তি সাধবঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, প্রকৃতিভাষ্য, ২২অধ্যায়।

কিন্তু মুক্তি শব্দ পারিতোষিক অর্থে, উক্তপ্রকার মোক্ষেরই প্রতীতি মনে জন্মাইয়া থাকে, তজ্জন্য ভক্তিকে মুক্তি নামে অভিহিত না করাই প্রেয়। একদিন সার্কীভৌম মহাশয় শ্রীমদ্ব্যাক্রান্তুর নিকটে আগমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মসুত্র (১০ম স্বত্বের ১৪শ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক) পাঠ করিবার সময় “মুক্তিপদে স দায়তাক্” হলে “ভক্তিপদে স দায়তাক্” এইরূপ পাঠ করিয়া ছিলেন। “মুক্তির স্থলে ভক্তি শব্দের সম্ভবশে দেখিয়া শ্রীমদ্ব্যাক্রান্তুর এইরূপ পাঠান্তর করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সার্কীভৌম মহাশয় “ভক্তি” সম নহে মুক্তিফল” বলিয়া স্বীয় বক্তব্য নিবেদন করিলে, শ্রীমদ্ব্যাক্রান্তুর

মূল পাঠ অবিকৃত রাখিয়া “মুক্তিপদ” শব্দের নানাকণ ব্যাখ্যা করিলেন । তাহা শুনিয়া সার্বভৌম বলিলেন ।

* * ও পাঠ কহিতে না পারি ॥

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কহে ।

তথাপি অশ্লিষ্যদোষে কহন না বায়ে ॥

যদ্যপিহ মুক্তি শব্দেব হয় পঞ্চবৃত্তি ।

কটিবৃত্তি কহে ততু সাযুক্ত্যে প্রতীতি ॥

মুক্তিশব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস ।

ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।)

শ্রীমদ্ভাগবতে যে অপরূপ ভক্তি-ধর্মের ব্যাখ্যান হইয়াছে তাহাতে মুক্তির পরম পুরুষার্থ খণ্ডিত হইয়াছে । ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়া নিজপুত্র শুকদেবকে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন এই কথা শুনিয়া শৌনক মুনি প্রস্থ করিলেন ।

স বৈ নিবৃত্তি নিরতঃ সৰ্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ ।

কস্য বা বৃহতীমেতমাস্ত্রারামঃ সমভ্যাসৎ ॥ ভাঃ ১।৭।৯

অর্থাৎ শুকদেব ঋষি নিবৃত্তি নিরত, তাঁহার কোন কামনা নাই, উজ্জন্য তিনি সকল বিষয়ই উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি আত্মবাস, তিনি কি নিমিত্ত এই বিস্তীর্ণ ভাগবত সংহিতা অভ্যাস করিলেন ? *এই প্রশ্নের উত্তরেই সুপ্রসিদ্ধ আত্মারাম শ্লোকের প্রসঙ্গ হইয়াছে :—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অন্যত্রক্রম্যে ।

কুর্ষন্ত্যহেতুকীং ভক্তি মিথ্যভূতগুণো হবিঃ ॥ ভাঃ ১।৭।১০

অর্থাৎ আত্মাতে বাহাদিগের রতি একপ বাসনা-গ্রাহি শূন্য মুনি সকলও ত্রীকূক্ষে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন । ত্রীহরির এমনই গুণ ।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র শ্রীভগবান বলিয়াছেন —

অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ।

সালোক্য সাষ্টি সামীপ্য সাক্ষৈকত্বমপ্যুত ॥

দীযমানং ন গৃহ্ণতি বিনা যৎসেবনং জনাঃ ।

২.এব ভক্তি যোগাধ্য আত্মাত্তিক উদাহৃতঃ ॥ ভাঃ ৩।২৯।১০-১৪

অর্থাৎ পুরুষোত্তমে যে ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা, এবং যে ভক্তিতে ভক্তজন,—সালোক্য, সাষ্টি, সামৌপ্য, সাকপ্য এবং একত্ব দান করিলেও আবার সেবা ব্যতিরেকে উহাদের কিছুই গ্রহণ করে না, তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে কথিত হয় । যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি নিত্যধামে কৃষ্ণ লেবার অধিকারী হইয়া অনির্কটনীর মাধুর্য্য আবাদনে রত হইয়া আছেন, তিনি সালোক্যাদি মুক্তি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন কেন ? অপ্রাকৃত হরিভক্তি-রসামৃতসিক্তর নিকট মুক্তি-মুখ গোপ্পদের তুল্য ।

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরাক্ষিণীকৃতঃ ।

নৈতি ভক্তি-মুখাভ্যুদেহঃ পরমাণু তুল্যমপি ॥ ভক্তিরসামৃতসিক্তঃ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে পরাক্ষিণ করিলেও তাহা এই ভক্তি মুখসাগরে পরমাণু-তুল্য হইতে পারে না ।

ভস্মারবিন্দনয়নন্য পল্লারবিন্দ-কিঞ্জল-মিশ্র-তুলসী মকরন্দ বায়ুঃ ।

অভ্যর্গত স্ববিহারেণ চকার তেবাং সংকোভ মকরজ্বলামপি চিত্ততথোঃ ॥

এই জন্যই “মোক্ষলঘুকং” ভক্তির অন্যতম লক্ষণ ।

ভক্তি, মুক্তি অপেক্ষা বহল পরিমাণে গরীয়সী । ইহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ ।

এই মহান আদর্শের নিকট চতুর্দর্শ ত্বের নয় তুচ্ছ ।

জ্ঞানভঃ সুলভা মুক্তিভুক্তির্জ্ঞানাদিপূণ্যতঃ ।

শ্রেয়ঃ সাধন সাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সহস্রভা ॥

জ্ঞান দ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা স্বর্গ ভোগাদি সুলভ হয় কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না । শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—

মুক্তিং দদ্যতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ভাঃ । ৫। ১৮

কিন্তু এই মুনিবাহিত সুলভ হরিভক্তি আমাদের পরমদয়াল শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ অকাতরে অগতে বিতরণ করিয়াছেন ।

হেন এম অীচৈতন্য দিল যথা তথা ।

জগাই মাধাই পর্যন্ত অনেকের কা কথা ॥ অীচৈতন্যচরিতামৃত ।

অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ

সমর্পয়িতুমুদ্যতোজ্জলয়সাং স্বভক্তি শ্রিয়ং ।

হরিঃ পুষ্টে হৃদয়ভূতি কন্দমলদীপিতঃ

সঙ্গা হৃদয়কন্দরে ক্ষুরত্ব বঃ শচীনন্দনঃ ॥

যিনি চিরকাল অনাশ্রিত উন্নতোজ্জ্বলরস স্বীয় ভক্তি, শ্রী প্রদান করিবার জন্য রূপা করিয়া কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাহার দেহকান্তি স্বর্গের স্থায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, এই শচীনন্দন শ্রীহরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে ক্ষুরিত হউন ।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য ।*

জগতপাতা জগদীশ্বরের স্বজিত ব্যবতীয় জীব জন্তর মধ্যে মনুষ্য জাতিই সর্বপ্রধান । মানব মাতেই সকল জীবের উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত । “মহা শব্দে” উক্তর অপত্যার্থে “ক” প্রত্যয় করিয়া, মানব এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব মানব মাতেই মহুর পুত্র । মহু আমাদিগকে যেকণ আদেশ করিয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করাই আমাদিগের উচিত । ঈশ্বর যত প্রকার জীব-সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে মানব জাতিকেই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়াছেন, অত্যাশ্র প্রণী অপেক্ষা মানবকেই অধিক পুরিমাণে বিচার শক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন । তাই মানব জাতি সকলেরই উপর আধিপত্য লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । সুতরাং ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্য মাতেই ঈশ্বরের সৃষ্ট এই জড় জগতে তাহাদিগের বুদ্ধি ব্রহ্মি ও বিচার শক্তির সাহায্যে সকলকে সুখ শান্তি প্রদান করিবে বলিয়াই যেন তিনি এই মানব জাতিকে সর্বোৎকৃষ্ট জীবরূপে জন্ম দিয়াছেন । সিংহ, ব্যাঘ্র, শূন্য প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ, হাতী ঘোড়া প্রভৃতি গৃহ পালিত অথচ মানবের বিশেষ উপকারী বলবান অতিকায় প্রাণিগণ মানবের বুদ্ধি বলেই তাহাদিগের

* পৃথিবীর ব্যবতীয় প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটগণের ও সুবিখ্যাত সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের নিকট সুপরিচিত স্যার স্বামী যোগানন্দ ভারতী সরস্বতী মহারাজ কে, সি, এন্স, আই লিখিত ।

মহাত্মা স্বীকার করিয়া থাকে। এমন যে মহা ধল স্বভাব যুক্ত বিম্বর সর্প, সেও মনুষ্যের বুদ্ধি কৌশলে বশীকৃত হইয়া, তাহার ইচ্ছামত কত প্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব মানব জাতি যে সর্বপ্রধান প্রাণী, তদ্বিবরে স্মার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই শাস্ত্রে ও দেখিতে পাই,—

“অন্তুনাং নরজন্ম হুল্লভমতঃ পুংস্তং ভতো বিশ্রুতা,

তস্মাৎবৈদিক ধর্ম্ম-মার্গ-পরতা বিব্রতমস্মাৎপরম্।

আত্মানাম্ বিবেচনং স্বমুক্তবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-

মুক্তিনেী শত জন্ম কোটি মুকুতৈঃ পুণ্যৈর্বিলাসিত্যভে ॥”

অর্থাৎ জীব মধ্যে নর জন্ম হুল্লভ মানব মধ্যে পুরুষ, পুরুষ মধ্যে বিশ্রু, বিশ্রু মধ্যে বেদবিহিত ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার বেদ-ধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা প্রধান। যিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ অবগত হইয়াছেন, তিনি বেদ ধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা হইতেও শ্রেষ্ঠতর বিচারদর্শীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত একাত্ম ভাবে অবস্থিত, তাহাকে শ্রেষ্ঠতম বলা যায়, সেইরূপ অনুষ্ঠান-কেই মুক্তি কহে; পরন্তু শতকোটি জন্মাজ্জিত পুণ্য ব্যতীত তাদৃশী মুক্তি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই।”

শাস্ত্র বাহা বলিয়াছেন তাহাত উপরে উল্লিখিত হইল এখন ইহাই বিচার্য যে, আমরা যে এই মানব দেহ লাভ করিয়াছি, ইহার দ্বারা কি কেবল সংসার প্রতাপালন আত্মীয় কুটুম্বগণের ভরণ পোষণ ও আমাদিগের অঙ্গ সৌষ্ঠব প্রভৃতির সুখ সচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করিলেই আমাদিগের কার্য শেষ হইল? অথবা আরও কিছু কর্তব্য অবশিষ্ট আছে? তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমভঙ্গর আমরা এই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি। এই মানব জন্ম আমাদিগের শেষ জন্ম। আমরা ঈশ্বরের হজিত শেষ জীব, মাতের কোলের ছেলে বড়ই আগরের ধন, অতএব কেবল পিতা মাতার আদরে ছেলের মত খেলা খেলার মত থাকিলে চলিবে না; পরন্তু শিতার আদিষ্ট কার্যগুলি বাহাতে সুসম্পাদন করিতে পারি, তদ্বিবরে সবিশেষ বদ্বাসন হইতে হইবে।

আজ এই প্রকাণ্ড ভূষণ শৃংখলার অশাসিত হইতেছে কাহাদিগের বুদ্ধি বলে ? একমাত্র মানদিগেরই বুদ্ধিবলেই কি এই ভূষণল নানাবিধ সূক্ষশাস্ত্র আকর হইয়া দাঁড়ায় নাই ? পরমেশ্বর আমাদিগের জীবন ধারণোপযোগী নানাবিধ শস্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা যদি আমাদিগের বুদ্ধি বলে সেই সকল কল জমাইয়া না লইতাম, তবে কি আমরা তাহাদিগের রসাস্বাদনে আমাদিগের রসনার বাসনা পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিতাম ? নানাবিধ শিল্প কর্মাদির দ্বারা যদি আমাদিগের পরিধেয় বসন ভূষণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া না লইতাম, তবে কি আমরা আজ নখন মনোরঞ্জনকারী নানাবিধ পরিচ্ছদে আমাদিগের দেহ আবৃত করিয়া, আনন্দিত হইতে পারিতাম ? তাহা হইলে আজ আমাদিগকে বন্য পশুদিগের ন্যায় নদীবাহার বনে গলে বিচরণ করিতে হইত । আজ যদি বুদ্ধি বোঁগলে আমরা নানাপ্রকার যান বাহনাদির আবিষ্কার না করিতাম, তবে কি আমরা অন্যায়সে পৃথিবীর একপ্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে গমনাগমন করিয়া, তত্তৎ প্রদেশের মানবসঙলীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আমাদিগের পরস্পরের স্বার্থ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে সক্ষম হইতাম ? তাহা কখনই হইত না ; বরং আমাদিগকে শিশুভাবের জন্মের ন্যায় একস্থানে বসিয়া থাকিতে হইত । তবেই দেখা গেল, আমরা মানব যাত্রাই এই সকল গুণ বিশিষ্ট হওয়াতেই সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছি ।

উপরে যে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা গেল, তাহা জড়জগতের উন্নতি সম্বন্ধীয় । কিন্তু আমাদিগের ইহা ছাড়া আরও একটি মহান কর্তব্য পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে । আজ এই সুহৃৎ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া, আমরা সেই সুমহান কর্তব্য কর্ম সংসাধন করিবার জন্য একটাবারও চিন্তা করিনা । আহার, বিহার, শয়ন, স্বপন ইহাতো সকল জীবেরই আছে । বাসা বাঁধিয়া স্বয়ং সংসার করিলে আর আত্মীয় স্বজনগণের প্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিলে, তাহাতে কৃতকার্য হইলেই যে আমাদিগের কার্য শেষ হইল তাহা নহে । উহাও সকল জীবেরই আছে । ঐ জ্ঞান ত পশু পক্ষী প্রভৃতি অশ্রান্ত জীব অন্তরও আছে । অতএব কেবল মাত্র ঐকপ জ্ঞানের বশবস্তী হইয়া, আমাদিগের এই নবরংমেই সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে আমরা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিনা । আমার এই কথা সমর্থন করিবার জন্যই আমি চণ্ডী হইতে

সুৰথ রাজা ও সমধি নামক বৈশ্যের প্রতি মেঘন মূনির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, দেখাইতেছি । তিনি বলিয়াছেন,—

“যতোহিজ্ঞানিনঃ সৰ্কে পত্ত পক্ষী মৃগাদয় ।”

অর্থাৎ মনুষ্যের জ্ঞান বলিয়া, তুমি বাহার উল্লেখ করিলে, সেই জ্ঞান পত্ত পক্ষী মৃগ প্রভৃতির ও আছে । সেই মমতা প্রভৃতিকে যদি জ্ঞান বল তবে তাহা অন্য জীবের কি নাই ?

জ্ঞানেহপি সতি পশ্যত্যান্ পতগাঙ্গাবচক্ষুযু ।

কর্ণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড়মানানপি স্তুধা ॥”

পক্ষীও চকুদ্বারা আহাৰ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তাহার শাবকের মুখে প্রদান করে । তাহারাও কুল্লার নির্মাণ করিয়া, আপনারা নিরাপত্তে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লয় । তাহারাও সম্ভান জনন ও পালনাদি দ্বারা ঈশ্বরের জীব সৃষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে । তাহাদিগকেও মায়া, মমতা, ক্রোধ প্রভৃতির বশতাপন্ন হইতে দেখা যায় । অতএব সম্ভানের অঙ্গ দাতা হইলে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করিলে, আপনার স্বার্থে আঘাত লাগায় ঝগড়া, ঝারামারি করিলে ও বাসস্থানাদি নির্মাণ কবিয়া তাহাতে স্নেহে অবস্থান করিলেই জ্ঞানী হওয়া যায়না । প্রকৃত জ্ঞান তাহাই, যে জ্ঞানের তুলনা নাই । যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, ঐশ্বর্য, প্রত্যাশা পরম-কারণ সত্য-সনাতন ঐহিক চরণ লাভ করিয়াছিলেন, যে, জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, শুকদেব গোস্বামী আজন্ম সন্ন্যাসীরূপে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিয়া, ভগবানের নাম গানে রত থাকিয়া, আপনাকে ধন্য ও শাস্ত্রীয় উপদেশে ত্রিলোক পবিত্র করিয়াছিলেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, মহর্ষি নারদ অহনিশি হরিগুণানুবাদ কীতন করিয়া, ত্রিজগৎ বিমুগ্ধ করিয়া ছিলেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, বুদ্ধদেব আজ জগতবানীকে চিরশ্রুণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, ঐচৈতন্যদেব আসমুদ্র হিমাচল হরিনামের বন্যার ভাসাইয়া দিয়া কত কত পাপী তাপী নারকীকেও উদ্ধার করিয়া, তাহাদিগের মানবজীবন ধন্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন, যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া, মথানুভাব ভাস্করানন্দ, ত্রৈলোক্য স্বামী প্রভৃতি কতকত মহাপুরুষ বিষয় বাসনা পরিভ্রাণ করিয়া, সন্ন্যাস ধর্মরূপ পরম ধন্যচরণে আপনাদিগকে কৃতাৰ্থ ও অগজ্ঞকে সুশিক্ষা দান করিয়া, তাহাদিগেরও হৃদয়ের কুসংস্কার রাশি বিদূরিত

করানান্তর অমল ধবল প্রবল জ্যোতিতে তাহাদিগের অন্তর আলোকিত করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। আর এই জ্ঞানলাভের জন্যই আমাদের এই মানবদেহ ধারণ। অতএব মানদেহ পরমপিতা পরমেশ্বরের কৃপালাভের একমাত্র সোপান স্বরূপ। যদি আমাদের দুর্ভাগ্য মানব জন্ম একবার বিফলে যায়, তবে আর আমাদের দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদেরকে অধম জন্ম লাভ করিতে অর্থাৎ degraded (ডিগ্রেডেড) হইতে হইবে। একটা বালক first class এ (ফার্স্ট ক্লাসে) পড়িতে পড়িতে অমনোযোগিতার জন্য যেমন নিম্ন ক্লাসে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয়; সেইকপ আমরাও সেই বিবাহাত্যাত্তর সার্কিভোমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবজীবন রূপ ফার্স্ট ক্লাস (প্রথম শ্রেণীতে) উন্নীত হইয়া, আমাদের নিজ নিজ অসতর্কতা হেতু আমাদেরকে অধম যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। অর্থাৎ আমাদেরকে নিকট জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।

ভরত রাজা আপনার রাষ্ট্রস্বার্থ্যাদি পুস্তকে প্রদান পূর্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্মা-বলম্বন করিয়া, বনগমন করিলেও একটা যুগের মায়াব আবদ্ধ হইয়া, শেষে ভগ্নগত চিত্ত হইয়া, দেহত্যাগ করায়, তাঁহাকে যুগরূপে জন্ম পরিত্রাণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু যুগ দেহ ধারণ করিলেও সেই জন্মে তাঁহার পূর্বজন্মের স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরুক থাকায় আবার সুহৃৎ মানব জন্ম লাভ লাগসায় অবিরত সেই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া, পুনর্বার মনুষ্য দেহ লাভ করিয়াছিলেন। মায়া মোহে অভিভূত হইবার আশঙ্কায় এক্ষণে আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, নীরবে হরিসাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া, কালে ঐহিকের ত্রীচরণলাভে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। ভগবান ঐকৃপ্য অর্জুনকে উপদেশ দিতে বাইয়া, বলিয়াছিলেন,—

“যং যং বাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।

তং তমেবৈতি কোত্তেয় ! সদাত্ত্যাবশ্যবিতঃ

অর্থাৎ অত্কালাে যে যেকপ ভাব স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করে, হে কোত্তেয়। সে সেইকপ কলেবরই পুনর্জন্মে লাভ করিয়া থাকে। তাই বলি আমাদেরকে এক্ষণে কর্তব্য এই যে, যেন এক নিমেষের জন্যও আমরা সেই বিব বিবাত্যাকে না ভুলি। যদি আমরা এই সকল উপদেশ অবহেলা করিয়া

আপনাদিগের কর্তব্য কর্তৃক বিষ্মিত হই; তবে আত্মাদিগকে আত্ম হত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। ইহাও আমার অকপোল করিত কথ্য নহে। আমি শাস্ত্র হইতে বুক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইব। বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থ বলিতেছেন যে,—

“লক্ষ্য কথকিয়নুজন্ম হুহুভং

তত্রাপি পুংজং শ্রুতিপারদর্শনম্।

যন্তাস্তমুক্তো ন যতেত মৃতবীঃ

সহ্যাস্থহা স্বং বিনিহন্ত্যসদৃগ্রহাং

অর্থাৎ পুণ্যবলে মানব জন্ম লাভ করিয়া, পুংজ, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদজ্ঞতা থাকিতেও যে ব্যক্তি ভব সঙ্কট হইতে আত্ম-পরিভ্রাণের জন্য যত্ন পরায়ণ না হয়, সেই মূর্খ ব্যক্তি অসদ বস্তু গ্রহণ নিবন্ধন আত্মবাতী বলিয়া পরিপালিত হয়।

কেবল অহিংসেব সেবন অথবা উদ্বুদ্ধনাগি দ্বারা মৃত্যুকে আদিষ্টন করিলেই যে, আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হয়। তাহা নহে কিন্তু যে ব্যক্তি এই ভবসাগর-পারে যত্নবান না হইয়া, দুখের কালবাগন করে এবং শাস্ত্রাদির চর্চায় রত হইয়া সাধু সনাত্তার সহবাসে জ্ঞানোন্নতির চেষ্টায় একটা দিনও যত্ন না করিয়া, বিফলে এই হুহুভং মানব জীবন প্রাপ্তির উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে সেই প্রকৃত আত্ম-হত্যাকারী, এবং আইন অনুসারে বর্তমান যুগে তাহার পার্থিব রাজন্যও ভোগ করাও কর্তব্য। আমার মতে সম্প্রতি এই দুই মতি থলন্যতাব সম্পন্ন অপর্যাপ্ত-চরণে অভ্যুত্থ পাকুদিগকে সুশাসিত করিবার জন্য একটা নব রাজবিধান প্রণয়ন করা উচিত।

এই পাপমতি কুলদায়গণ সমাজের যত অকল্যাণ সাধন করিতেছে, এত আর কেহই নহে। ইহারাই বাস্তবিক আজ কাল উদ্ধার শ্লিগুণের বস্ততা স্বীকার করিয়া, মানব জীবনের উদ্দেশ্য একেবারে লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিতেছে। এই উদ্ধার সমাজকে অগত্যা রাজবিধানের অধীন করা বিশেষ আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে।

আজ কাল যে ব্যক্তি ভগবতুপাসনায় নিযুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে, সে-ই এই সকল হুহুভংকারী দিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না। ইহাদিগের দ্বারা

ঐ সকল পুণ্যবানগণ নাক্স প্রকার নির্ঘাতিত ও নিপীড়িত হইতেছেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি ও করিতেছি ।

অতএব মানব জীবনের শুভ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আজ এই যে, প্রবন্ধটি আমার বন্ধুবর্গের অনুরোধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, যদি ইহা সাধারণের মনোমত্ত হইয়া থাকে ও এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিয়া যদি কাহারও জীবন ধন্য হয়, তবে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। তাহার পর আমার আর একটা কথা এই যে, পূর্বে যে আমি রাজ বিধানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি তাহার কারণ এই যে, আজ কাল পার্শ্বব রাজ বিধানকে সকলেই ভয় করিয়া থাকে, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর জাগতিক রাজা সেই সন্তোষার্থ্যামী রাজারই প্রতিনিধি স্বরূপ। অতএব তৎকর্তৃক আমরা সেই শমন রাজার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথকিং আশা করিতে পারি বলিয়াই আমি পূর্বে উহার উল্লেখ করিয়াছি। আজ এই খানেই আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীখুন্তীর-আত্মকথা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পরে)

— :: —

হু' একজন 'শঙ্ক-গোপা'-গণ্ডিত বলেন ঐ যে ব্যাপার হয়, সেটা ১৫৩০ শকে। ওহে বাপু! অত নাক মুগ শিটকো না।' বলি অত ঠিক ইতিহাস আমি জানিও না, আর আছে কিনা, তাই বা কে জানে; তবে বেশীর ভাগ মনিষ্যরা যা' বলেছে, যা' শুনেছি, তাই বলছি, বিগ্রাস কবুতে হয় কর, না হয়, যতদিন না পাখুরে কয়লাব দোকানের নিচে তাত্র ফলক বাহির হয়, তত দিন ত্রুণ নাক শিটকেই থাক ॥

ইয়া তার পর—

“বোণ বোল বলি প্রভ চতুর্দিকে পড়ে।

পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে ॥

সনে ঐতু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোলয়ে সদায়

বাহু হইলেও বাহু কথা নাহি কয়।

এই সব দেখে শচীমা বুড়ির ত' হ'ল টুকু হিরি। সৰ্বদা যা' ভয় তাই
বুঝি হয় ॥

ই। করে পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হয়ত কতবার ডেকে ডেকে
একবার সাড়া পান।

যা'ওবা উত্তর পান তার না আছে মাথা না আছে মূণ্ড, কোনই মানে হয় না।
ঐ যা'কে গ্রাম্য ভাষায় বলে "কথাও না কথার দরুণোন্নয়" এটুকু তাই। হয়ত
বহু ডাকের পর উত্তর শুনে বলেন "ও বাপ নিমাই। যাও বাবা স্নান আর্শা
কর গে।" নিমাই চাঁদ হয়ত তার উত্তরে বলেন।

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি।

ভক্তি বশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী ॥"

গতিক ত' এই রকম। বুড়ি কেঁদে কেঁটে সারা। কা'কে ডাকেন, কি
করেন কিছুই গোছ পান না। মেশা মশায় চল্লিশের পরমআজ্ঞায়, কিন্তু
তাঁ'কে ডেকে যে কিছু পরামর্শ গ্রহণ করবেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁ'র যা নেই ;
তিনি নিমাই চাঁদকে যেমন দেখেন আর অমনি চক্ষু কপালে তুলে "জয়রাম
জয়রাম" জপ কবতে শুরু করেন, সে জপের আর কামাই নাই! কি হয় ?

শেষকালে শ্রীবাস চল্লিশ পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকা হ'ল। ঐ নাও আবার কি
প্রশ্ন হ'ল ? ইনি কে ? কি বিপদ এ সবও বলতে হবে ? আচ্ছা বলি
শুন, ইনি নবদ্বীপের একজন জাতি জ্ঞানী বয়োবৃদ্ধ সুভদ্র ; তবে তবু বিদ্রা বলেন
আর যা' বলেন সেটা খুব জমাট সত্য-তত্ত্ব-কথা, সেই কথার গোছা, হুই চারটা
বলি শুনে যাও। সব সময়ে মনেও পড়ে না আর আমার এই বুদ্ধ বয়সে তত
সাজিয়ে বলবার ক্ষমতাও নাই, যা পারি বলি :—

ঋতি বেদ, পুৰাণের মত যে ছ'টার পাঁচখানা পোকা কাটা পু'থী আছে
তাতে ব'লেছে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হ'চ্ছেন আমার ঐতু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
মহাপ্রভু। যিনি পূর্জন্য তিনি হ'চ্ছেন ঐ শ্রীহট্টের শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র মহাশয়।
ঠাকুর মা বরীয়াসী হ'লেন কলাবতী। শ্রীনন্দ যশোমতি হ'লেন, জগদ্বাণী মিশ্র

দাদাঠাকুর, আর শচীমা বুড়ী। মা যশোদার বাপ হ'লেন ঐ আমাদের চতুর্থ মহাশয়, কি নাম ভাল ?— ইয়া নিগাহর মহাশয়। শ্রীবাস হ'চ্ছেন সে কালের সেই লড়াই বাধান যুঁনি শ্রীযুক্ত নারদ ঠাকুর।

এই ঠাকুরটী এলেন ; হুঁচার বার অল্পলি সকালন ক'রে বয়েল " কিছু ভয় নাই শচীমা ! তোমার কিছু ভয় নাই এ সব কিছু নয় ভাবতে হবে না আগা গোড়ার বাধান ঠিক আছে ।" শচীমাও বুকে না বুকে কতক হির হ'লেন। এদিকে আচার্য্য শ্রীঅধৈত প্রভু—

কি বলছিলাম ? ইয়া তার পর শ্রীআচার্য্য প্রভু রাতে কি এক স্বপ্ন দেখে, ষড় মড়িয়ে উঠে আত্মদে ধিন্ ধিন্ করে একেবারে পাগ্‌লা শিবের মত নৃত্য শুরু করেছেন। ব্রাহ্মণী শ্রীসীতাদেবী ছুটে এসে, বুড়োর কাণ্ড দেখে অবাক ! বুড়ো এত নাচে কেন গো ? বাতাস লাগ্‌লো না কি ?

ঐ যাঃ আমার কি যে রোগ, কিছু বুঝতে পারিনি, কিছুই পোছ নাই, আগের কথা শেবে, আর শেষের কথা আগে ; ছিঃ ছিঃ !!

উদ্দেশ্য, উপায়, উপকরণ, উপভোগ, কোথায় কি, কোন্‌টা কোথায়, পোজায় যাচ্ছে কে জানে ! যা'ক্‌ পে। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জান ? শ্রী অধৈত ঠাকুরের টোলে শ্রীপ্রভুর অগ্রজ বিখরুপ দাদাঠাকুর যখন ভক্তি শাস্ত্র পড়েন, সেই সময়ে শ্রীপ্রভুর মধ্যে মধ্যে আগমন হইত। তিনি তখন একটা তরুল, চপল, সুন্দর বালক। বুদ্ধ আচার্য্য তাঁকে দেখে ভেবে ব'সেছিলেন "এটি একটা অবতার।" তারপর বহুদিন গেছে। তাঁর সে চিন্তার কার্য্য-ফল এ বাৎ কিছু দেখেন নাই। তারপর, গত কয়েক দিন পূর্বে একজন প্রতি-বাসী, প্রভুর সব জীবনের এসস আচার্য্য ঠাকুরকে সুনাইলেন। আচার্য্যের মুখে অন্ন আনন্দের হাসি খেলিল। হুঁচার দিন পরে, এক দিন এক উরে 'বারেন্দ্র বায়ু' আচার্য্যের ভাসবন্তের কোন্‌ এক স্থানের কি এক তাৎপর্য্যে বিপর্য্যর বোধ করে, উপবাস করে দাঁড়ে কুটোলয়ে "চিৎপটাং" হ'য়ে শু'য়ে রইলেন। ঐদের কার্য্য ঝরাই জানেন !!

ক্রমে সিদ্ধা। পরে বঙ্গ বর্ণন। কে যেন বলছেন "আর চিন্তা করিওনা। ভোমার সংকল্প সিদ্ধ হ'য়েছে। বরং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ'য়েছেন।"

যেসম ইহা কপ্পে প্রবণ করা আর তারপরই ঐ নৃত্য। বুঝলে, ব্যাপারটা কি? তারপর আমার দখল তাঁর একদিন ঐগদাধর চন্দ্রকে সঙ্গে ল'য়ে নিজেই আচার্যের মন্দিরে হাজির। তা দেখে, বৃদ্ধ গঙ্গাজল, তুলসী, ল'য়ে 'নমো ব্রহ্মণ্য, দেবার' ইত্যাদি মন্ত্র ব'লে দস্তর মত ঐপ্রভুর পূজা শুরু ক'রে দিলেন। বেচারী গদাধর, আচার্য্য বুড়োর কাণ্ড দেখে, প্রভুর পাছে অবল্যাপ হয় এই ভয়ে ভেবেই সরি। গেল কিছুদিন। তারপর—

“জানিলা অদৈত হৈ'ল প্রভুর প্রকাশ।

পত্নীকিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস ॥

এদিকে ঐঅদৈত প্রভুর, ঐ পূজার কাণ্ড ধীরে ধীরে পাঁচ কাণ্ড হতে লাগলো। আর সমস্ত বৈকুণ্ঠগণ সহ প্রায় সর্ব সাধারণ লোকলেই ঐপ্রভুকে স্বয়ং ঐক্য জ্ঞানে মন প্রাণে ভক্তি করিতে লাগিল। রোজই বহু দূর দেশ হইতে ধীরে ধীরে ভক্তগণের আগমন আরম্ভ হইল। নদীয়ার ভক্তগণের সমাবেশ হইল।

আজ কাল লক্ষ্যার পর হইতেই আমার প্রভুর বর্হিবাটীতে সংকীৰ্ত্তন করিতে সকলে একত্রিত হইতেন। আনন্দ! আনন্দ! নদীয়ার আনন্দের স্রোত চলিল। এই সময়ে প্রায়ই আবেগে ঐগৌরচন্দ্র বলিতেন “ভাই সকল! কানাই নাটশালায় যখন গয়া থেকে আসি, সেই যে একটি পরম সুন্দর কৃষ্ণ বর্ণের রাখাল বালুক নাচিয়া নাচিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে এসে আমাকে আলিঙ্গন করিল স্নেহেখা গেল, বলতে পার? ভোগরা দয়া ক'রে তাঁকে আমার কাছে এনে দাও। আর ভোগরা সকলেও তাঁহাকে ভজনা কর।” এরূপ ভাবের বিরাম নাই।

কিছুদিন বার, ক্রমে ঐবাস মন্দিরতে রাত্রে কীৰ্ত্তন আরম্ভ হইল। আর বাজে লোকের গোল নিবারণ করিবার জন্য দ্বার বন্ধ করিয়া দ্বারে গঙ্গাধার নামে এক ভক্তকে দ্বার রক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হইল। সর্ব সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কেবল অদৈত লইয়া কীৰ্ত্তনানন্দ। চলিল কিছুদিন। ক্রমে নিম্নকের দল নানারূপ কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে চণী চরণ নামে একজন ঘোর শাক্ত অধিকেন সেবি ব্রাহ্মণের ‘রকে’ প্রাতঃকালে

য়েজাই এক “ভ্যান্ডাড়ার” আড্ডা বসিত। তাদের কণ্ঠ ছিল ভাষাহু মেঘের
আর বুধা পর হুংসা, পর চর্চা।

একদিন চণ্ডি বললেন—

ওহে “এ গুলোর হইল কি বাই।

রাত্রে যে আর নিদ্রা হইবার উপায় নাই।”

একজন লেলে বকখানিক ছিলেন তিনি ভারি মুখ সিট্কে বললেন “জ্ঞান
বোপ এড়িয়া একোন বিচারে?” এ লের এসব কি কাণ্ড? হিঃ হিঃ!!

একজন গুরি মধ্যে রাজনৈতিক ছিলেন তিনি রজনহীন বদন হিন্দুমানীর
বটুরা সকেচেন সহৃদয় ভাবে, তুর্ভে বললেন—“ভায়া! , সে সব কথা
বাউক, এখন আদং কথা কি জান? ঐ বেটাদের জালায় আমাদের মত
মুশলমান ভেদেই বিপদ। আজ খাম্ কামুরায় শুনিলাম শীঘ্রই দুই খানি বহর
করিয়া ‘লম্বাবের’ ফৌজ আসছে। প্রীবেসে বেটাদের কি বলনা, ওরা ঢোল
তবলা নিংর কোড় জঙ্গলে সরে পড়বে; আর মরতে আমরাই ক্রী পরিবার
ল’য়ে বিপদে পড়ে মবো।”—

কি বলছ? তখন কি সত্য সত্যই ঐক। কিছু একটা হইতে পারিত?
ধর্ম কাছে কি রাজা বাধা দিত? হ্যা—তার জ্ঞান আ’চাধ্য কি? তখন
ছিল মুশলমান রাজা। আর মুশলমানদের বা ‘কৌর্তি, তা’ তখন পূর্ব
জাত্রাভেই ছিল। কেননা এই যে, ব্যাপার এটা হচ্ছে ১০০ শত বৎসর
আগে কার কথা। তখন হিন্দুদের পক্ষে কতকটা সুবিধের বাদসা আকবর-
জার রাজত্ব শুরু হয় নাই। কাজেই তখনো সেই সোমনাথ ধ্বংসের
আওয়াজ হেঁথা হোঁথা ছিল। তখন ঠিক বাঙ্গালী বললে এখন বা’ বুঝায় ঠিক
সে রকম একটা জীবই গজায় নি’। যে জাতি এখন প্রবল হয়, যে জাতি এখন
প্রাভাবি ক’রে; ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় সোক তা’দের দৃষ্টান্ত, তা’দের
সর্ববিধ অত্যাচার সাধারণজনের মধ্যে, তখন কিছু কিছু বিস্তার হয়।
এইটাই হচ্ছে নিয়ম। সেই জন্য তখন হিন্দুদের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে
মুশলমানদের অত্যাচার, কতক কতক ব্যবহার-কাণ্ড সমাজে ঢুকে প’ড়েছিল।

ক্রমশঃ।

প্রাণের কথা ।

—:—:—

প্রাণে ঐখম অভাব আসে, আপন পুরুষকার দ্বারা যখন সে অভাব যায় না, অতুল ঐখম, প্রচুর ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দ্বারা উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণের নানানিধ সেবা করিয়াও যখন প্রাণে শান্তি আসে না, সে অভাব মিটে না, তখন মানুষ সাধু-সঙ্গ খোঁজে, আপন আত্মীয়-বন্ধু-বাকবগণের সহিত মিলিত হইয়া কি করিলে সে অভাব নিবৃত্তি হয়, কি করিলে আধিভাষি-প্রাণীড়িত স্তূতিভেদ্য অদনাক্ষকারে কস্ম-করদাভিষাতে বিভাড়িত ভাণিত প্রাণ শীতল হইবে তাহার জন্য ব্যাকুল হয়। আজকাল সমাজের মধ্যে যোগাবা শ্রেষ্ঠবলিয়া, উচ্চশিক্ষিত বলিয়া গরব করেন তাঁতাদিগের মধ্যেও এই অভাবের তাড়নায় জর্জরিত বলিয়া অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই অভাব অল্পভূত হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টিত হওয়াও যে, মঙ্গল-রবি প্রকাশের শুভ পুন্স মুহূর্ত্ত তাহাতে তার সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই যে অভাব, এট যে তাত্ত্বিক ইতার নিবৃত্তির উপায় কি, তাহাট আলোচ্য। যোগ বাগ ভ্রত তপস্যাদি নানারূপ কঠোর অমুষ্ঠানের কথা আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কিন্তু সর্বাংশে সঙ্গের এই হাতভালের নিবৃত্তি যে একমাত্র সাধু-সঙ্গ দ্বারাই হইয়া থাকে তাহাতে আর বিলম্বাত সন্দেহ নাই। এতৎসম্বন্ধে মহাপুরুষগণ প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং বহু বহু দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন।

* * *

ঐমন্তাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিলোপাখ্যান আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভগবান ঐকপিলদেব স্বীয় জননীকে বলিয়াছেন, —

সত্যং প্রসঙ্গামমবীথ্যসংবিদে' ভবন্তিহংকর্ণসায়নাঃ কথাঃ ।

ভজ্যেবনাদাংগণংবস্মনি শ্রদ্ধাপ্রতিভক্তিরমুক্রিয়য্যতি ॥

অর্থাৎ, আমার (ভগবানের) ভক্তগণের সঞ্চিত হৃৎকণ বসায়ণ যে আমার লীলাস্তর কাহিনী তাহা আলোচনা করিতে করিতেই ক্রমে ক্রমে আমারে প্রজ্ঞা, রুতি ও ভক্তির উদয় হইবে। তাহা চলিলে আর অভাব কোথায়? কাজেই এই সর্বান্বিত-নিবৃত্তিকারী ঐক্যগানে তঁজি তাঁতের প্রধান উপায় ভগবৎভক্তের মঙ্গ। ভক্তি শাস্ত্র বলেন,—

“ভক্তিত্ত ভগবৎসঙ্গেন পরিত্যজ্যতে।”

অর্থাৎ ভগবৎভক্তের মঙ্গ দ্বারাই ভক্তি উপজাত হয়। কিন্তু আমরা আলোচনা পাইয়া, পাণ্ডু ছাত্তর না আসিলে ভগবৎসঙ্গাপনাতো দূরের কথা ভগবৎভক্তের সংস্কৃত মনেতে চাছিল। অগ্নিতে কাণ্ড লিলে যে পুড়িয়া মরিতে হয় এটা জানিয়াও আমরা ভগবৎসঙ্গ অসংকল্পে নানাবিপ অসং কামনা বাসনা রূপ ইচ্ছা দ্বারা অগ্নি অধঃ প্রক্ষেপিত করিয়া তাহাতে কাঁপ দিয়া পুড়িয়া মারিতেছি।

* * *

ত্রিভাণ্ডক প্রাণে শান্তি দিতে, শান্তিশতক বলিগাঠেন,—

‘অপান্ন দামাতিং বিশতি শলতো দীপদহনং
ন মৌনানুগাণি ভ্রাতৃবৃত্তবর্জিত মনোহাতি পিণ্ডিতং।
বিজানন্তোহপ্যেতান্ বচ্যমহ বিপজ্জ্বল জটিলান্
ন মুকামঃ কামানহহ। গঠনো মেঘে মতিমা ॥’

অর্থাৎ, পতঙ্গ জানে না যে, পুড়িয়া মরার কি জ্ঞান তাই সে অগ্নিতে কাঁপ দেয়, আর মৎস্য জানে না যে, যে নাৎসবৎ সে আনন্দে অন্ধের করিতেছে তাহার মধ্যেই তাহার প্রাণ সংহারক সুশীত বর্জিত রহিবাছে তাই সে লোভ-পরবশ হইয়া বর্জিত সহিত মাংসখণ্ড গিগিয়া আপন জীবন হারায়। কিন্তু মায়ার কি ভয়ানক ক্রমতা, আমরা জানি যে, ভোগের বিষবগুলি বিপদ পরিপূর্ণ, উহা ভোগ করিলেই সর্বনাশ নিশ্চিত, তথাপি উহা ভোগ করিতে পারি না। কিন্তু সংসার দ্বারা বধন চিত্ত ভক্ত হয়, তখন ঐ সকল অনিত্য বিষয়বাসনা, ভোগ লালসা দূর হইয়া ঐক্যগানে প্রীতি জন্মে। আর একবার ঐক্যগানে নির্ভরতা আসিলে অন্য কামলা বাসনা লটুয়াও যদি ভগবৎসঙ্গান্ন আরম্ভ করে তবে শেষে ঐক্যগান নিঃসঙ্গে লয়া করিয়া তাঁহাকে ‘নিজগাদেশ’ বলা করেন। ঐক্যগণকে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

“স্বয়ং বিশ্বস্তে ভক্ততামনিচ্ছন্তা মিচ্ছাপিধানং নিজ পাপপল্লভম্।”

এইভাবে হয় বলিয়াই, প্রবরশায় প্রথমে রাজ্যার্থ্য কামনা করিয়া উপাগনা আরম্ভ করিয়া শেষে যখন সেই পান-পত্র লাভ করিলেন তখন তপস্বান তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন ও তিনি আর বর লইলেন না, কারণ তিনি নিজ মুখেই আপন প্রাণের কথা তপস্বানকে বলিয়াছেন,—

“হানাত্বিলাবী তপসিস্থিতোহহং ত্যং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীশ্র গুহ্যং।

কাচং বিচিহ্নমপি দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন বাচে ॥”

অর্থাৎ, রাজ্য-প্রাপ্তির আশার তোমার তপস্যা আরম্ভ করিয়া দেবেশ্র মুনীশ্রগণেরও অপোচর যে ঘন, তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, এটা ঠিক বেশ কাচ অব্বেষণ করিতে আসিয়া দিব্যরত্ন লাভের ন্যায় হইয়াছে। সুতরাং হে স্বামিন্। আমি কৃতার্থ হইয়াছি আর বর চাহিনা। তবুই দেখা যায় যে, প্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দে একবার ভক্তের উদয় হইলে কামনা বাসনা আর ক্রমে গান পায় না, কেননা সকল কামনার সার মুক্তি পর্য্যন্ত ও তখন ভক্তের গৰ্ব্বভলে লুপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

‘যদি ভবতি যুক্তি দ ভক্তিবানশ্র জাশ্রা।

বিলুপ্তে চরণোভে নোহ স্য রাজ্যং ন কৌ ॥”

শ্রীমদেব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

ভক্তের ব্যাধি ও বিপদ ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র এন, এ, বি, এল ।)

—::—

“বিন্দি, কুকল্লুতি হেতু দেবের জনম,

জুখা তুলা ব্যাধি কুটা সংসার ধরম,

ভয়ানিতে কতু নাহি ঘন ‘অমোহিত,

স্বার্থ ভক্তঃ ত্বিনি, গুণিবে নিশ্চিতা।”

ঐশ্যবতধননোদ্ধৃত ঐশ্যভাবত ব্যাক্য ।

“পড়লে তুলে হুত্বাতী।

না পড়িলে ঠেংগার ভুতি।”

অন্যদেখে যে সকল বিজ্ঞবানী প্রচলিত থাকিয়া সংসার সমুদ্রে ভাসমান জনসাধারণকে দিকদর্শন করাইতেছে, উল্লিখিত বচনটী তদ্বাচ্যে অল্পভয়। ঐকান্তিক প্রত্যেক বচনই এক একটি বহু পরীক্ষিত সত্যের অভিযুক্তি মাত্র। কিন্তু মানাধি অজ্ঞাত ও জ্ঞাত কারণ প্রযুক্ত সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রমস্থল দৃষ্ট হয়। ধর্মশাস্ত্র বা জ্যোতিষ, শক্তি বিজ্ঞান বা রসায়ন, জ্ঞান বা ব্যাকরণ সর্বত্রই সাধারণ নিয়ম প্রারম্ভঃ ব্যতিক্রম বিহীন হয় না। তবে সে ব্যতিক্রম এক বিরল যে, তাহা দেখিয়া সাধারণ নিয়ম বিস্মৃত হইলে বিষম ভ্রান্তিতে পতিত হইতে হয়।

উক্ত বিজ্ঞবচনটীও সম্পূর্ণ অব্যভিচারী নয়। উহারও ব্যভিচার মধ্যে পরিগণিত হয়। বিজ্ঞাধী বহু সংখ্যক বহু পরিশ্রম শ্রীকার করিয়া বিজ্ঞার্জন করিলেন কিন্তু তাঁহার কপালে হুত্বাতী জুটিল না। পক্ষান্তরে অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি বুদ্ধিচাতুর্য্য-প্রভাবে প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ দেখিয়া বিজ্ঞার্জন লিপ্সু ও নিপ্রয়োজন এইরূপ ধারণা করা কি সমীচীন? না তাই দেখিয়া অভিভাবকগণ শিশুদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে নিবৃত্ত হইবেন? কুলটার বহুবিধ ও প্রচুর বস্ত্রালঙ্কার দর্শনে কোন দ্বাক্ষী-রমণী আপন নিধন পত্রকে ত্যাগ করেন? কেহই নহে।

এইরূপ, অনেকে আশা করেন ভক্তিলাভ হইলে জাহাঙ্গীর, প্রাণ ও মনের সহিত দেহও চিরস্থায়ী হয় এবং সাংসারিক আপদ বিপদও ঘটে নী। সুতরাং কোথাও কোন ভক্তের ব্যাধি বা কেনকপ ক্রোধ দেখিলেই তাঁহাদের মনে লজ্জারূপ সন্দেহ হয়। এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহারা ভক্তিদেবীর উপর ঈর্ষানুরাগ হইয়া পড়েন। ইহা জীবনমার্গের তাই এইরূপ হইবার একমাত্র কারণ।

ভক্তি অনুশীলনকারী প্রত্যেকেই জানেন যে, মৃত্যুই জীবনীমার শেষ সীমা নয়। ঈশ্বরও যেমন অনাদি ও অন্তহীন, জীবও তেমনি অনাদি ও অন্ত বিহীন। জীব ও ভগবানে পার্থক্য বা প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু কত! কখনই ভূত্ব জ্ঞাত্ব নহে। সুতরাং যতদিন ভগবান আছেন ততদিন জীবও আছে। কাজেই মৃত্যু তাহার শেষ ববনিকা হইতে পারে না। উহা অকাতর অভিনয়ের অন্ত

পট পরিবস্ত্রন মাত্র। অথবা ভগবদ্বর্শনাকাজী তীর্থযাত্রীর এক পাহানিবাস হইতে অল্প পাহানিবাসে গমন মাত্র। জীবের নয় নাই। কারণ, নয় হইলে শ্রীভগবানের লীলাভিনয় করিবে কে ?

বিশেষ, ব্যাধি বা বিপদ চিৎস্বরূপ আস্ত্রার হইতে পারে না। আত্মা অদ্বৈত, অক্লেশ্য, অক্ষয়, অব্যয়, অজর অমর। সুতরাং বাহারা দেহকে 'আমি' জ্ঞান করেন না, অর্থাৎ বাহারা দেহাশ্রয়িত্বমানী নন, তাঁহারা দেহের ব্যাধি বা ক্রেশে অভিজুত হুল না। ভক্তি তাঁহাদিগকে নিত্য সুখ-দেহীর সন্ধান দেখাইয়া দেয় এবং 'তরোয়িষ সহিষ্ণু' করিয়া ত্রিতাপ সহনে গম্য করে। ভক্তি, ভক্তকে বীর ও বীর করে। কৃষ্ণী বাহুদেব, পুরী মাধবেন্দ্র, ব্রহ্ম হরিনাম, প্রভু নিত্যানন্দ, রূপ সনাতন, রঘুনাথ ও রামানুজ প্রমুখ মহাশ্রীগণের নিষ্ঠীক ও জীবমুক্ত চরিত্র আলোচনা করিলে ভক্তির যে কি মহিমা, তাহা পাঠক নিঃসংশয়িত রূপে অবগত হইতে পারিবেন। বাহ্যিক ভয়ে এখানে বিরত হইলাম।

বীরও হইব, যুদ্ধ ক্রেশও সহিব না একথা যেমন হাস্যোদীপক ; ভক্তও হইব, সহিষ্ণুতার পরীক্ষাও দিবনা—একথাও ঠিক তজ্জপ। যদি কোন তথাকথিত ভক্তের সহিষ্ণুতার অভাব দৃষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাঁহার সাধনা এখনও অসম্পূর্ণ হয় নাই। সাধনা পূর্ণ হইলেই পরীক্ষার উদ্ভাব হইবেন। সে সাধনা কি ? না, প্রত্যহ নিজেকে ও নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত "গোপীজন বলভায় স্বাহা" বলিয়া সেই বিশ্বপতির পদ ভ্রান্তে সমর্পণ বা বিক্রয় করা। ভক্তের আমার বলিবার কিছুই নাই। আইনের ভাষায় বলিতে গেলে ভক্ত একজন বেনামদার মাত্র। ধনী সেই বিশ্বপতি, কিন্তু কি জানি কোন্ গৃহ ঐয়োজন বশতঃ তিনি গুপ্ত আছেন ও ভক্তজনের নাম ব্যবহারে সকল কার্য্য চালাইতেছেন। কাজেই বিক্রীত গুণে অবাদিতে যেমন কাহারও মমত্ব বুদ্ধি থাকেনা তেমনি হরি-পাদ-পঙ্কে সমর্পিত দেহেও ভক্তের মমত্ব বুদ্ধি থাকে না। ভক্তের আহার ব্যবহার, শোবাধ পরিচ্ছদ সকলই সেই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রার কার্য্য সাধন জন্য, আর সেই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রার নাম বশ কীর্তন ব্যতীত ভক্তের নিজের কার্য্য লগতে অন্য কিছুই নাই।

ভক্ত জানেন গোবিন্দ দর্শন পাইতে গোপীগণকেও ত্রিতাপবৃত্তান্ত প্রদীপবলী হইয়া প্রকীর্ণ-বক্সা হইতে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে যে ভক্তি

পাইতে হইবে ইহা অগম্যত্র ও অদ্রুত নয়। তাহাতে কাঁড় হওয়া দূরে থাকুক তদ্বারা আনন্দধার ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে এই ভরসা তিন আনন্দই হইয়া থাকেন।

এই সকল ভয়ের সম্মান বাহারা পান নাই, বাহারা এই অভিসুখ, না, না, নগণ্য জীবনকালকে সর্বস্ব বলিয়া মনে করেন এবং নিরন্তর পরিদর্শনপূর্ণ এই জগতস্বরূপ দেহকেই আশ্রয় বলিয়া আনেন, তাহাদের নিকটে ভক্ত জীবনের ক্রেশ বা ব্যাধি ভক্তি-সাধনার অন্তরায় হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? পরিত্রাণ পঠিন্দ্রের সাহায্য গামান্য আশ্রয়ের ভয়ে যে বালক অধ্যানে পরাধীন হয় তাহাকে মন্দধী ও মন্দভাগ্য ব্যাধিত আর কি বলা যাইতে পারে? বাহারা সুখী তাহারা 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' পণ করিয়া পড়াশুনায় রত হয়। আর বাহারা ভক্তির বিমল আনন্দ লাভেচ্ছুক তাহারা 'যথা তথা বা বিনধ্যাতু লস্পটো মৎপ্রাণনাশস্ত স এব না পর,' এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শাস্তিহুখে ইহ সংসারে বিচরণ করেন।

সে যাঁহা হউক, ভক্তের ব্যাধি বা ক্রেশ হয় কেন? কৃষ্ণ বা কৃষ্ণ ভক্তি তাহাকে রক্ষা করেন না কেন? এ বড় গুরুতর প্রশ্ন, বাহারা এইরূপ প্রশ্ন করেন তাহারা প্রকারান্তরে, জিজ্ঞাসা করেন যে, ভক্তির পথ কুহুমাকর্ষিত হয় না কেন? কিন্তু পাঠক! আপনি আনেন ঠিক, কোন্‌ লক্ষ্য কেবল দুঃখময়, কোন্‌ পথে আনন্দ কষ্টক নাহি? বাহার এই রচনা, বাহার এই বিবলোদার বিলাস-কানন তিনই আনন্দ কেন আনন্দের পথে পরীক্ষা থাকে!

আমরা এই পর্যন্ত তিনটি গুণ ও প্রাণাঙ্গিতে দেখিতেছি যে, ভক্তি অর্থে স্বাচ্ছন্দ্যে সত্ত্বরূপ করা নয় বা জগত্ৰাহারী অবসাদকর আশ্রয় প্রমোদে হাবু-ডুবু খাওয়া নয়; প্রাকৃত হৃৎ হৃদয়ার কঠোর কণ্ঠস্বরে আনন্দী ত্রিভাষ বা ক্লেশমান না হইয়া একান্ত মনে দৃঢ় বিশ্বাসে ঐতদ্বাসনের পন্থার বিন্দ্বের নিকট পৌঁছা যির রাখিয়া সন্তুষ্টিতে তাহার আদিত্য বা অভ্যাসিত কণ্ঠে রত থাকা ও তাহার নাম-বিশ্ব-স্বপ্ন-কীটনে নিরন্তর পরমাত্ম অলুচন করাই ভক্তি। পৌরাণিক গ্রন্থ প্রমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনা লস্করন বিদিত জরাজীব, বিশ্বকল, কবীরাদি ভক্তচরিত্র স্পষ্টাক্ষরে ইহা প্রমাণিত করিতেছে।

আমার পতি খুব উগারফর, আমার কোন দ্রব্য চাহিতে হয় না, চাহিবার পূর্বেই পাই, আমি আমার পতিকে বড় ভালবাসি। এ ভালবাসা বড় ? না, আমার পতির তাদৃশ উপায় ক্ষমতা নাই, আমাদের সর্জনদাই অভাব, কিন্তু আমার হাতের লোহা ও সীতার গিল্পুরের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই আমি সকল অভাব ভুলিয়া বাই, এখানে উৎসবে মগ্ন হয়, এ ভালবাসা বড় ?

“পড়িলেও মহাক্রোশে কেশবে যে ভক্তিমান।

স্বায়মতি অবিচ্যুত সেই সে তত্ত্ব প্রধান।”

ব্যাধি বা বিপদ বহির্গত হইতে পারে কিন্তু অতঃপূর্বের তত্ত্বকে আদৌ অবগম্য বা উপাস্য করিতে পারে না। পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবী তাঁহার সাক্ষ্য। কুন্তী বলিয়াছিলেন “হে কৃষ্ণ! আমার বিপদ লাগিয়া থাকুক, কারণ বিপদে তোমার স্মরণ ও দর্শন লাভ হয়, আর তোমাকে পাইলে বিপদ সম্পদে, শোক সুখে ও বিবাদ উৎসবে পরিণত হয়।”

এইভাবে যাহারা লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য শুল্ক পূর্ব মহাজনগণ কতকগুলি বিধ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যাহারা সে সকল সনাতার সমগ্র গাণন করিতে পারেন তাঁহাদিগকে অধিক তাপ ভোগ করিতে হয় না, অথচ ধীরে ধীরে বিজ্ঞান লাভ করিয়া আনন্দময় গোবিন্দ দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এখন দেখা যাক ব্যাধি বা বিপদের কারণ কি, কারণ—ভক্তি হীন জীবনেও বা, ভক্তিহীন জীবনেও তাই, কোন প্রভেদ অনুভূত হয় না। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন বা পৈতৃক রোগাদি হেতু ব্যাধি ঘটে। কিন্তু কতকগুলি বিশিষ্ট অত্যাস ব্যাকার তত্ত্বগত রোগ প্রবণতা অনেক কমিয়া যায় এবং সাবৃত্তগণ প্রায়ই দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। আর অনন্যোপাধি, অবৈধিকতা প্রভৃতি বহুবিধ দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কারণ বশতঃই বিপদপাত হয়। এ বিষয়ে ভক্ত ও অভক্ত কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। একই নিয়মে জগৎ শাসিত হয়। পুলিশের কর্ম করেন বলিয়া কেহ কি দণ্ড বিধির বহির্ভূত হইতে পারেন ?

কিন্তু ফলের প্রভেদ বিলকণ দৃষ্ট হয়। অতঃপূর্ব কারণে জীবনকে যোরা অপাড়পূর্ণ করিয়া তুলেন, তত্ব ঠিক সেই কারণে কেবল যে কোন অপাড়পূর্ণ সৃষ্টি করেন না তাহা নহে, বরং সে অবস্থায় তৎসব স্মরণের অধিক সুবিধা এবং

কোন না কোন ভাবী মঙ্গলের সূচনা আশা করিয়া ঐ অবস্থাকেও হৃৎপের কারণ মনে করেন না। তিনি “হৃৎবে শব্দধিরমলা হৃৎবেষু বিগতস্পৃহঃ ।”

পাঠক ! বদারা আপনায় হৃদয়ে সকল অবস্থাতেই অত্যন্ত ও বিমল আনন্দ বর্তমান থাকে সে মূল্যবান জিনিস, সে হরিতত্ত্ব মানব জীবনে যে কত প্রয়োজনীয় তাহা কি আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে ?

ভক্তগণ স্ব স্ব জীবন রক্ষার জন্য যত না ব্যস্ত, আত্মস্থ বা ইষ্টপ্রিয় তৃপ্তির জন্য যত না মনোযোগী, জীবের কল্যাণ সাধনে, আন্তর হৃৎবে মগ্ননে, জনতের হিতবিধানে তদপেক্ষা অধিক প্রয়াসী। সুতরাং অনেক সময়ে তাহাকে দেহ মেহাদি খাণ্ডন বিষ্মৃত হইতে হয়, স্বাস্থ্যের নিয়মাদি লঙ্ঘন করিতে হয়। কাজেই সেকপ অমিতাচার সহ ধাতু না হইলেই পীড়া উপস্থিত হয়।

আর বিপদ। ভগবৎপদে যার মতিস্থির আছে তাঁর আর বিপদ কি ? হইলেও ভক্ত তাহাতে আদৌ বৈধ্ব্যচ্যুত হন না। তাঁর বিপদকেও পরমমিত্র জ্ঞানে আলিঙ্গন করেন, কাহারও প্রতি ঘেঘ বক্রোতি হিংসা হৃদয়ে বর্তমান থাকিতে তত হওয়া যায় না।

সকলই ভগবদ্বিচ্ছায় হয়, সে ইচ্ছায় জীবের কল্যাণই একমাত্র লক্ষ্য থাকে এই স্থির বিশ্বাসে ভক্ত বিপদকে সাধারণ জীবের ন্যায় দোষাবহ ও অন্তর্ভাবিত জ্ঞান করেন না।

ফলতঃ যথার্থ ভক্তের হৃদয়ের অন্তর্ভালে অবিরত যে এক বিমল হৃদয় আনন্দ-ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে তাহার সন্ধান অভক্তগণ না পাইয়াতেই ব্যাহিক বিপদ বা ব্যাধি দেখিয়াই ভক্ত ও অভক্তের জীবন একরূপ মনে করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদশী সিন্ধু মহাপুরুষগণ বলিতেছেন :—

‘প্রাকৃত দেহেতে হয় যোগাদি যেমন।

ভক্ত দেহে সেইরূপ করিয়া দর্শন।

প্রাকৃত করিয়া ভক্তে কভু না দোষে।

ভক্ত দেহে অপ্রাকৃত সর্বদা মানবে।

মনোযোগে তল করি ইহার যে মন্ত্র।

শরীরে যে দোষ হয়, সে শরীর-বন্ধঃ।

বুদ্ধ পদ আদি অলমাত্রে হয়।

ইহা বলি কৃপ গঙ্গাজলে তুল্য নয়॥

শ্রীমদাসগোস্বামীর উপদেশামৃত।

ভক্তি হইলেন গঙ্গাজল। তাহাতে ব্যাধি বিপদকণ পদ বুদ্ধ থাকিলেও
বিম্বপাদ সম্পূর্ণ বলিয়া তাহা কেবল পবিত্র আনন্দেরই কারণ হয়। উহা
বিম্বপাদ পদ্বের গুণ।

• যদি কোন-স্থানে উত্তম সঙ্গীত হইতে থাকে সে স্থানে যে যায় সে-ই আনন্দ
পায়। তাহার জীবনে নানা ক্লেশ বা চিন্তা থাকিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ সে সেই
সঙ্গীত-সভার উপস্থিত থাকে ততক্ষণ সেসকল চিন্তা বা ক্লেশ তাহাকে আক্ৰমণ
করিতে পারে না। সেইকণ বিম্বপাদ পদ্বের এমনই পবিত্র আনন্দময় গুণ
যে, তাহাতে ভক্তই হউক বা মানুষই হউক যে-ই অকপটে মগ্ন হইবে সে-ই পবিত্র
ও আনন্দিত হইয়া উঠে।

ব্রজা নিজপুত্র নারদকে বলিয়াছিলেন,—

‘সে অনন্ত ভগবান দয়া করে যারে।

সে যদি কাপট্য ছাড়ি’ পদতলি ধবে॥

তবে সে হৃৎকর মুগ্ধা লিঙ্গ পাব হ’বে।

তার তত্ত্ব জানি সদা থাকে সে অন্তরে॥

পক্কভূত ময় দেখে না থাকে মমতা।

অনন্তের অংশ ভাষি’ নাহি পায় ব্যথা॥”

তাই বিনীতভাবে বলিতে হয়, পাঠক পাঠিকাগণ! সত্ত্বর হরি চরণারবিন্দে
মগ্ন হউন। সকল জালা বহুগা হইতে নিস্তার পাইবেন। শত্রু মিত্র হইবে,
গরল অমৃত হইবে, দৈন্য সুখের আকর হইবে, সকল ভয় দূর হইবে।

উপসংহারে বলিয়া এই যে, অনেক মনে করেন, কি ভক্ত কি অন্তরু মানব
মাত্রেরই স্ব স্ব কর্তব্যের কল ভোগ করে। বস্তুনি মানব নিজেকে কর্তা মনে
করবেন ততদিন উহাই অপ্রাপ্ত সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যখন হইতে,
মানব আপনাকে ভগবদাস রূপে দেখিবেন তখন হইতে তাহার কর্তৃ-হাতিমান
লোপুগাইবে সুতরাং কর্তব্য থাকিবে না। বাস্তবিকই যদি আমরা আপন আপন

কর্ম বলে ভাল বা মন্দ হইতে পারিতাম তাহা হইলে ভগবৎ কৃপার আবশ্যক আদৌ থাকিত না। প্রকৃত কথা তাহা নয়। কারণ,—

আপন ইচ্ছায় জীব কোটী বাধা করে।

কৃষ্ণ কৃপা বিনা এক বাধা নাহি পুরে ॥”

অখিল-পুণ্য শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একাদশ স্কন্ধে স্পষ্টই বোঝিত হইয়াছে যে, “মুখ ও চতুর্থের মূল কর্মই নাই।” শ্রীমদ্ভাগবত কর্তৃক দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত শ্রীভক্তসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে,—“কর্ম্মাণি নির্দহতি, দিত্ত চ ভক্তি ভাজাং” অর্থাৎ ভক্তিমান ব্যক্তির সকল কর্ম ভগবান নিঃশেষে দহ করিয়া থাকেন।

পাঠকগণ। ব্যাধি ও বিপদের কাবণ, ভক্ত ও অভক্তের পক্ষে এক, এই-রূপ বাহ্য বর্ণিত হইল তাহা সাধারণ ভক্তগণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। শ্রীভক্ত-মালাদি বহুবিধ ভাঙ-পাঠে জানা যায় যে, অসাধারণ ভক্তগণ প্রান্তিক নিয়মাদি বহিষ্কৃত। সুতরাং মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে, ভক্তি নিকট ও নিরপেক্ষ হইলে জীব বহু চুরাবোগ্য ব্যাধি ও মৃত্যু সমূল বিপদ হইতে আশ্চর্য্য কণে রক্ষিত হইয়া থাকেন। শ্রীগ্রন্থ আলোচনা করিলে একগ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

আবাহন কি বিসর্জন ?

(লেখক—স্যার স্বামী যোগানন্দ ভারতী সরস্বতী মহারাজ)

(কে, সি, এস, আই।)

—:—

কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে সামগ্রিক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা দেবার্চনা প্রভৃতি দৈব কর্ম্মাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বস্তুযোগেব অদীন থাকিয়া, যোগী ঋষি মধ্য-পুরুষগণ যোগমুঠানাদি দ্বারা সাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই জন্য ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অতি পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ভারতমাতার এই সকল সুসভান অবিরত সংকস্মামুঠানে নিরত থাকিয়া ও অসং কস্মামুঠানে বিরত হইয়া, পূর্বাগত জগতের উন্নতি বিধান

করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বর্তমান কালে, তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজ কাল অনেকেই শাস্ত্রাদেশ মানিয়া কাঁধা করিতে চায় না। অধুনা বিশ্বকাংশ লোককেই বিপথগামী হইতে দেখা যায়। শাস্ত্রোক্ত কার্য কলাপাদির যথাযথ নিয়ম পরিপালন করিয়া, এখন আর কেহ কোন কার্য করিতে পারে না। পূজা, জপ, তপাদির কার্যে নিযুক্ত হইতে হইলে যে সকল দ্রব্যের আয়োজন বিশেষ আবশ্যিক, তাহাও আজ কাল ঠিক ঠিক পুওয়া যায় না। রাজারের ভেজালের কুপায় হোমের আসল দ্রব্য ঘৃত, একবিন্দু খাঁটি পাওয়া দুষ্কর। আবার ঐকণ দৈব কার্যাদিব অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রভৃতিও খাঁটি নাই। তাহাতেও ভেজাল চলিয়াছে। সুতরাং আমাদের ভারতমাতা দিন দিন দীনা, হীনা, মলিনা ও পবিত্রীণা হইয়া, আমাদেরকে রক্ষা করিবার শক্তি হারাইতেছেন। আমরা এখন দুঃখিনী মাতাব দুঃখী সন্তানের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইতেছি। মহারাজ দশরথ, তাহার রাজ্যে অনাদৃষ্টি হইলে কন্যাস্বর্গকে আনয়ন করিয়া, যজ্ঞ করিবাব পর দেবরাজ প্রচুর বাধা বর্ষণ করিয়াছিলেন। আর আজ পৃথিবীতে কোন দৈব দুষ্কিপত্তির আবির্ভাব হইলে তাহার প্রতিবাদ জন্য যাত্ৰিক ব্রাহ্মণ হইতে যজ্ঞ দ্রব্যাদি সকল বিষয়েবই সম্পূর্ণ অভাব অনুভব করিতে হয়। সুতরাং প্রতিবিধান হওয়া ও দূরের কথা। অতএব এই সকল পরিবর্তন হওয়ার কারণ কি? কেন এমন হইল? কেন এমন পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া আমাদের এইরূপ নানাবিধ দুঃখ দুষ্কিপত্তির আবির্ভাব হইল? কে আমাদের এই সকল প্রশ্নের সঙ্গতর প্রদান করিয়া মুই ও শান্ত করিবে। যাহাকেই এই সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবে, সে-ই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিবে। বরং অনেকে আবার এ সকল কুসংস্কার ভাণ্ডার আলোচনার আবশ্যিক নাই বলিয়া আমাদেরকে উটী উপদেশ প্রদান করিতে চেষ্টা করিবে। তাই বলি ভারতমাতার এখন বড়ই দুদিন উপস্থিত। প্রকৃত সহশ্রদেশ কেহই গ্রহণ করিতে চাছেন না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। সকলেই সকলকে নিজ নিজ উপদেশ দানে আগুনদলের পুষ্টি সাধন করিতে অভিলাষী। এই সকল ব্যাঘাত নিত্য প্রসূত করিয়া, আজ দুই চারিটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাই আজ "আবাহন কি বিসর্জন" বিষয়ে আলোচনা

করিতে বসিয়াছি। আশা আছে, সেই বিশ্ববিধাতার, করুণাময়ী, অপভ্রাতা মা, আমার মনোমধ্যে উদয় হইয়া, তাঁহার কার্য সম্পাদন করিয়া লইব। অন্য যুক্তি যুক্ত সমালোচনা দ্বারা আধুনিক হিন্দু সমাজের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে বিধিবিধানাদি বিষয়াদি মাদৃশ অধ্যয়ন ব্যক্তির লেখনী সাহায্যে প্রকাশ করিবেন। আজ সেই ব্রহ্মময়ী মা মঙ্গলচত্রীর আদেশ-ই মন্দির লেখনীমূখে প্রকাশিত হইবে মাত। বহুদিন হইতে আমি আবাহন ও বিসর্জন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া, আমাদিগের বর্তমান হিন্দু সমাজের বিশৃঙ্খলতার বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু এ পর্যন্ত বোধ হয় মাঝেই উচ্ছ্রান্ত হইয়া প্রকাশ করিতে বা বিচার করিতে সামর্থ্য প্রাপ্ত না হওয়ায় বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আবার সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই আজ মঙ্গল লেখনী পরিচালনা করিতে বসিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

মহামুনি ঋগ্বৈদিক, বেদব্যাস, পরাশর, যাম্ববক্য, মনু, বশিষ্ঠ, মারদ, মরীচ, অত্রি, হারীত, উশনা, অগ্নিরা, পুত, পুণ্ড্রা, বৃহস্পতি, শিব, বিষ্ণু, অষ্টাবক্র, বেরণ্ড, কণ্ব, জৈমিনী, পতঞ্জলি প্রভৃতি পুরাণ, তন্ত্র, দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি উপনিষৎ, ন্যায়, মীমাংসা, বৈশেষিক, সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতাপণ বে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা আমাদিগকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমরা সেই সকল সংশ্লিষ্ট অধ্যয়ন করিয়া, তাহা হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রাণ ও তাম্রপর্বাণি গ্রহণে যদি সক্ষম হইতাম তাহা হইলে আমাদিগের আজ এইরূপ হৃদিশা অতি নীচ। অনেকে, সময়ে সময়ে এই সকল গ্রন্থ বা গ্রন্থ প্রণেতারগণকে জ্ঞাত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাহারা যেন সবজাতী ভাবে এই সকল মুনি ঋষি ও দেবতাদিগকে অতি হেয় ও নগণ্য জ্ঞানে আপনাদিগের অহংকারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, নব্বয় পাকতৌলিক দেহের মুখ সচ্ছন্দ্য বিধানের চেহারা আশ্রয় প্রকাশ করেন। কিন্তু যেদিন অসংখ্য দানদাসী ও আত্মীয় স্বজনগণ দ্বারা পরিবেষ্টিতাবস্থায় থাকিয়াও রণিত্ত কিন্তুরণের হস্ত হইতে নিস্তার না পাইয়া, তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমন রাজার দ্বার দেশে উপনীত হইবেন, সেইদিন তাহাদের চমক ভাঙবে। মহাকাশীর ধরবার অঙ্গি দর্শন না করিলে কর্তৃমানে এই সকল ব্যক্তির জীবন্তে চৈতন্য সঞ্চারের আবশ্যক উপায় দেখিতে পাইনা। এই হৃদয়িত পামরগণ পূজা অর্চনাকেও বর্ষবতার কার্য বনিয়া, উল্লেখ

করিতে পশ্চাৎপদ নহে। ইহারা এক্ষণে পাশ্চাত্যশিক্ষার শিক্ষিত হইলেও সেই সকল প্রভীচ্য জাতির পরলোক বিশ্বাস বা ঈশ্বর ভক্তি পরাধীনতা দর্শন করিয়াও আগুনাগিণের কুসংস্কার বিদূরিত করিতে প্রয়াস পায় না। হুতরাং ইহাদিগের মানব জন্মে শিক্। ইহারা যে কেন গোকুলে জন্ম গ্রহণ করে নাই, আমি তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। অথবা এইবার অবশ্যই ইহাদিগকে গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এতক্ষণ একদল চার্মাক মাতাবলম্বী নৃত্যিকের শাস্ত্র অবিশ্বাস প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে সমাজের আর একদল ভণ্ড, পাষণ্ড, অকাল কুযাগের স্বেচ্ছাচার প্রভৃতির বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহারা আবার দেব দেবীর পূজার্তনাদি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃত বিধি বোধিত ভাবে দেব কার্যাদির অনুষ্ঠানে রত হইয়া, সাত্ত্বিক ভাব ভগবানের অর্চনা না করিয়া স্বেচ্ছাচারী ভাবে কেবল তামাসিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান মাত্রকে আপনাদিগের কর্তব্য কর্ম বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে।

সামাজিক পুরোহিতগণ কখনও যে স্বেচ্ছাকারী হইতে পারে না, ইহা তাহাদিগের যেন আদৌ স্মরণ থাকে না, অথবা স্মৃতি পথে জাগরক থাকিলেও ঐ পুরোহিত স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হইয়াই যেন তাহারা তাহাদিগের কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিক পণ্ড করিয়া, প্রকৃত দৈবকার্যের মুণ্ড ভঙ্গ করিয়া থাকে। অবশ্য ইহারা সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছেন—ইহারা স্ব স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিয়াছেন, ইহারা এই অর্থও বিশ্বচরাচরে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়াছেন, ইহাদিগের ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, এই নিখিল সংসারে ইহাদিগের মায়া সমতাদির চিহ্নমাত্রও নাই, তাহাদিগের কথা শ্রুত। তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইলে ক্ষতি নাই। বরং শাস্ত্র উহাই তাহাদিগের পক্ষে বিধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। স্বয়ং সংহার কর্তা মহাদেব মহানির্দোষ তত্ত্ব বলিয়াছেন :—

“কিংতস্ত বৈদিকাচারৈস্তাত্ত্বিকৈর্কাপি তস্ত কিম্।

ব্রহ্মনিষ্ঠস্ত বিহ্বঃ স্বেচ্ছাচার বিধিঃস্মৃতঃ॥”

অর্থাৎ, ব্রহ্মনিষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তির তাত্ত্বিক আচারই বা কি বৈদিক আচারই বা কি, তাহাদিগের স্বেচ্ছাচারই বিধি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপে বহুপুঙ্খপণ পুনর্জন্ম নিরন্তর জন্য মনো মথ্যে কোনরূপ বাসনা না রাখিয়া,

সর্বজন সর্বত্র যথেষ্ট বিচরণ করিয়া থাকেন। এইকপ মহাপুরুষগণকেই জীমুক্ত বা পরমহংস বলা যায়। ইহারা হংসের নীর পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষীর গ্রহণের ন্যায় সমস্ত অন্ন বা পাপান্ন পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যান্ন গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া ইহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তাই ইহারা পবম-হংস নামে খ্যাত। ইহাদিগের পবিত্র করস্পর্শে সমস্ত অন্ন ও ভ্রূমল হইয়া যায়। ইহারা কোন দেবমূর্তি স্পর্শ করিলে সেই মূর্তিতে দেবতার অধিষ্ঠান ও দৈবশক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রও বলেন :—

“অচকস্যা ভূপোষণে ওদর্জনম্যাতিশয়েন।

অভিরাপ্যচ্চ বিশ্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমুচ্ছতি ॥”

অর্থাৎ, অর্জকের তপস্বীর প্রভাব, অর্জন-দ্রব্যের বাহ্যিক এবং মনের মত দেবমূর্তি হইলে সেই মূর্তিতে দেবতার সন্নিধি (অধিষ্ঠান) ঘটয়া থাকে। আর পরমহংসের কর স্পর্শে অপবিত্র অন্ন পবিত্র হওয়ার সম্বন্ধেও শাস্ত্র বলিতেছেন :—

“যদিম্যামীচ জাতীয়মনং ব্রহ্মনি ভাবিতম্।

তদন্নং ব্রাহ্মনৈর্ব্রাহ্মণি বেদান্তপারগৈঃ ॥”

অর্থাৎ, মহানিস্তান তন্ত্রে শ্রীমদ্‌মহাদেব বলিয়াছেন যে, যদি নীচ জাতীয় অন্নও ব্রাহ্মকে দিবেদিত হয় তবে তাহা বেদান্ত পারগ ব্রাহ্মণও গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার পর পুনস্বার বলিতেছেন :—

“জাতিভেদেন কভব্যো প্রসাদে পবমান্বনি।

যোহুদ্ভবুজিং ব্রুকতে স মহাপাতকী ভবেৎ ॥”

অর্থাৎ, পরমাশ্রম প্রসাদে জাতি ভেদ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি অপবিত্র বোধ করে সে মহাপাতকী হইয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনেও বলিয়াছেন :—

“সর্কারামৃমতিচ প্রাণাত্ময়ে তদর্শনাৎ।”

অর্থাৎ, অন্নের অভাবে প্রাণাত্ময়ে কালে সর্কার ভক্ষণের আত্মা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বলিয়াছেন :—“অবাধাজঃ”

অর্থাৎ, আপংকালে সন্মানভোজন জ্ঞানীর পক্ষে দোষ নহে । তাহার পর এবিধ যুক্ত পুরুষদিগের সংস্পর্শে সমস্তই পবিত্র হয় তাহার প্রমাণ ও মহা-নির্বাণ তত্ত্ব শাস্ত্রে দিতেছেন :—

“অন্তর্চির্ধাতি স্তুতিতাম্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতাম্মিয়াং ।

অন্তক্যমপি ভক্যং স্ম্যং যেষাং সংস্পর্শমাত্ততঃ ॥

কিরাত পাপিনঃ ক্রুরাঃ পুণিন্দাঃ যবনাঃ খলাঃ ।

স্তুত্বান্তি যেষাং সংস্পর্শাত্তানু বিনা কোহন্যমর্জয়েৎ ॥”

অর্থাৎ, হাঁহাদিগের সংস্পর্শ মাতেই অস্ত্র চিহ্নিত, অস্পৃশ্য স্পৃশ্য (স্পর্শ-যোগ্য) এবং অন্তক্য ভক্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে হাঁহাদিগের সংস্পর্শে কিরাত, পাপী, ক্রুর, পুণিন্দ (শ্রেষ্ঠ জাতি বিশেষ) যবন ও খল ব্যক্তিরাও পবিত্র হইয়া যায়, হাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, আর কাহাকে অর্জনা করিবে ? অতএব বেশ বুঝা গেল যে, এই সকল মহাপুরুষ দেবতার ন্যায় এই মর্ত্যমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন । কেবল প্রারম্ভ কক্ষ নাশার্থই হইল। দেখিয়া আহর বিহারাদির অনুষ্ঠানে রত হইলে মাত্র, নতুবা হাঁহাদিগের আসক্তি বা অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয় না । শোক, মোহ, মায়া, মমতা প্রভৃতি হাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় । অর্থাৎ হাঁহারা ইহ সংসারে মায়া মমতাদির অধীন নহেন পরন্তু স্বাধীন ভাবে স্বীয় অস্ত্রীষ্ট সিদ্ধির অভিপ্রায়ে অর্থাৎ জন্মান্তর নিবৃত্তি হেতু কামনা রূপিনী কামিনী ও বিষয়রূপ ককন হইতে দূরে থাকিয়া, প্রজ্জ্বলিত প্রবল জ্ঞানাদি দ্বারা কন্মরূপ কাষ্ঠরাশি ভস্ম করিয়া ফেলেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগ-বদগীতায় অর্জুনকে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন যে, :—

“যথৈধাবদি সমিক্রোধমিভস্যসান্ কুরুতেহর্জুন ।

জ্ঞানাদিঃ সর্বকর্মাণি তস্যসান্ কুরুতে তবা ॥”

অর্থাৎ, হে অর্জুন ! যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি এধাবসি (ইন্দ্র বা কাষ্ঠরাশি) ভস্মসাৎ করে, ওদ্রপ জ্ঞানাদি সর্বকর্ম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে । অতএব পুনঃ পুনঃ যাওয়াত নিবৃত্তি করিতে হইলে, কর্মসকল দগ্ধ করিয়া ফেলা চাই । রজক মুখ নিঃসৃত “দিন্ত আবেশে ছয়া ন, ন্না জালায় দেও” এই কথাটি প্রত্যক্ষরবীর লালাবাতু ঠিক এই অর্থেই গ্রহণ করিয়া, বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পুস্ক শ্রীকৃষ্ণাবন ধামে উপস্থিত হইয়া, মাদুকরী বৃত্তি অবলম্বনে আপনাকে চারিতার্থ

জীবন পূর্ণকৃত হইয়াছিলেন। ততক্ষণে ঐ কথাদি তাঁহার কণ্ঠ হৃদয়ে অবিষ্ট হইয়াছিল। তাই তাঁহার কৰ্ম্য করিবার বাসনা একেবারে নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ নিবৃত্তিই স্বরূপ সিদ্ধির একমাত্র সোপান। লক্ষ জন্মান্তরের পুণ্যফলেই এইরূপ নিবৃত্তি ঘটয়া থাকে। লালাবাবুরও অবশ্যই পূৰ্ব্ব জন্মান্বিত সাধনা অনেক পরিমাণে সাধিত হইয়াছিল, তাহ এ জন্মের পূৰ্ব্বভাগে তিনি বিষয় বাসনাসূরঙ্গী থাকিলেও ঐ একটা দিনের সামান্য কথায় তাঁহার নিকট পরমার্থ-জ্ঞানের উদ্গাম করিয়া দিয়া, তাহাকে দিব্য ধামে পৌছিবার পন্থা নির্দেশ করিয়া দিল। এই লালাবাবু জীবদ্দশায় ধামে গমন করিয়া ত্রিকোণজীবী হইয়া, ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভের অন্য দীন ভাবে তত্ত্বিবেশ সাধনার নিমুণ্ড হইয়াছিলেন। অতএব হ'নি বাসনা পরিশূন্য হইলেও অবৈত জ্ঞান লাভে অসমর্থ হওয়ায় পুরোক্ত মহাপুরুষদিগের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিলেন না। যাহা হউক পূৰ্ব্বোন্নিখিত পরমহংসগণের কৰ্ম্য নিবৃত্তি জন্মাই তাঁহারা জীবদ্দশায় পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন কৰ্ম্মের আবাজ্ঞা আর তাহা-দিগের অন্তরে স্থান পায় না। তাঁহারা একেবারে ক্রেশের হেতু বাসনা রাসিকের জন্ম করিয়া ফেলেন। তাই পাতঞ্জল দর্শন শাস্ত্রের সাধন পদের ১২তম শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে :—

“ক্রেশমূলঃ কৰ্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবৈদুর্যঃ।”

অর্থাৎ, ক্রেশ মূলক কৰ্ম্মাশয় (ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মানুকূল, দৃষ্টাদৃষ্ট, দৃষ্ট (ইহ) ও অদৃষ্ট (পূৰ্ব্ব ও পর) জন্ম, বৈদুর্য (ভোগ্য)। ইহ জন্মের অম্ল বা জন্মান্তরের কৃত কৰ্ম্মাশয় সকল ক্রেশ মূলক। কৰ্ম্ম সঞ্চয় মাত্রই ফল ভোগের কারণ। আর ঐ ফল ভোগই দুঃখ। এ জন্মের সঞ্চিত কৰ্ম্ম সম্বন্ধে যে এ জন্মে ভোগ হইবে তাহা নহে; পরন্তু জন্মান্তরে অবশিষ্টটুকু ভোগ হইবেই হইবে। জন্মান্তর বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ‘এ’ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; তাই এ বিষয়ের আর অধিক বিস্তার না করিয়া আমার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ের গবেষণায় নিবৃত্ত হইলাম। অর্থাৎ এক্ষণে দেখা গেল যে, মুক্ত পুরুষগণ ব্যস্তব্যস্ত গর্ত্ত বহন করণ নরক ভোগ হইতে নিস্তার পাইবার অন্য সমুদায় বাসনার উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। কারণ গর্ত্ত বহনবাই যে নরক ভোগ সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার যুক্তিও শাস্ত্রে দেখিতে পাই। মণিরত্নমালা বলিতেছেন :—

“স্বাদুষ্টোপনিবদ্ধ শরীর পরিগ্রহঃ সংসারঃ।”

অর্থাৎ, খীর অদৃষ্ট বশে পুনঃ পুনঃ শরীর ধারণের নামই সংসার। আর শরীর কি? তার উত্তরে বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন :—

“মাংসাস্বকৃপুষ্বিশ্নুত্রমায়ুজ্জাহ্নিসংহতো।

দেহেচেৎ প্রীতিমানুভূতো নরকে ভবিতাপিসঃ॥”

অর্থাৎ, দেহ বলিতে কেবল মাত্র মাংস, রক্ত, পুঁথ, বিষ্ঠা ও মূত্রাদির সংহতি (সমষ্টি) মাত্র একটা পদার্থই বুঝা যায়। অতএব তাহাতে আর নরকে প্রবেশ কি? ক্রটিতেও ততানুপূর্ণ প্রদর্শন করিয়াছেন :—

“তমেব বিদিত্য ত মুচ্যামোত নান্যঃ পশ্য বিদ্যতে অয়নায়।”

‘নগ পুনবাবৃত্তে।’

অর্থাৎ, আত্মাকে জানিতে পারিলে মুক্তিতে আত্মকম করা যায় এবং সেই ব্যক্তির আর পুনরায় ভয় না। তার জন্মাত্মর লিখিত বা নরক ভোগের অবসান হইয়া থাকে। অতএব জানী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের অধীন হইতে একাত্মই অনভিলষী। এই সকল তত্ত্বগত বিচার করিতে যাইয়া শ্রদ্ধা পাঠক পাঠিকাগণ। আমি অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমি পূর্বে যে বিষয়ের আলোচনা যন্ত্র হইয়াছিল তৎসব তাহা অনেক পাতাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা এক্ষণে সেই বিষয়টির উল্লেখ করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই সকল মঙ্গলপুঙ্খ যে প্রতিমা বা দেবমূর্তি স্পর্শ করেন, তাহা দৈব শক্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ মঙ্গলপুঙ্খ আজকাল কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? আজকাল নিত্য কদাচারী ব্রাহ্মণগণ কতক এই সকল দৈব কথ্যানুষ্ঠান করিতে হইয়া থাকে। সুতরাং উচিতগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তি কতটুকু দৈবশক্তির বিকাশ দেখাইতে পারে? ইহারা পূজা কবিত্তে ক’নে না; কিন্তু বিসর্জনে আনন্দানুভব করিয়া থাকে। পূজা বা আবাহন করিতে পারে না; কিন্তু পূজার দিন হইতেই বিসর্জনের বন্দোবস্ত ক’রিতে থাকে।

“আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।

বিসর্জনং ন জানামি ক্রমশঃ পরমেশ্বরঃ।”

এই বলিয়া, আপনাদিগের কৃত কন্য়ের দোষ কালন করিয়া লব মাত্র। উচিত-
দিগের যদি বিদ্যুৎসত্ত্বও কাণ্ড জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে ইহারা অবশ্যই উচিত

বিজ্ঞান চিত্তে সেই বিব-নিয়ন্তার পূজার রত হইত, তাহা হইলো কোন গতিকে ভাড়াভাড়ি পূজা সারিয়া গইয়া, ভগবানের সাক্ষাতে দেব মন্দিরে পবিত্র হোম-হুম, ধূপ ধুনার হুম, পুষ্পচন্দনাদির নানাবিধ মৌলিকে দেবতাদিগের আসন বর্জনান্তে সেইখানে বসিয়াই আবার নিঃসঙ্কোচে তামাকুর হুম প্রদান করিবার জন্য ঐ প্রকার হুমপানে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। অত্বেকাল এইকণ তামসিক পূজারই অমুঠান সর্বত্র দেখা যায়। প্রকৃত সাত্ত্বিক ভাবে পূজা বা অর্চনা আজ কাল হয় না বলিলেও অতীতি হয় না। যেখানে দেবতাদিগের পূজার্তনাদির অমুঠান হইয়া থাকে এবং যেখানে দেবতাদিগের চরিত্র কথা আশোচনা বা সঙ্কীর্ণনাগি হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানে হুম পান একেবারেই নিষিদ্ধ; কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ অলীচীন কোচুকশ্রিয় তমুগণামিত প্রোহিতগণ অহংকারে মত্ত হইয়া, এই সকল আদেশ প্রতিপালন না করিয়া, অবহেলাই করিয়া থাকেন। ভগবান তাঁহার অবস্থান স্থানেন কথ্য উল্লেখ করিয়া, নারদ মুনিকে বলিয়াছেন :—

নাশং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ ।

নভস্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ ॥

অর্থাৎ, যে নারদ । আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি, যোগীদের হৃদয়েও থাকি। কিন্তু আমার ভক্তগণ যেখানে আমার নাম গান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করিয়া থাকি। কিন্তু আজ কাল হরিসত্য হরিকৃতা বা হরিনাম শ্রবণ করিতে থাকা, অথবা তামাকের জন্যই অনেক বাফুল হইয়া পড়েন ইহা আমি সচক্ষে দর্শন করিয়াছি। সুতরাং সত্য সত্যাদিকগণকেও সত্য অন্যান্য বিষয়ের কর্দ করিবার সময় অগ্রেই ল'কা কলিকা ও তামাকের কর্দ করিতে হয়, এবং সত্য সত্যবৃন্দের মনস্তত্ত্বের জন্য অদরহ তামাক যোগাইতে হয়। আবার অনেকই হয়ত বিড়ী বা চুট প্রভৃতি ধরাইয়া, আপনাদিগের ধূমান শিলাসা নিবৃত্তি করিবার জন্য ল'কা কলিকার করিয়া তামাক আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতেই, মুখামি করিয়া বসে। আজ কাল কুচি এতই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া, প্রকৃত ভক্ত ও জনী পুরুষগণকে মর্শ্বিত হইতে হয়। তাহাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেও দেখিয়াছি। অতএব এই সকল বিধি ইহারা

কোন শাস্ত্রে যুজিয়া পায় তাহাও জানি না। আবাহন সাক্ষাতে তৎকথায় তাহার বোধ জগৎ বধাবধ যুক্তি সহকারে অহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে বাইনে তাহার উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকে এবং যেন উহা তাহাদিগের নিকট অগ্রাহ বলিয়াই বিবেচিত হয় এই ভাব তাহার প্রকাশ করিতে চেষ্টা পায়। অবশ্য কতকগুলি লোক আবাহন উক্ত পরামর্শ দ্বারা গ্রহণ করিয়া, স্বকৃত অপরাধের জন্য কন্যা প্রার্থনা ও করিয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্পই দেখা যায়।

আজ কাল বারইয়ারি পূজায় ও অনেক গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বারইয়ারি ঈশ্বরের পাণ্ডাগণ দেবতার পূজার আয়োজনে যত আগ্রহ প্রকাশ না করে, ততোধিক তাহাদিগের নীচ ভাষা। প্রভুতির আন্দোলন সম্প্রদায়ের জন্যই হইয়া থাকে। বাই নাচ, ধেমটা নাচ, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতিতে যত টাকা ব্যয় করিয়া থাকে, বোধ হয় তাহার শতাংশের একাংশ ও দেবতার পূজাদিতে বা দীন ভ্রাতৃদিগের হৃৎকষোচনের জন্য কাঙ্গালী ভোজন বা দরিদ্র দারিদ্র্যের দেবায় ব্যয়িত হয় না। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া কি বুঝিতে পারা যায় না যে, ইহারা আমোদ আনন্দেই অধিকতর অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছে? এই সকল অসংসার শূন্য ছন্দয় দীন ব্যক্তিগণ বারইয়ারি প্রতিমা পূজার জন্য কোন স্থানে একমাত্র দুইমাস এমন কি তিন চারিমাস পর্যন্ত কেবল মাত্র একটা ঢাক ও এক কঁাসী অথবা কেবল মাত্র কঁাসির খট্টা লাগাইয়া রাখে; কিন্তু বিসর্জনের দিন ইংরাজী বাগনা, জয়টাক কাড়ানাকুড়া, বাই নাচ, ধেমটা নাচ রঙ্গ ভাষা। প্রভৃতির আয়োজনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া, শেষে সেই সোণার প্রতিমা নদীজলে নিমজ্জিত করিয়া, পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকে। যেন ঈশ্বর ইহাতেই চতুর্দল লাভ করে। অতএব বলিতে পারি না কি যে, ইহারা পূজা করিতে চায় না, কিন্তু বিসর্জন করিতেই অভিলাষী ও কেবল মাত্র লোকতঃ পূজার ভান মাত্র করিয়া, অজ্ঞ নরনারীর নিকট হইতে প্রণামী আদায় করিয়া থাকে? তাহার পর আর একটা কথা এই যে, কন্যা পূজার অর্থাৎ দুর্গা পূজা কালী পূজা, অগস্ত্যী পূজা, কার্তিক পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি পূজার বিসর্জনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদয় গল্পে আবাহন আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, বিদায় দিবার ব্যবস্থাও 'দ্রষ্টব্য' পাওয়া যায়, বলা :—

“গচ্ছ গচ্ছ মহাদেবি! গচ্ছদেবি! বৃচ্ছয়া।

সম্বৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥”

অর্থাৎ, হে মহাদেবি! তুমি এক্ষণে গমন কর, গমন কর। হে দেবি! এক্ষণে বৃচ্ছা গমন কর। কিন্তু সম্বৎসর পরে আবার আগমন করিও। এই বলিয়া ভক্ত-সাধক সজল নয়নে কাতর প্রাণে মাকে বিনায় দিয়া থাকেন। আশ্বিন মাসে শরৎকালে যে দুর্গা পূজা হইয়া থাকে, সেই পূজায় স্বয়ং দলপথাক্ত শ্রীরামচন্দ্র রাধণ-লগ্নার্থ বর প্রদানে দেবীকে ঐ-বলিয়া বিনায় দিয়াছিলেন। তাই আজ পর্যন্ত পঞ্জিকাকারগণ উক্ত দুর্গা পূজার বিজয়ার দিন ‘ব ব পঞ্জিকায় “শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব” বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই শ্রীরামচন্দ্রের বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলা বিব্রহ নির্যাস করাইয়া বার-ইয়ারি উপলক্ষে আবাহন করনানন্তর তিন চারি মাস পূজা করিয়া, শেষে বিসর্জন করিবার ব্যবস্থা কোন্ শাস্ত্রে আছে, তাহা কি উক্ত বারইয়ারির পাণ্ডাগণ আমাকে বলিয়া দিতে পারেন? এইরূপ বারইয়ারির মধ্যে সাত্তা-গাছীর রামরাজা পূজা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বহুকাল হইতে উক্ত রামরাজা পূজার অনুষ্ঠান সাত্তাগাছীতে হইয়া আসিতেছে। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে একবার আমি তথায় উপস্থিত হইয়া, শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি বিসর্জন না করিয়া, ভিতরকার অন্য তাঁগাকে রাখিয়া দিয়া, সাত্তাগাছীকে দ্বিতীয় অবোধ্যা পুরীতে পরিণত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা আবস্ত হইত ও ক্রমাগত চারিমাশ কাল প্রতিমা রাখিয়া দিয়া, নাচ তামাসাদি আমোদের চূড়ান্ত করিয়া, অবাসমারোহের সহিত গঙ্গা জলে বিসর্জন করা হইত। সেবার আমি উক্ত প্রতিমা পূজা বৈশাখী পূর্ণিমায় না করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমী তিথিতে করা উচিত এমনও প্রকাশ করিয়াছিলাম। আর বাকুসাড়ার বাইথা, নবনারী কুঞ্জের অবস্থিত ঐ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিও বারমাশ রাখিবার অত্র অনুরোধ করিয়াছিলাম। আর বাবচন্দ্র দিবাকরো উক্ত মূর্তিপর প্রস্তর দ্বারা নির্যাস করাইয়া, প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দিয়া আসিয়াছিলাম। অর্থাৎ সাত্তাগাছীকে দ্বিতীয় অবোধ্যা ও বাকুসাড়াকে দ্বিতীয় রুমাবন তীর্থে পরিণত করিবার জন্য পূর্বোক্ত মূর্তি প্রদর্শন পূর্বক পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলাম। অন্যান্য স্থানেও যেখানে যেখানে

মুমুরী দেবদেবী মূর্তি বারমাস অধিষ্ঠিত আছেন, তত্ত্ব স্থানও তাঁহাদের পায়স-ময়ী মূর্তি স্থাপনার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার সেই সকল উপদেশ অন্য কোথাও কার্যে পরিণত না হইলেও শিবপুরে ব্রহ্মময়ী দেবীর ও বৃকটে পঞ্চানন ঠাকুরের পাবণ ময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা কাণ্ড সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে দেখিয়া আনন্দানুভব করিলাম। আর সাতাগাহ্নীতে আমার বন্ধুবর্গ ঐরামচন্দ্রের ও সীতাদেবী প্রভৃতির পাবণময়ী প্রতিমূর্তি গঠন করাইয়া স্থাপনা না করিলেও, আজ তিন বৎসর কাল তাঁহারা রামনবমী তিথিতে ঐরামচন্দ্রের আবাহন করিতেছেন দেখিয়া, আনন্দিত হইলাম বটে; কিন্তু পাবণময়ী প্রতিমূর্তি চিরকালের জন্য উক্ত রামনবমী তিথিতে প্রতিষ্ঠা করিলে পরমানন্দ লাভ করিতাম। যে বৎসর আমি উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম, সেই বৎসর ঐরামচন্দ্রকে ছয় মাস কাল রাখিয়া আগ্নৈয় মাসের প্রথমে বিসর্জন করা হইয়াছিল। সে বৎসর দেখিয়াছিলাম যে, উক্ত ছয়মাস কাল, সমভাবেই বাতী সমাগম হইয়াছিল এবং যে সকল দোকানদার মাসিক ২০০-২৫০ টাকা হারে খাজনা দিয়া, দোকান করিয়া থাকে, তাহারাও সজল নরনে আমার সমক্ষে বলিয়াছিল যে, যদি বারমাস ঐরামচন্দ্র এখানে রাজা হইয়া বসিয়া থাকেন, তবে আমরাও বারমাস উক্ত হারে খাজনা দি। ঐরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর পদতলে বসিয়া থাকিতে পারি। ইহা হইতেই নিত্য বাতী সংখ্যা অনুমান করা যায়। শুধাপি সেবার রমিয়ারাজ্য প্রতিমা আগ্নৈয় মাসে বিসর্জন হইয়াছিলেন।

যাহা হউক এবার আবার আমি পত প্রাবণ মাসে রামরাজ্য বিসর্জনের তিন দিন পূর্বে বৃহস্পতিবারযুক্ত একাদশী তিথিতে সাতাগাহ্নীতে উপস্থিত হইয়া, পুনরায় উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম। এবার পুরোহিতরূপে আমার বাণ্য বন্ধ ঐযুক্ত হরিপদ শিরোমণিকে দেবিতো পাই নাই। এবার তাঁহার খুলতাত ভাতা পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি অসন্তোষজনক কার্য দেখিয়াই আমি পূর্ববৎ আবাহন বিসর্জনের ব্যাখ্যা দ্বারা রামরাজ্য প্রতিমূর্তি বারমাস রাখিবার যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। সে দিনও আর পূর্ত শতাধিক নর নারীর সম্মুখে আমার ঐ সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। আমি সে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে আমার প্রধান যুক্তি এই যে, প্রকৃত তত্ত্ব বিসর্জন দিতে পারেন না, বরং চিরকালের জন্য স্বেচ্ছা করিতে

হ্রদ : বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের মূৰ্ত্তি অমিদারী আছে ও তাঁহার স্থায়ী স্বর বাড়ী
 ঐচ্ছিক বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাঁহার নামে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি
 “রামরাজাভালা” স্টেশন স্থায়ী ভাবে স্থাপন করিয়াছেন, ওখন তাঁহাকে স্থায়ী না
 করিয়া, অস্থায়ী ভাবে তাঁহার উপাসনা করা হইতেছে কেন ? তাহার গর
 ভগবানের মূর্ত্তি বিসর্জন করিবার নিয়ম নাই । অতএব সে নিয়মের ব্যতিক্রম
 করিবার কারণ কি ? গত তিন বৎসর পূর্বে আমি লোক পরাম্পরায় বলিয়া-
 ছিলাম যে, রামরাজা বিসর্জন করিও না । কিন্তু আমার বাক্য অবহেলা
 করিয়া, যে রায়ে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি বিসর্জন করা হইয়াছিল, সেই রায়েই
 আমি বলিয়াছিলাম যে, তোমাদের প্রাণের ঠাকুরকে জলে চুকাইয়া তোমরা
 যেমন, চিত্ত প্রসাদ লাভ করিলে, এইবার ইনি তেমনই তোমা-
 দিগকে মগাধলয়ের নমুনা দেখাইয়া দিবেন । আর সেই রায়েই বর্ধাতেই,
 ছগলী ও মেদিনীপুর জেলা ভীষণ জল প্লাবনের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য
 হইয়াছিল । এবারও আমি বলিয়া যাতেছি যে, যদি তোমরা আমার কথা
 অবহেলা করিয়া, এই সোণার প্রতিমা জলস্রাৱ কর, তবে এবারও সেইরূপ
 ভীষণ জলপ্লাবনের এমন কি অযোধ্যাপিণ্ডির খাম অযোধ্যাগমন পথেও উহা সহ্য
 করিতে হইবে । এবার গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী গোদাবরী, নন্দা, সিদ্ধ, কাবেরী
 প্রভৃতি বড়তর নদনদী ভীষণ বন্যায় উজানু বহিবে । অধিকন্তু আমি যে, সকল
 কথা বলিতেছি, সে সকল কথা যে, আমার কথা নহে, পরন্তু ঐ শ্রীরামচন্দ্রেরই
 অনোক্তাব আবার মুখ দিয়া ব্যক্ত হইতেছে, তাহা এহবানেও সেই বিসর্জনের
 দিনহ, দেব দুর্ঘটনা দ্বারা উনি বুঝাইয়া দিবেন । আত্ম উচ্ছাদিগের সাক্ষাতে
 দাঁড়াইয়া, জোর করিয়া হুহা বলিতেছি আর আমি যাহা বলিতেছি, তাহা
 যদি উচ্ছাদিগের হৃদয় বিকীর্ণ হয়, তবে উহাও আমার বাঞ্ছনীয় যোগ করিয়া
 দেখাইয়া দিউন । আর যদি তাহা না হয়, তবে পুণিতে হইবে যে, ইচ্ছাময়
 নাস্ত্যংগ আমার মুখ দিয়াই আজ উহার ইচ্ছা ব্যক্ত করিতেছেন । এইরূপ
 ভাবে আমার বক্তব্য শেষ হইলে স-পেন্ট একবারে আমার মুক্তি গুলি সমর্পণ
 করিলেন বটে ; কিন্তু পামাণময়ী মুক্তি গঠন পণ্ডিতে অনেক ধরত পড়িবে এই
 কারণ প্রদর্শন করিলেন । আমি তাহাও তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া ছিলাম যে, এই
 মূর্ত্তির মূর্ত্তি, ১২ বৎসর রাখিয়া রাখা, প্রতিবৎসর প্রাতিমা নিয়মের উদ্ভূত অর্থ

ও ষোড়শ বৎসরের অধিদারীর আর হইতে অনার্যাসে পাব্যময়ী মূর্তি নিষ্কাসি
করাইয়া ১২ বৎসর পরে এই মূর্তি বিসর্জন করিয়া, যাক্ষক্স দিবাকরৌ সেই
পাব্যময়ী মূর্তি স্থাপনা করিলেই চলিতে পারিবে। তখন একরূপ সকলেই
নীরব হইলেন। আমি আরও একটি যুক্তি প্রদর্শন করিলাম যে, যে ত্রাক্ষণ নিত্য
হোম করেন, তাঁহাকে সাম্বিক ত্রাক্ষণ বলে। এইরূপ ত্রাক্ষণের সংখ্যা যত
বাড়িবে ততই আমাদিগের সমাজের মঙ্গল হইবে। আজ কাল এই সকলের
অভাব হইয়াছে বলিয়াই ত আমরা নানাবিধ অভাব অনুভব করিতেছি।
সারেসা বাঁর আমলে এই পৃথিবীই আমাদিগকে প্রচুর শস্যাদি যোগাইয়াছিল।
তখন ৮/১০ মন ধান্য ১ টাকায় পাওয়া যাইত। আর আজ ৮ টাকা ১
টাকা মন হারে চাউল বিক্রয় হইতেছে। গাভী অল্পদুগ্ধবতী হইয়াছেন।
এইরূপ ও অন্যরূপ, নানারূপ পরিবর্তন ঘটনাছে কেবল সাম্বিক ত্রাক্ষণের
অভাবে। অতএব শ্রীরামচন্দ্রের পূজা উপলক্ষে যদি সাতাগাছীতে এইরূপ
একটা সাম্বিক ত্রাক্ষণও তৈয়ারি হয় তাহা হইলে কি সাতাগাছী সমাজের মঙ্গলের
বিষয় নহে? এইবার সকলেই নীরব হইলেন। এইরূপ ভাবে সেদিন আমি
সাতাগাছীতে আমার বক্তব্য শেষ করিয়া, চলিয়া আসিলাম।
বিসর্জনের ব্যাপার অবশ্যেই করিবার অন্য হাওড়ার বড় রাস্তায় আমার
পরিচিত পুলিশ কন্সটারীবিগের সহিত একত্রে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার আগমন
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পরে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিয়া উঠিলে,
প্রতিমা আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার ইংরাজী বাজনা, অসংখ্য অগ্গটাক,
কাড়া নাকড়া, বাইনচি, খেমটা নাচ প্রভৃতি নানা গোচর হইলই না, অধিকন্তু
একই আলো পর্যন্তও প্রতিমার সম্মুখে দেখিলাম না। কেবল মাত্র কয়েকটা
চাকু ও কাঁসী এবং এক দল বালক হারমোনিয়ম প্রভৃতি সহযোগে গান করিতে
করিতে বাহিতে ছিল। আর গত বৎসরের কাগজের হাতী উঠ, রেলগাড়ী
প্রভৃতি ও বাঙ্গালমিষিকিগের অভিনয়রূপ শোভা বাত্মা ব্যতির করা হইয়াছিল,
প্রতিমার যে স্থানে ব্রহ্মার আগমন, সেই স্থানের উপরিভাগ একেবারে ভগ্ন
হইয়া গিয়াছিল। প্রতিমা, বালি ব্যতীত চুরিয়া গিয়াছিল। অতঃপর অন্ধকারের
ভিতর দিয়া কেবল মাত্র ইলেক্ট্রিক লাইটের সাহায্যে নগর সহর অন্ধকার করিয়া
শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত সপার্বদ গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। আমিও

কিন্তু অলপ বুক ভাসাইয়া, ত্রিদশ আর দেখিতে না। পারিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলাম। পরে বিলম্বের ও প্রতিমা ভগ্ন হইবার কারণ জানিতে পারিলাম যে, প্রতিমা, গৃহের গাভির হইবার পরে ঠাকুর বাটীর নিকটেই গাড়ীর চাকা একপাশিয়া গিয়াছিল যে, বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত অতিকষ্টে অনেক চেষ্টায় পন্ন চাকা উত্তোলিত হইয়াছিল। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র হাতে হাতে এই অশ্বমের দাক্য সকল করিয়া, তাহার ইচ্ছা পূরাইয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক এবার যে, মহাসমারোহের সহিত বিগঞ্জন না করিয়া, শোকে মুহমানাবস্থায় প্রতিমী বিসজ্জিত হইয়াছিল, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতঃপর চিরকালের জন্য পাষণ্মযা মুক্তি স্থাপন করিলে পরমানন্দ লাভ করিব।

প্রিয় পাঠকগণ। এখন কি বলিতে পারি না যে, আজকাল লোকের প্রবৃত্তির স্রোতঃ পিগঞ্জনের দিকে প্রবাহিত হইতেছে? এদিকে একপক্ষ অতীত হইতে না হইত এই কাশী, মূজাপুর, পাটনা, এলাহাবাদ, দারভাগা, মতিহারী মোজাফরপুর, বালিয়া, জলপাইগুড়ি, করিমপুর, বিপুয়া প্রভৃতি বহুতর স্থানের লোক ভীষণ জলপ্লাবনে কষ্ট পাহল। রানপাড়া বিজয়ার পরক্ষণ হইতেই এবৎসর লম্বা ভারত জুড়িয়া প্রবল বারি বর্ষণে গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি বহুতর নদনদী উজান বহিয়া গেল। এবার হরিদ্বার হইতেই যুক্ত প্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপ্ত আবির্ভাব হইল। এই প্রবল বারি বর্ষণের ফলে আমি আবার এলয় সূদৃশ ভীষণ জলপ্লাবন স্বপ্নে দর্শন করিয়া, তিন বৎসর পূর্বের স্বপ্ন সত্য হওয়ার সাধারণকে সত্য করিবার জন্য এবারও উক্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত জনসাধারণের নিকটে প্রকাশ করিলে, কেহ কেহ বিশেষতঃ কন্যাযোগ প্রেমের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, আমার অত্যন্ত স্নেহী হইবে এইকপ বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম যে, মেবারও আমার স্নেহী হয় নাই, এবাবও আমার স্নেহী হইবেন। পরন্তু মাতা বনুমতীরই স্নেহী হইবে ইহা সন্দেহ দেখিতে পাইবেন। আমার স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না, বলিয়া আমি টহা অটল বিশ্বাসের সহিত ঘোষণা করিতেছি। এখন ঘোষণা আমার সেই সকল হিতৈষী বন্ধুগণ নুবিতে পারিয়াছেন যে, আমি বাহা বলিয়াছিলাম অথবা শ্রীরামচন্দ্র আমার মূণ দিয়া বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ষে বর্ষে সত্য হইয়াছে। অধিকন্তু গত এই আর্থবর্ষের প্রবল ঝড়ে সর্বত্র সকলের,

কতই ক্ষতি চেষ্টা আছে। তাই বলি এখনও কি তোমাদিগের চৈতন্য হইবেনা ? তোমাদিগের কতব্য কি, তাহা কি ভোমরা এখনও নির্ধারণ করিতে শিখা করিবে না ? এখনও কি সকলে আবাহন ত্যাগ করিয়া বিসর্জন কবিতাই শিখিবে ? এখন দেখ দেখি সমগ্র জগত বিসর্জনের পথে দাঁড়াইয়াছে কি না ? তাহ বলিতেছিলাম,—“আবাহন কি বিসর্জন ?” অশ্মিতি ।

“গোপাল ।”

মাধুযোব ত্রিধারা ।

(নাম-রূপ-ভাব)

(লেখক—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে ।

—:—

আজি, গোপালের নাম বড় ভাল লাগে ।

নামে সুখা করে, নামে মধু করে, নামে কত ভাব ফুটে জাগে ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্তব-শ্রীমদ্ভক্তের নাম ।

সকল রসাল, সব প্রাণারাম,

গোপাল এ নাম, আনন্দের ধাম,

শোভা পায় পূর্বোভাগে ।

* ভক্তি-পাঠকগণের সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত-কবি শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে মহাশয়, ত্রৈলোক্য-রূপী গোপাল নামক শিশু-পুত্র-বিয়োগে, শোকাবুল-চিত্তে কয়েকটা অতি উপদেশ গীত-কবিতা লিখিয়াছেন, প্রত্যেক কবিতাটি, নিত্য-গোপালের সহিত সংযুক্ত থাকায়, ভক্ত মাত্রেই উহা পরম আবাস্য বস্তু হইয়াছে । ভক্ত-কবি পবিত্র হৃদয়ের উজ্জ্বলময়ী কবিতাগুলি আমরা প্রকাশ-যোগ্য মনে করিয়াছি । অন্য একটা কবিতা পাঠক-মণ্ডলীকে উপহার প্রদান করিলাম । ক্রমে ক্রমে “গোপালের” একটি মূর্তি, “ভক্তির” শ্রীঅঙ্গে বিভাসিত দেখিতে পাইবেন । (সম্পাদক ।)

গোপালের নামে এত যশ আছে,
জানিহু, বুঝিহু, মরণের পাছে
শক-ভাঙারের অপকণ ছাঁচে,
গড়া ওহু, অনুরাগে ।

গোপালের নামে গোপালের কপ,
কুটে হিষা গাঞ্জে অতি অপকণ,
লাবণ্যের ছবি, বসের স্বকণ,
প্রতির “বসো বৈনঃ” সম লাগে ।

হঠাৎ গোপাল নাম উচ্চারিত,
নিম্ন গোপালের কপ উদ্দীপিত,
হই বিচিত্র ভাবের প্রবাহে গলিত,
(কুটে) কি চিত্র, দ্বিধারা যোগে ।

শ্রীখুন্তির আত্ম-কথা ।

(পূর্ণ প্রকাশিতের পর)

—:0:—

সত্যি, মিথ্যে ভগবান জানেন, তবে সন্দেহ তখন থেকেই হিন্দু ধনীগণের মধ্যে বীরা, জমরা, আমির প্রণীত লোক ছিলেন তাঁদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য পাপ-প্রথা প্রবেশ করেছিল। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা থেকে জানা যায়, যে কোনও কারণেই চড়ক (অর্থীঃ) ভয়ে হোক বা নজীর দেখে হোক প্রায় এই সময় হইতেই নারীর অবরোধ প্রথা হিন্দু সমাজে আসে। যদিও শাস্ত্রে, কারণ হিসাবে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আদেশ আছে; তবু তাহার অবাধ প্রচলন ছিলনা। কিন্তু ক্রমে মুসলমানদের দৃষ্টান্তে ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ বা অর্ধ বিবাহ করা এবং, পুরবাসিনীদিগকে

কঠিন অবরোধ করিয়া রাখা, সম্রাট, এবং ওমরাই চালের চিহ্ন ধরূণ চলিৎ হ'ল। তারপর হ'লো তুচ্ছরিভ্রাতার প্লাষা, যে যতটা দেখাইতে পারিত সে সমাজে ততটা বাহাদুর। এমন কি কেহ কেহ বলেন, সে সময়কার অধিকাংশ কাব্যও বিগত কচি সম্রাট নহে। সে সময় থেকেই তন্ত্রের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়া-সক্তি ধর্মের নাম ধরিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তারপর ধনীগণ নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বাঁচিবাব চেটায়, তোষামোদ, আত্মভাব গোপন এবং প্রবঞ্চনা করিতে সর্বদা বাধ্য হইতেন। তাহার ফলে সমাজে তোষামোদজীবিতা আত্মবঞ্চনা ও প্রবঞ্চনপরতা বেশ সজীব ভাবে প্রসারিত হইতে থাকে।

দূর হোক সে ছাই কি বলতে ছিলাম, আর কি বলতে লেগেছি একেই বলে “ধান ভাসতে শাবের গীত” আমাকে বাপু তোমরা ‘ছাড়ান’ যাও। এই অপদার্থ রক্তকে লইয়া কেন বল খলিতে পড়ে বগড়া বাধাবে? ইয়া কি বলছিলাম? তারপর ঐত ব্যাপার। রাষ্ট্র হ'ল ফৌজ আশ্রছে।

কিছু ধার অন্য আসছে তিনি তখন কি করছেন জান? তিনি তখন—

“নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিপত্তর।

গিঁজুবনে অদ্বিতীয় মদন সুন্দর॥

সুহৃতি যে হয় তারা দেখিতে হরিষ।

দয়াময় ঐনজ ভক্তগণের হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। একদিন ভাবাবেশে “মুগ্ধ সেই” রবে চিৎকার করিয়া, ওস্তাদ ছাড়িয়া শ্রীবাসের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

শ্রীবাস তখন, ঠাকুর শরে নুসিংহ দেবের পূজা করছিলেন। ওরে বাপু রে!! এত একেবারে দরজায় ধোড়া পায়ের লাতি মেয়ে দরজা তেজে ছড় মুড় ক'রে গিরে সিংহাসনে বসে বললেন—

“কি করিস্ শ্রীবাসিয়া—

কাহারে বা পুজিস্ করিস্ কার ধ্যান?

যাহারে পুজিস্ তারে দ্যাখ্ বিদ্যান।”

পণ্ডিত চোকু চেয়ে দেখলেন সাক্ষাৎ নৃসিংহদেব সিংহাসনে বসিয়া মস্ত
সিংহ গর্জনে বলিতেছেন—

• * আরে শ্রীনিবাস।

এতদিন না জানিস আমার প্রকাশ।

তোর উচ্চ সংকীর্ণনে নাচার, তঙ্কারে।

ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইলু' সৰ্ব্ব পরিকরে॥

* * *

সাদু উদ্ধারিত, তুষ্ট বিনাশিমু মন

তোর কিছু চিন্তা নাই, পড় মোং স্তব।”

আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শ্রীনিবাস পণ্ডিত, প্রেম পুলকিত ও অস্বস্ত, মুগ্ধ কয়ে, আনন্দ
ধারায় সিক্ত হইয়া দয়াময় প্রভুর হৃদী শ্রীচরণ মস্তকে দাবণ করিলেন।

আর একান্ত হাস্য ভাবে সেবক ভাবে একেবারে নিজেই প্রভুর পদে
লুটাইয়া দিয়া, অটল অচল স্থির বিবাস স্ববে বলিলেন—

“নৌগিড়া তেহব্‌লবপুষে তড়িৎস্বরায়

গুঞ্জাবতংস পরিপিরুলসমুখায়।

বন্যশ্রমে কবল বেত্র বিঘাণ বে।

লক্ষ্যপ্রিয়ে মদুপদে পদপাশআবহু”

এদিকে যখন এই বাণীর। তখন কিহু আর এক কাণ্ডের সূচনা। কি
হ'ল? শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সাহিত মহাপ্রভুর মিলন! এই সময়ে দেহটা
হয়। আজ কাল সমস্ত ভক্তগণকে নইয়া শ্রীপ্রভু নদীয়ার বেশ আনন্দে
আছেন। কেবল যা' একটু কষ্ট শ্রীপাদ নিত্যানন্দের বিরহে।

এই স্থানে বলে বাধি শ্রীপাদ নিত্যানন্দ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ
মহানন্দধ্বজ বৃন্দাবনের শ্রীবলরাম, সুতরাং শ্রীপাদ, আমার প্রভু দাদা।
তা' না হ'লে আগা গোড়ার কৈফিয়ৎ মিল হয় কি? অবশুত প্রভু, বীর-
ভূমের এক ঢাকা এখানে শ্রীহাড়াই পণ্ডিত মহাশয়ের এবং মাতা পদ্মাবতীর
জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে অবতীর্ণ হল।

আমার প্রভুর অগ্রজ দাদা বিশ্বরূপ সম্যাসী হ'য়ে যখন তীর্থ ভ্রমণ করেন ইহারা এক সঙ্গে, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, দ্বারাবতী, রজন্যথ সেতুবন্ধ, প্রভৃতি নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন ।

শেষকালে নাকি বিশ্বরূপ দাদা শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত মহাশয়ের দেহে লীন হন । তবে মোট কথা আমার শ্রীনিমাই চাঁদ প্রভু চিরদিনই যে ঠেকে দাদা ব'লে এসেছেন, তাহা আমি বেশ জোব ক'রে বলছি । ইয়া তারপর ত্রীপাদ দিন কতক ত্রীধাম বৃন্দাবনে রহিলেন । সেখান থেকে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলে কেঁদে চোঁ, চাঁ ছুট একেবারে এসে হাজীর শ্রীনবদ্বীপে শ্রীনন্দন আচার্যের গৃহে । এ সব লীলার কথা লীলাময়ই জানেন । এর মধ্যে একদিন প্রভু বলরাম ভাবে বলেছিলেন,—

“আর ভাই হুই তিন দিনের ভিতরে

কোন মহাপুরুষ এক আগিবে এখানে ।”

তারপর দিন সন্ধ্যা প্রভু, সপাঘদ, নন্দন আচার্যের গৃহে উপস্থিত । দেখলেন, ৩৪।৩৫ বৎসর বয়স্ক, নীল বস্ত্র পরিহিত এক পরম গভীর সম্যাসী সহাস্য বদনে বসিয়া আছেন । হুইজন হুইজনের দিকে ধ্যানিক চেয়েই রাহিলেন । পরে ত্রীপাদ বল্লেন “ক, ক কানায়ো নাকি তুহয়ে ।”

বস্ মিলন হ'য়ে গেল ।

“নিষ্ঠাই নিমাই হুই ভাই

একে অন্য ভেদ নাহ ।”

অগত্বে প্রেম-বন্দ্যার বান বড় জোর শ্রোতে বহিবীর সূত্রপাত হইল, ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান ও জ্ঞানীকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া, আকুল করিয়া, নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লহতে চণিল । কি বলছ ? ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, ও সব আবার প্রভুর কথা বলতে গিরে, ধর্ম কথা আলোচনা করতে গিয়ে বল কেন ? বটে ।

জান কি ? ভালবাসাই এই কাটাধেরা সংসারের মধ্যে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু, এ জিনিষটাই, ভগবানের অভিনয়্যার দান । কিন্তু অতাপা আমরা, এই জিনিষটা নিয়েই, এই স্বর্গের মন্ডাকিনী ধারা নিয়েই অবাধে স্বার্থ, বললের ব্যবসা চালাতে কম করিনা ।

এত যে অপব্যবহার, তবু কিছু এর, সঞ্জীৱনী শক্তি! কথা তুমি, আমি, সংসারের ছেলে, বুড়ো যুবো, সকলেই কিছু না কিছু মর্য্যে মর্য্যে বুঝি।

অনুভবে, উৎকর্ষণে, ক্রমাসুসারে, সকলেই বুঝে, ভালবাসা বাদ দিলে, কিছুই থাকে না। পুরাণে, ইতিহাসে দৈনিক-জীবনে, সংসারের চারিদিকে চেয়ে দেখ, বুঝিবে জ্ঞানের ও জ্ঞানীর, শক্তি বা কতটুকু, আয় ভালবাসা, প্রেম ভক্তিই বা শক্তি কতটুকু। এই যে সংসারের বীধন গুলো এই যে জগতের গড় গড়ে চাকা, এটা চলছে জ্ঞানে না প্রেমে, ? নিজের নিজের বুকের ভিত্তর চেয়ে দেখ, দেখবে তোমাকে বাল্যকাল হইতে, কোন শক্তিতে পরিচালিত করিতেছে? তাহার মধ্যে কতটাই বা তর্কে, মীমাংসায় চলিতেছে আর কতটাই বা ভালবাসা, ভক্তি, প্রেমে চলিতেছে? বেশ বুঝবে জ্ঞান যেখানে খোঁড়া, ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, সেখানে বায়ুবেগে প্রাধানিত। ভালবাসা বিহনে শিশু, বালক, যুবা বৃদ্ধ কেহই জীবন ধারণের ইচ্ছা পরিপোষণ করিতে পারে না। এর অভাবে সব শূন্য, সব শুষ্ক, সব মরু, সব হাচাকার। জ্ঞান নাকি? এই ভালবাসার, প্রেমের, ভক্তির ক্ষুদ্রদপি ক্ষুদ্র অংশের অভাবে নিরাশায় কত শত জীব অকালে চোকের জলে ভাসিতে ভাসিতে চির বিদায় নিয়েছে! নিতেছে ॥ নেবে ॥

জ্ঞান, তর্ক, মীমাংসায় কেহ কি তাহাদের সেরে নিরাশ বেদন বুচাইয়া তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে না পারে? এহ ভাব থেকেই নিম্ন জাবেব হৃদয়। সেখানে আয়বোথ ক্রমে হীন হয়ে, ধবল থাকে 'সে'। "সে" হৃদয়, "সে" সৌন্দর্য্য জগতের আর কিছুতে আছে বলিয়া জানিতে পারে না। জগতের আর সমস্তই তখন তাহার সেই "সে"র কাছে ঘেঁষা লীন হয়। ভালবাসা, বা প্রেমের এই শক্তি, জ্ঞান বা জ্ঞানী কখনই অনুভবে আনিতে পারে না।

এই শক্তি ক্রমে কোথায় নিয়ে যায় জ্ঞান? এই শক্তি নিয়ে যায় বিদ্য-মঙ্গলকে, দাক্ষিণ্য কাটিকায়, উদ্ধালতরঙ্গে শব্দপ্রবণে, বিবধর আলিঙ্গনে চিত্তামণির কাছে। এবং তার কাছ থেকে সে চির হৃদয় বৃন্দাধনের চতুর্দিক হৃদয় শ্যাম রাশাল বালকটির কাছে। বুঝে কিছু? প্রেমের গতি কোথায়?

অবশ্য “অলল বদলের” কাটা বনে সৰ্ব্বদা আমরা এনিধি পাইনা। তবু ছিটে, ফোটা, ভাঙ্গা বা মিলে তা’ই মধুর ; তা’ই সুন্দর।

প্রকৃত খাঁটা জিনিষ, প্রেম ; কিছু চায় না। তাঁর কাছে গণনা নাই। গণনা, হিসাবদারের, গণনা ব্যবসাদারের। “সে” যে পেরেছে, তাঁর মূলধন সর্ব্বত্র বিসর্জন। তার কাছে “কেন” নাই। “কেন” ? এই কথার উত্তর ভালপূষী, প্রেম, ভক্তি, দিতে জানেনা। প্রেম বলে, তাঁকে দেখতে চাই, কত যুগ কত বর্ষ দেখি আশা মিটেনা। কেন ? তা’ত জানিনা।

প্রেম বলে আমার তাঁকে, চাইই চাই। সে জন্য দারিদ্রতা, মূর্খতা, দুঃখের বোঝা, আমুক কি কতি। আমি তাঁকে পাইবার জন্য সর্ব্ব দুঃখ সার করিব। গৈরিক আন, ভেক আন, আমি সর্ব্ব ছাড়িব, ছাড়িবনা তাঁকে। কেন ? তা’ত জানিনা।

প্রেম বলে দিয়াছি সব দিয়াছি। দেহ, মন, মান, লজ্জা ধন, জন, পিতা, গৌরব, আশ্রয়, বন্ধু বান্ধব, আসক্তি, বৈরাগ্য সব দিয়াছি। কেন তা’ত জানিনা।

প্রেম বলে আমি কেবল তাঁর চরণে মাথা রাখিব। আমি তাঁর। সুতরাং আমার আলাড়িদা আর কি আছে ? আমার দেহ আমার মন, আমার প্রাণ ইহাত’ সবই তাঁর। অমুগ আমার বলিয়া আর কিছু ভাবিতে পারি না, পারি, কেবল তাঁর পায়ে পুটাইতে, কাদিতে, আর বলিতে চাই “আমি তোমার” “আমি তোমার”।

দূর হোক গে ছাই, কি বলতে কি বলছি ! বুদ্ধের স্বভাবই এই। দোহাই তোমাদের ; গালা গালি করিওনা। ইয়া তার পর, দিনকতক প্রভুর খুব ভাবাবেশ হ’তে লাগলো একদিন প্রভু করলেন কি, ভাবাবেশে বিধু সিংহাসনে বসে বললেন—

“নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে।”

হে হৈ কাণ্ড। বৃদ্ধ আচার্য্য স্তব সুন্দর করলেন। প্রভু ঠাণ্ডা হ’য়ে বললেন—

“তোমার দস্তল লাগি অবতীর্ণ আমি

বিস্তর আমার আরাধন কৈলে হুম

শুভিয়া আছিলুঁ ক্ষীর সাগর ভিতরে
নিজা ভল মোর, তোর প্রেমের হুকারে ।

* * * *

যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি তাহে মনে
তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্বজননে ।

কিছু বুঝলে কি? লীলা! লীলা!

ক্রমশঃ—

ক্রি—

বাঁশীর আশ্রান ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হবেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ ।)

—:—

যমুনার তীরে ধীরে—অতি ধীরে
বাঁজিছে শ্যামের বাঁশী ।

বাঁশীরব শুনে গোপ বধুগণে
পরিণ প্রেমের ফাঁসি ॥

সংসার ধরমে গৃহের করমে
মন আর নাহি সরে । * *

বাঁশরীর তান গোপিকার প্রাণ
সতত ব্যাকুল করে ॥

চির অবোধিনী সরলা গোপিনী
জলা কলা নাহি জানে ।

হে নিষ্ঠুর শ্যাম । এই তব কাম
গোপিজনে মার প্রাণে ॥

তোমার চরণ— সরস ধল,
বিকায়েছে তব পায় ।

দেছে মনঃ প্রাণ গেছে কুলমাস
রাগ গোপিজনে রায় ॥

হতাশে-আশ্বাস ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত নকড়ি রায় গুপ্ত ।)

—:—

কে যেন সাঁজের বেলা আমার হৃদয়ে গায় ;
 'কি যেন জীবনে কিছু হ'লোনা হ'লোনা হয় ।
 'সকাল বেগার বেথে' চারিদিক্ আলোময় ;
 কত আশা ক'রেছিহু কিন্তু এবে স্নান লয় ।
 বেঁধেছিলি খেলা স্বপ্ন সযতনে সংগোপনে ;
 ভেবেছিলি মন কুণ্ডল ধৌলিক সাধির সনে ।
 এবি দেখি তোর স্নান কে কোথায় চলে যায় ;
 আমি শুধু পা ও একা কারেতেছি হায় হায় ।
 অনন্ত আকাশ তরে শীতল কৌমুদী কোলে ;
 মনস মোহনে কীর্ণা বসন্তিত বাতা দোলে ।
 কেনে দূর প্রকমল মনস মোহনে কীর্ণা ;
 ক্ষীণ বক্ষে তীব্র বেগে নিহু পানে নদী যায় ।
 আশন নিমতি বশ সনে হয় আশ্রয়ান ;
 অতপ্ত বাসনা ল'র আমি শুধু ত্রিমাণ ।
 এখন সাঁজের বেলা, ডাবিয়ে কি হবে আর ;
 বুকেও খেঁচনা মন, হরিষ চরণ সার ।

নিরুজ্জ্বল ।

—:—

হে গৌরীশ :—

সকল সাধো সাধনা বিতীন কি আর করিবে যাচন্দ—

চূর্ণ করে দাও ! "ক'সি ও আমার" যুচে বা'ক্ "আমি" গণনা ।

ভেঙ্গে দাও মাধ ! খন ভাব যোর বিশেষ ঘাই শত অগুনত

ভাহে হরত কখনো মিটিবে গো ত্বা পাব পরশণ ঐচরণে ।

তুমি ভক্তের পূজা আত্ম আত্মান তনি' যবে যাবে ছুটিয়া,
 যোরে পথে-পড়া-শত-গুলি-কলা-ননে যেতেও পার গো দলিয়া।
 যদি কঠিন "আমার" কোনও অগুণী ব্যাধা দেয় তব চরণে'
 তবে কি কাজ তাহার কর তব তারে মিশে যাক বিধে, জীবনে।
 তাহে হরত কখনো অনন্ত প্রবাহে তাসিয়া, ডুবিয়া, উঠিয়া—
 কোনও পুতলকে নিমেষের তরে শ্রীপদে পড়িবে আসিয়া।
 সকল ভেজ: দীপ্তি আধার! লভিলে তোমারি স্পর্শ—
 তব ভেজে দ্রব নবীন জীবনে, জাগিবে ভেজ হর্ষ।
 হর্ষে খেলিবে মঙ্গল মরুত অনন্ত ব্যোম শূন্যে
 "আমার" নিকৃতি শ্রীপদ-দেবদ নাহি কাজ কিছু অন্যে।

দীন—নিত্যরসদ।

শ্রীগুরুডের মোহ ও মৎসঙ্গ-প্রভাব।

(লেখক—শ্রীধামনবদ্বীপ-বাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস।)

—:—:—

হৃদয়ভূগে শ্রীরাম অবতাবে যে সময়ে ইচ্ছাকৃত শ্রীরাম লক্ষণকে নাগপাশে
 বন্ধন করেন, তখন দেবর্ষি নারদ শ্রীরাম লক্ষণকে পূর্বোক্ত বন্ধন ছেদন
 করিবার জন্য গুরুডকে প্রেরণ করিলেন। গুরুড আগমন পূর্বক পূর্বোক্ত বন্ধন
 ছেদন করিয়া মনে করিলেন,—

“ব্যাপক ব্রহ্ম বিরাজ বাগীশ।

যাণী মোহ পার পরমীশ ॥

সো অবতার দুমে উজ্জব হারী।

যেথো উমো প্রভাব কিছু নাহি ॥”

ইত্যাদি অর্থাৎ যিনি ব্যাপক ও ব্রহ্মরূপে বিরাজিত, বেদপতি এবং
 মায়া বোহের' অতীত পরমেশ তিনিই জনংঘ্যে শ্রীরাম রূপে অবতীর্ণ
 হইরাছেন ইহাই তিনিয়াছি, কিন্তু তাহার কোন প্রভাব দেখিতে পাইতেছি না;
 তাহার নামে জীবের তব বন্ধন মোচল হয়, ব্রাহ্মসঙ্গ তাহাকে দাসপাশে বন্ধন

কার্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩২০।] শ্রীগুরুডের মোহ ও সংসার-প্রভাব। ৭৫

করিয়াছে, আর সেই বন্ধন ছেদন করিতে আমি আসিলাম, তবে কি দ্বায় ব্যাপক, ব্রহ্ম স্বরূপ পরমেশ নহেন ?

গুরুডের এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইল। সংশয় হইবারই কথা। শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী লীলাশক্তির বৈচিত্র্য প্রভাবে কাহার না সংশয় হয় ? মায়া বন্ধ জীবতো সেই লীলা প্রভাব কিছুই লক্ষ্যম্ভঙ্গ করিতে পারে না। বাহ্য্য মায়াভীত নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত তাঁহারাও লীলা শক্তির বৈচিত্র্য ভাব লক্ষন করিয়া আত্মহারা হইয়া মোহিত হন। এমন কি ভগবান পর্যন্ত নিজ লীলার নিজেই মোহিত হন।

এই হেতু দেব-লীলা অপেক্ষা মানব-লীলা ভগবানের এত প্রিয়। যে লীলার ভগবান মোহিত হন, সেট লীলার ভোগ্য মুক্ত না হইবে কেন ? সচ্চিদানন্দময়ী ও বৈচিত্র্যময়ী লীলা-শক্তির গুণত্ব এবং প্রভাববাদি প্রকাশ করিবার জন্যই ভগবান নিজ লীলায় নিজে মুক্ত হইয়া ভক্তগণকে মোহিত করেন, তাই মুক্ত ভক্তের সংশয় হয়। অথবা বন্ধ জীবের সংশয় দূরী করণার্থ ভগবদিক্ষায় ভক্তের সংশয় হয়।

যাহা হউক গুরুডের এই প্রকাব সংশয়রূপ মোহ হইলে তিনি দেববি নারদেব নিকট গমন করিয়া নিজের সংশয় জানাইলেন। শ্রীনারদ গুরুডকে লক্ষ্য নিকট গমন করিতে আদেশ করিলেন। গুরুড গুরু নিকট উপস্থিত হইলে গুরু লক্ষ্যদেবের নিকট তাকে প্রেরণ বলিলেন। পথিমধ্যে মহাদেবের সহিত গুরুডের সাক্ষাৎ হওয়াতে মহাদেবকে প্রণামানন্তর নিজ সংশয় কহিলেন। • মহাদেব গুরুডকে বলিলেন, হে গুরুড ! নিগরিব পক্ষতে ভূষণি কাকের নিকট গমন কর। সেখানে প্রত্যহই পক্ষিগণ আসিয়া ভূষণি কাকের মুখে শ্রীরামচরিত প্রবণ করিয়া চরিতার্থ হয়। ভূষণী কাকও পক্ষী আর ভূমিও পক্ষী; উভয়েই পক্ষী জাতী বলিয়া উভয়েই উভয়ের লক্ষ্য গত ভাব এবং ভাবানুগত ভাবা বুঝিতে পারিবে। ভাবানুগত ভাবা, ভাবাতেই ভাব প্রকাশ হয়। অতএব ভূমি ভূষণি কাকের নিকট গমন কর।

অতঃপর গুরুড নিগরিব পক্ষতে ত্রিকালজ্ঞ ভূষণি কাকের সমীপে গমন করিল। স্থান-মাহাত্ম্যে গুরুডের সংশয়-রূপ-মোহ আপনা হইতেই বেন বিদূরিত হইল। ভূষণি কাক গুরুডকে সমাগত দেখিয়া সাবরে অভ্যর্থনা পূর্বক

যে অন্য গুরুত্ব আনিতেছেন সেই আগমন বুঝাত্ত বেন কিছুই জানেন না, এরূপ তাব প্রকাশ করতঃ, সাধারণ ভাবে আগত প্রশ্ন করিলেম, এবং উপাধাশন করিতে বসিলেন। অন্যান্য পক্ষীগণের মাথা গুরুত্ব উপবিষ্ট হইয়া নিজের মোহ ও মোহের কারণ এবং তাদৃশ মোহের বিনাশ প্রভৃতি সকল কথাই আমু পুর্বিক বর্ণনা করিলেন, গুরুডের মোহ বুজাফ ভনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করতঃ ভূবন্তি কাক, গুরুডকে শ্রীরাম চরিত্র বলিতে লাগিলেন। শ্রীরাম চরিত্র ভাবণ করিতে করিতে গুরুডের মোহাকাকার দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। শ্রীভগবানের চরিত্ররূপ সত্য উদ্ভাস হইলে কি মোহাকার থাকিতে পারে? বোধ হয় শ্রীভগবানের চরিত্র-চরিত্র একবার মোহাকার মাশাক, ইহাই যেন বহু জীবকে শিকার দিবার জন্য গুরুডের মাথা হেঁচকি দিল। নচেৎ মুক্ত জীবের আবার সংশয় বা মোহ কি? এই ছোট্ট শৌনকাণি কথিবৎকে স্তম্ভত বসিষাছেন—

“পুরানার্ক্যাপুরানাদিত” এই বলির অজানাভাবে ভীতিগত সার্থক
উদয় ঘটল। প্রীতাম মল্লিক তখন এসেছে সৌন্দর্য্যের প্রতি পূর্ণ গম্ভীর হওয়া
পুরুষ ভূষণে বাঁধে, কিন্তু সে ভয়ানক ভয়ানক। তখন এসেছে উত্তরের
কিছু ভেদে শাস্ত্র বিদ্যা বাঁধে, তখন এসেছে সৌন্দর্য্যের বসন, বসন না পড়ে তাড়াতাড়
বসন।

ভূষণ কঠিনেন হে গকড়। অসংখ্য উদ্ভিদ ভবনঃ নিশ করেন,
অতএব উভয়ের সাধারণতঃ হেদ না পাই। সৌন্দর্য ভবনঃ ভবিষ্য কিতু হেদ আছে,
অবশ্য স্বীকার্য, কিং হেদ ভাঙ্গা সাধারণ হইয়া অরণ্য গদা।

শাস্ত্র যে সকল ক্ষয়, বিবরণ, যোগ ও বিচ্ছিন্নের কথা বলিয়াছেন, তদ্বারা
ভগবৎ ৭১ ১২৪০ তীয়া সকলেই পূৰ্ব। পূৰ্বের প্রবল প্রভাব সর্বত্রই
প্রকাশিত। ১২৪০ দ্বীপ দক্ষিণ এবং সহজেই পক্ষপাতী।

বে পুরুষ বিরক্ত, খাওয়ার মতি হির হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষেই স্ত্রীক ভ্যাগ করিতে সক্ষম হয়। বে পুরুষ দিবস কামো এবং ভগবৎ বিমুখ, তাদৃশ পুরুষই মাতার বশীভূত হইরা থাকে।

কিন্তু নারী যত্ন নিজে মাথা প্রকাশিত করে, এখন জ্ঞান নিখার ভাবশ যুগিও
যুগ নারী নারীও চন্দ্রযুগ বর্ণন করিয়া বিকল হইয়া পড়েন। এখন তাহার জ্ঞান

বিরাগ যোগ ও বিজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই থাকেনা। নারীর মোহিনীরূপা মারা প্রাতে লকলেই ভাসিয়া যায়।

হে বৎস গরুড়, আমি কাহারও পক্ষপাতী হইয়া কোন কথা বলিবনা। বেল পুরাণ ও সাধুগণের বাহা অভিশ্রাব, তাহাই নিরূপক ভাবে তোমাকে বলিব—

হে গরুড়। তোমার অপূৰ্ণ যুক্তি বলিচোছ, শ্রবণ কর। নারীর রূপ কখন নারীকে মুগ্ধ করিতে পারেনা এবং নারীর রূপে পুরুষই মুগ্ধ হয়।

সকলেই জানেন, মারা এবং ভক্তি উভয়ই স্ত্রীজাতী, অতএব নারীরূপ মারার স্বর্ণে নারীরূপা ভক্তিদেবী মুগ্ধ করেন না, বরং পুরুষরূপ জ্ঞান, বিরাগ যোগ কামাদি ইহারা মারারূপে মুগ্ধ করেন। বিচার করিয়া দেখ, ভক্তিদেবী গুণবান্ রঘুনাদের প্রিয়া, আর মারা কোড়কী। ভক্তিদেবী মারার অতীত বালরা শ্রীরঘুনাথ প্রাপ্তির অমুকুল। আর মারা কোড়কী বলিয়া শ্রীরঘুনাথ প্রাপ্তির প্রতিকূল।

হে গরুড়, সৰ্বদা বিদ্য দ্বারা অনাভিজাত্য নিবগমা নিঃপানী ভগবদ্ভক্তিতে শ্রীরাঘবচন্দ্রে বিরাজিত রয়েন, মারা নারী দর্শন করিয়া সজ্বলিত হৃদয়ঃ নিজ প্রভাব কিছুই বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না। এই সকল বিচার করতঃ জ্ঞানি পণ, যোগিগণও মুনিগণ সকল হৃদয়ঃ পান-স্বরূপা ভক্তিদেবীকে প্রার্থনা করেন।

হে গরুড়। ভগবান শ্রীরাঘবচন্দ্রের প্রতি উন্মূৰ্ছ কাশিণী ভক্তিদেবীর গুঢ় রহস্য কেহই জানেনা। রাঘবচন্দ্রের রূপা ব্যতীত ঐ গুঢ়ত্ব কেহই জানিতে পারেনা। ইহার প্রতি শ্রীরাঘবচন্দ্রের রূপা হইয়াছে তিনিই ভক্তিদেবীর গুঢ় রহস্য জানিতে পারেন, কণ্ঠধীন ব্যক্তি পারে না। যিনি ভক্তিদেবীর রহস্য জানিয়াছেন তাঁহার স্বপ্নেও মোহ উৎপন্ন হয়না। হে প্রবীন গরুড়। এক্ষণে আমি তাদৃশ জ্ঞান ও ভক্তির উত্তমের পার্ধ্য না ভেদের কথা বলিব তাহা তুমি শ্রবণ কর। বাহা শ্রবণ করিয়া সৰ্বদাই শ্রীরাঘবচন্দ্রের সীমাহীন প্রীতি উৎপন্ন হইবে।

হে বৎস, যে সকল কথার মধ্য বোকা যায়, কিন্তু বলা যায় না, তাদৃশ বর্ণনা-ভীত অব্যক্ত বাক্য সকল তোমার নিকট বর্ণন করিব। শ্রবণ কর। জড়াত্ম ও চেতনাংশ নামে ঈশ্বরের সাধারণত দুইটী অংশ আছে। জড়াত্ম বলিতে মারা আর চেতনাংশ বলিতে জীব। ঈশ্বরাত্ম তাদৃশ জীব অবিনাশী, চিৎস,

নিঃশূল এবং স্বাভাবিক সুখরাসী প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন হইয়াও মর্কট বন্ধন সাদৃশ্য মায়ার অধীন হইবেন।

কামনার অধীন হইয়া যখন জীব মায়ার অধীন হন তখনই চেতন জীবের উপর অভিক্রমা মায়ার প্রবী, (গীড়া) আগতীত হয়, তাহাতেই চেতন জীবের বন্ধন হয়। যদ্যপি তাদৃশ বন্ধনটা মিথ্যা হয় তথাপি সেই মিথ্যা বন্ধন ভেদন করা জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সেই বন্ধন হইতেই জীব সংসারী হইয়েন জীবের সংসার হহলে আর নারা প্রাণীও বায়না এবং সুখলাভও ভাগ্যে ঘটেনা। সাধুসঙ্গের এমনই মহিমা যে, ভুখড়ীর নিকট এই সকল শুনিয়া গরুড়ের মৌহ দূর হইল।

পল্লীবাসী লিখিত “নন্দত্রয়োগে মহাদ্বাদশী”

প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী।)

—:—

অনেকদিনের পর সোঁদন আমার কোন বন্ধু ২৪শে জ্যৈষ্ঠের “পল্লীবাসী” নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র আমাকে দেখিতেদেন, উহাতে “ত্রীমঃ” লিখিত “নন্দত্রয়োগে মহাদ্বাদশী” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেখিলাম। প্রবন্ধে “আমার বক্তব্যের ‘অমুকুল বা প্রতিকুলে কাহারও কোন কথা থাকিলে তিনি তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে একটা শাস্ত্র সমস্ত মীমাংসা পক্ষে চেষ্টা দেখা যাইতে পারে। তবে যদি কেহ কোন কথা না বলিয়া নীরব থাকেন, তাহা হইলে প্রথম পক্ষের মতই যে সর্ব্বথা গ্রহণীয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কাহারই কোন অবকাশ থাকিবে না।”—এই প্রাগল্ভ্যজ্ঞান দর্শনে নাম হইত তীত ব্যক্তির প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রবেশন বোধে, ইহার সম্বন্ধে পুসে জীভীবিষ্ণু শ্রিয়া পত্রিকায় আলোচিত হইলেও পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন হইলাম।

মহাদ্বাদশী সম্বন্ধে পূর্বে জীভীবিষ্ণুশ্রিয়া ও জীর্গোবাসেনক পত্রিকায় বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এবং এ বৎসর যে পাপনাশিনী

হইবেনা” তাহাও ১০ই আষাঢ়েরু শ্রীশ্রীবিমুক্তপ্রিয়া পত্রিকায় ঢাকা আবিয়াল নিবানী বৈষ্ণব ব্যবস্থাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিশোহন গোস্বামি শিরোমণি মঙ্গলেশ্বর শিষ্য শ্রীবৈষ্ণব চরণ দাস মহোদয় শাস্ত্রযুক্তিতে আপোচনা করিয়াছেন তথাপি সিদ্ধ সাধন বা পিষ্টপেশণ দোষে দুষ্ট হইলেও একপ ভ্রান্ত মতের প্রচারে বাধা দেওয়া কর্তব্য বোধে, বিজ্ঞ পাঠকগণের অবগতির জন্ত পুনর্বার কিঞ্চিৎ লিখিতে হইতেছে।

লেখক কারিকার যে ভাবে অর্থ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাতে “শ্রীশ্রীহরিশক্তি বিলাস” গ্রন্থ যে গুরুর নিকট যথারীতি অধ্যয়ন করিয়াছেন তৎপক্ষে কোন সন্দেহ উপস্থিত না হইয়া যায় না। যেহেতু এবংসর পাপনাশিনী হইবে কি না। এ বিষয়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিতেন না।

এ এবংসর যে “পাপ নাশিনী হইবে না” তদ্বিষয়ে, আমাদের কোন সংশয় নাই এবং যাহারা বুধা পণ্ডিতভিত্তিক নাই হইয়া সমাধিত চিন্তে শ্রীশ্রীহরিশক্তি বিলাস গ্রন্থের আলোচনা করেন তাহাদের কোন সংশয় নাই। আর যাহারা শাস্ত্রান্ভিত্ত হইয়াও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীর সম্মিলিত মত গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহাদেরও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু বর্তমানকালে বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের ঐক্য মতে কলিকাতা “ভাগবত ধর্ম মণ্ডল” হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণবতত্ত্ব তালিকা সাধারণে প্রতিবৎসর বিতরণিত হইয়া থাকে, তল্লিখিত দিনে তাহারা নিঃসংশয়ে তত্ত্বাচরণ করিতে পারেন। এই বৈষ্ণবতত্ত্ব তালিকায় শ্রীধামকৃষ্ণদাসের প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামি সর্কেমোম, শ্রীশ্রীবিমুক্তপ্রিয়া পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যভূষণ, শ্রীশ্রীমণিত্যানন্দবংশীর প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামি সিদ্ধান্তবহু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী গোস্বামি ভাগবতবেদান্তাচার্য ও মাড়ো নিশানী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ গোস্বামি বেদান্তভূষণ এবং গদাড়িনিবাসী বৈষ্ণব শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্তস্বপ্নধর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহন এবংসর পাপনাশিনী মহাবাদশীর উল্লেখ করেন নাই তখন আমরা কিরূপে পাপনাশিনী মহাবাদশী নাকার করি।

তৎপরে আমার নিজের স্বত্বটুকু শাস্ত্রজ্ঞান আছে তাহাতে শ্রীশ্রীহরিশক্তি বিলাসের উক্ত মহাবাদশী নির্ণয়স্থলের আলোচনার কোন ক্রমে বুঝিতে পারিলাম

না যে, নাম প্রকাশে ভীত লেখক মহোদয়/কল্পে মহাবাদশী স্থলে নক্সের
মান দাদশীর সহিত গ্রহণ করিতে হইবে লিখিলেন

• পূজপাশ সনাতন গোবামৌ মহাশয় এয়োদশ বিলাসে প্রথমে অষ্ট মহা-
বাদশীর কথা সাধারণভাবে লিখিয়া “অথ ঋক্ প্রযুক্তানাং ত্রয় কতব্যং যথা ।
জয়াদীনাং চতুঃপাং তথাব্যক্তং নিবশ্যতে ॥” ইহা বলিয়া ভান্যকৌদর কারি-
কার আদৃত করিলেন যথা—

“ভান্যকৌদরমারম্য প্রবৃত্তান্যধিকানিচেৎ ।
সমান্যুমানি বাবহুত্ততোহমীকং ত্রয়োচিতি ॥
কিস্বা সূর্য্যোদয়াং পূর্ব্বং প্রবৃত্তান্যধিকানিচেৎ ।
সমানি বা তদাপ্যেবা ত্রয়চরণ যোগ্যতা ॥
অবশ্য্যতিরিক্তেষু নক্সেষু থলু ত্রিযু ।
সূর্য্যাস্তম্ন পথ্যন্তং কাব্যং দাদশ্যপেক্ষং ॥
অবশ্যেত্তস্তম্নতঃ প্রাঃ দাদশ্যাং সমাপ্ততাং ।
গভার্যাপি তত্রৈব ত্রয়োচিততা ভবেৎ ॥”

এখানে এই কারিকাতে “ভানি অকৌদরমারম্য প্রবৃত্তানিচেৎ, অধিকানি,
সমানি উমানি, বাবহু ততঃ অমীকং ত্রয়োচিতি । কিস্বা সূর্য্যোদয়াং পূর্ব্বং
প্রবৃত্তানি চেৎ অধিকানি সমানি বা তদাপি এষাত্রয়চরণ যোগ্যতা ।” ইহাই
কারিকার অর্থ ।

এখানে নক্সের সাম্যাদির পরিমাণ শব্দের কোন অবলম্বনে লেখক দাদশীর
সহিত গ্রহণ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না ।

দ্বিতীয়তঃ নৃসিংহ পরিচর্যা এত্বে ও—

“আদিভ্যেন জয়চ্যুতেন বিজয়া পুংস্যেণ পাপানহা ।
রোহিণ্যা চ জয়ন্তিকাপি চতুঃষষ্ঠকং দিনাদেৰ্ভবেৎ ॥
পূর্ণং চৌনমধ্যাহ্নিকং হরিভ্যাধিক্যে তু ভাত্তর্জুজ ।
ঋষাধিক্য সমস্তর্যোস্ত দিনতঃ প্রাগ্তে চ পচাদ্ভ্রতং ॥

এই কারিকাতে ও দিনতঃ শব্দ হইতে দিনের সহিত নক্সের প্রযুক্তির
উল্লেখ দেখা যায়, এবং লেখক মহাশয়ের উক্ত “অসংখ্যঃ” বলিয়া অসংখ্য
নিষ্পত্ত কারিকার যে অর্থ উক্ত হইয়াছে উহাতে “জয়াদিযু” শব্দের সহিত

কার্তিক, অক্টোবর ১৩২৩ ।] পাগল রাধামাধব সমালোচনা । ৮১

“পূর্ণাদি” পদের অর্থ কি করিয়া করেন ? বিশেষতঃ যখন তৎপূর্বেই “নিম্নাধঃ
 প্রবৃত্তং” এইরূপ পদ রচিয়াছে তখন সন্নিহিতাদি পদকে পরিভাষ্য করিয়া
 অধঃকারিত্বাদি বাদশী পদের কল্পনা করার অন্তিমস্তাভিই পরিচয় প্রদান করা
 হইরাছে । কারণ গ্রন্থকর্তা স্বয়ং কারিকার কি অর্থ করিলেন তাহা দেখা
 সন্দেহে কর্তব্য । তিনি “অরম্ভঃ” বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে
 “হ্রাসরূপি পূর্ণালোচনার নক্ষত্র নান্দ্র জাম্বাধিক্যেয় সংখ্যপি যোহিণী চেৎ
 যষ্টি ষটিকাভূত । পারণ দিনে বর্জ্যতে ।”—এখানে যদি এই নক্ষত্রের হ্রাসরূপি
 বাদশীর হইতে গৃহীত হইত তাহা হইলে “যষ্টি ষটিকা ভূত পারণ দিনে”
 এইরূপ লিখিতেন না । প্রবণা ব্যতিরেকে নক্ষত্রাত্তরের যোগফলে বাদশীর
 সূচ্যন্ত কাল পর্যন্ত অবস্থিতির অপেক্ষার বিষয় দেখার কোনই সার্থকতা
 থাকিত না ।

একপে বিজ্ঞপাঠকগণ বিচার করিবেন । আমরা কোন ক্রমেই তিসির
 সহিত নক্ষত্রের সাম্যাদির গ্রহণ করিয়া আগামী ২১শে ফাল্গুন সোমবার পাণ
 দাশিনী মহা-বাদশী স্বীকার করিতে পারি না । অন্বিতি ।

সমালোচনা ।

(পাগল রাধামাধব (প্রথম খণ্ড) ।)

শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে সম্পাদিত ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালাহর দাস বহু ভক্তিসাগর ।)

—:—

অনুরোধে এই উত্তম গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে সাহসী হইলাম ।
 ইহার সমালোচনা সম্বন্ধে আমাকে তিনটি মহাস্বার নাম কীৰ্ত্তন ও সংকীর্ণ
 কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে । পাগল রাধামাধব, পাগল হরনাথ ও শ্রীমাক
 রসিক লাল দে । শ্রীমান রসিক লাল আমার প্রেত বন্ধু । টনি “রাগা পা”
 হ’বারি, “প্রেমের ডালি” প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থের প্রণেতা এবং আর সমুদয়

ঐতিহাসিক লেখক। নিবাস, বাঁকুড়া, যোগামুখী। ইনি তথ্যের গরীব ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া জীবে দরার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ভাষাভাষার অমৃত পড়িয়া আমি জীবনের অনেক দুঃখ পাসরিয়া গিয়াছি। ইনি উচ্চশিক্ষিত তত্ত্ব "বাঁকুড়ার আখরস"। তত্ত্ব-মহিমা গানে ইহার লেখনী বংশী স্বরূপ। ইনি বৈক্য তত্ত্ব-নিচয় একে একে কবিতাছন্দে সুন্দর গাঁথিয়া তত্ত্ব-কণ্ঠে পরাইতেছেন। ইহার করিতা সকল প্রাচীন পদ্যসুন্দর্যে না হইলেও রসাল, প্রাণস্পর্শী, প্রেমবর্ষী। এই শাগল রাধামাধবের উপদেশাবলী সম্বলিত করিতে বাইরা তত্ত্ব ইনি তাঁহার ভাববর্ণনায় যে সকল কবিতা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সে সব অমূল্য মধুপ্রসূত রহস্যময়ী, সন্দেহ নাই।

রসিকের ভক্তি ও প্রয়াসে শাগল শ্রীরাধামাধব এখন বৈক্য বঙ্গ অপরিচিত নহেন। কিছুকাল ইনি রসিকের সুপ্রতিষ্ঠিত গরীবাস্রমে অভিধ্ব হন। রসিক রাধামাধবকে তখন সুন্দর চিনিয়াছেন এবং তাঁহার কলিত সঙ্গ্রে অনেক পরমার্থ লাভ করিয়াছেন। রসিকের কুশল আমার সঙ্গে রাধামাধবের পরিচয় ঘটে। তৎসঙ্গে তৎকালের অনেক লেখালেখি হয়। তাঁহার মতের সন্মতনের অমুয়োদন না করার রাসিক আমার প্রতি সময় সময় বিরক্ত হইয়াছেন, ইহাও আমাকে লিখিতে হইল। রাধামাধব নিজদৈন্যে মালুশ অধমকে "দাদা" সম্বোধন করিতেন আমিও তাঁহাকে দাদা বলিতাম।

"বন্দন চিন্তে নারে দেবের শকতি।"

তখনও রাধামাধবকে চিনিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীমান রসিক সম্পাদিত এক গ্রন্থপাঠে ৩২ মধ্যমঃ ২২৩ নং পরিচয় পাইলাম। ইহার উপদেশোক্তিগুলি সত্যোক্ত-রসমণ্ডিক কবিতা রস। কিবা প্রভা। সভ্যই উপদেশোক্তি পাঠে আমি লজ্জাবান হইয়া লুপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি।

শ্রীরাধামাধবের উপদেশ, আমিও কবিতা খাঁটি সোণা। ভাষা দিয়া আমার আমার শ্রেয়তম রাসিক কারিকর অলঙ্কার গড়াইয়াছেন, রক্ত দিয়াছেন। এমন দিব্যোত্তম সুন্দর আদরের সামগ্রী বকে ধারণ করিয়া অন্য হইবার লোভ কাণায় না জমে ?

শ্রীরাধামাধব আদ্য পাঠ করিলাম। পাঠে মূল সূত্র মালুশ কীটাবের জ্ঞানব্দের গীমা পরিসীমা রহিল না।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা পাগল হরনাথ অসাধারণ মূর্ত্যবৎ । ইনিও বাঁকুড়ার আবির্ভূত হন । ইনি একজন বি. এ । কাস্ট্রীর মহারাজের দেবার্জনবিভাগের সুপারিন্টেন্ডে এইরূপ জ্ঞানি । ইহার বহু শিশুকিত শিষ্য আছেন । হরনাথ দাদার পত্রমার্থ সম্বন্ধে হুজুঁড়ায় শ্রীমান বাবা নন্দলাল পাল, কলিকাতা আহিরীটোলার জমিদার দাদা শ্রীযুক্ত রাধা বল্লভ শীল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আমাদের খুব অন্তরঙ্গ । হরনাথ দাদার কতকগুলি কথামৃত শ্রীমান রসিক “শ্রীসৌগত” পত্রিকায় ক্রমশঃ আয়াদিগকে উপহার দিতেছিলেন । মধ্যে মধ্যে কোন কোন উপদেশের দোষোন্মেষ করিলে রসিক আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন, আমাকে সত্যের অনুরোধ লিখিতে হইত । বিরক্ত হইবার কারণ এই যে, শ্রিয়জনের দোষ এবং একুত্ত বহু অনুসহনীয় । দু’টি আদর্শ রসিকের ধর্ম-জীবনের পরিপোষক — প্রথম হইলে হরনাথ, ভৎসনপাক মাধুর্য্য যতনে রাধামাধব । আজ সেই রসিকও হরনাথকে ছাড়েন নাই । মাধুর্য্যমণি পাইলে প্রথমা কাচের যন্ত্র ও সেবা কে করে ? ভাগ্যবান রসিক । হরনাথ দাদার “উপদেশ দুট” এত আমি পাঠ করি নাই । ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় লিখিত পাগল হরনাথ পত্রাবলী এই সমুদ উপহার পাইয়া পাঠ করিয়াছি । এই পত্রাবলী অতি সরল ভাষায় শ্রীনাথ মহিন্দা বোষণা করিতেছে । আজ সেই রসিক লাল “পাগল রাধামাধবে” একবারে অস্বাস্থ্যকর না হইলেও হরনাথ দাদার উপদেশের, তাঁর ভাষণ, দোষ কীটল করিয়াছেন । কীটল না করিলেই ভাল হইত ।

ভাগ্যবান রসিক রাধামাধবে মহাপ্রভুর বিরোধোদ্ভবী গভীরা লীলা একট দেখিতেছেন এবং উদ্দর্শনে সফল হইবার জন্য পদবশ হইয়া অগজীবেকে আহ্বান করিতেছেন । রসিকের মনোব্যথায় সবে দাঁড়, কেত কর্ণপাত করিল না, সুবর্ণ সুবোণ হারাইয়া যেন সবে অদল্য । অন্য রাধামাধবের আশ্বাধা ততোধিক ।—এবং কৌতুহল জনক হটে । আবার বিশ্বদেবও । কারণ রসিক এবং অপর দুই চারিজন বৈ ও.দশে কি এমন মাহুয় নাই যাহারা রাধামাধবকে অসাধারণ প্রতিভাবান্ প্রেমিক ভক্ত মনে করিতেছে । রাধামাধব বৈষ্ণব সেবা প্রাণী পিতা প্রান মানসে একসের চাউল ও একআনা পরদা দৈনিক ভিক্ষা চাহিতেছেন, পাহতেছেননা । শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধ্মনভে নিধিকন

ভক্তের জীবিকা সম্বলানই ভিক্ষা। রাধামাধবের এই আশনার ভিত্তিমূলক, স্বয়মূলক। কত লোক অপাত্রে ভোড়া চালায়।

পাণ্ডবের উপদেশগুলির আলোচনা করা যাউক। ইহাতে অপরাধ হইবে কিনা জামিনা; জানি, প্রেমময় রসিকদাদার আদেশ পালন।

“নিরপরাধ নামসকৌর্জন” হুল্লুভ ভক্তিজাণের উপায়। নিরপরাধ হইবার সংকল্প নিজেকে পতিত জ্ঞান করা। তুমিই পাপ। স্তম্ভ্যাত জীব মাত্রই পাপী। আমি পাপী, অথচ পাপী বোধ না করা অহংকার মূলক। অহংকারের ধার দিয়া প্রভু আসেননা। আমি পাপী (পতিত) এই ধারণা দূত হইলে চিন্তে কাতর বা আশ্রিত ভাব আসে। আমার ঠাকুর দৈত-মাধবের কাদাল। “আমি পতিত” জ্ঞান জাগ্রিত হইলেই, পতিত পাবনের আসন টেলে—আসিয়া কোল দেন, উদ্ধার করেন। “আমি পতিত”—জ্ঞান আগাইবার যে প্রয়াস তুমাত্র সাধন। কলির জীবের অপর সাধন ভজন নাই। কেবল ভাব “আমি পাপী।” মধা-প্রভুর প্রবর্তিত ধর্মের ইহাই মূলমন্ত্র, মর্ম ও ভিত্তি এই দৈব সমাচারই রাধা-মাধবের উপদেশমালা গাথিবাব সংস্কৃত। ঐচ্ছিক চরিতামৃতসিদ্ধির পয়াত-ভক্তিচিন্তায় গর্তনিহিত মৃত্যুরাজীর সমুদ্রারই রাধামাধবের এ সকল ভণ্ডি। তিনি ভোড়ার জটিল বন্ধন খুলিয়া মোহর দেখাহতেছেন। আমরা পাথরের মনে করিয়া কাচের চশমা চক্ষে ধারণ করিয়াছি। কিন্তু রাধামাধব বধাধহ পাথরের চশমা চোখে দিয়াছেন। অরুণের চশমা বিনা ঐচ্ছিক চরিতামৃত পাঠি বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি বাস্তবিক অরুণাগঞ্জন দ্বারা নেত্রদ্বয়ের শুদ্ধল্য সাধন করিয়াছেন। তিনি নৃত্য কথ্য কিছুই শুনিম নাহ। তান কেবল খাটি নিঃস্বার্থে ব্যাখ্যা প্রচার করিতেছেন। তবে কিনা ভাষার ধ্বংসিভ আছে ও আত্মসজিক প্রসঙ্গের ধান আছে। আমার অফুটন্ত স্তম্ভ জ্ঞানক্ষেত্রের ফলিত ছবিতে আধরণ দিব না।

“নিগুণ, সত্ত্ব হইতে পারেন, কিন্তু সত্ত্ব, নিগুণ হইতে পারেন না; হুঙ্ক দধি হইতে পারে, কিন্তু দধি কড় হুঙ্ক পরিণত হয়না।” এই বুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়না। বিজ্ঞানোৎকর্ষফলে দধি পুর্ক্সাবহার আনীত হইতে পারিবে আশা আছে। সত্ত্ব দধি নিগুণ হুঙ্ক প্রাপ্ত হয় বটে, মতেং সাধন কি, জ্ঞান কি, আধ্যাত্মিকোন্নতিই বা কি? সাধন-গতি প্রতীপ। কেন ?—

“বাণিদং ব্রহ্ম।” ব্রহ্ম অগচ্ছদে পরিণত বা প্রতীত। এই বে জলহল,—উহা ব্রহ্মই। ব্রহ্ম নিগুণ, এবং উহাই জলহলাদিক্রমে প্রতীত। ধনু ব্রহ্মকেই জল বলিতেছি; অথচ জীবের আধ্যাত্মিক বিকাশ সহকারে ঐ জল পুনঃ ব্রহ্ম বলিয়াই অনুভূত হয়। অর্থাৎ সত্ত্ব নিগুণ হয়। এই অনুভূতির নাম ব্রহ্ম জ্ঞান। তবে সাধার্ম্যবের এই আলাচ্য উক্তির ভিত্তি এই মাত্র গৃহীত হইতে পারে যে, নিগুণের সত্ত্বগত সাক্ষ্যজনীন, সত্ত্বের নিগুণত্ব বৈশেষিক।

“পুণ্যখানের সেবাধিকার নাই।”—হঁহা সুবর্ণ সত্য। সেবার বজ্রব
মিশ্রার্থ। ‘সেবাজনের মুখতাপণ্যেই সেবা; হুতরাং পুণ্য-কর্ম-সমারমণ
সকাম ব্যক্তির উহাতে অধিকার নাই। পবিত্রতা-সাধক কর্মই পুণ্য। স্বকীয়
পবিত্রতালভ্যের প্রয়াস পর্যন্ত ও ব্যবসার গন্ধ বটে—উহা তাই ভগবৎ সেবা
বিশোধী। ‘এ কথার ভাবার্থ বুঝিতে বড় বড় অনেক পণ্ডিতের মাথা ঘুরিয়া
গিয়াছে।”—কেন ? এ বিশ্বাস গুরু ভক্তির এক উপাদান।

“পুণ্যবানের দল যোর নামাপরাধী, তাঁহাদের আশুক্ষৎস অনিবার্য।”
নামাপরাধী জন্ম যে ক্ষৎসমূখে দোহুল্যমান একাত্তর প্রতিবাদ লাই। কিন্তু
পুণ্যবান ব্যক্তির নামাপরাধ অনিবার্য বা পুণ্য ও নামাপরাধ যে একার্থব্যঙ্গক
তাহা কেমনে প্রতিপন্ন হয় ? পুণ্যের স্বভাব পবিত্র, কিন্তু নেশায় বশে গর্জিত।
নেশার বস্তু সেবন না করিলে পুণ্য পবিত্রই, তখন পুণ্য নিরপরাধ। এই
নিরপরাধবস্থার নাম সত্যসু—ফলাসঙ্গশ্রুতি। সন্ন্যাসীরাই হরিদাম প্রচার
করিয়াছেন।

“—উহা চন্দ্রনেত্র জ্ঞান হুশীল ও সৌরভময়। বতই বর্ষিত হয়, ভুতই
সৌরভ বাহির হয়।”

“আজুর কল যেকোন মধুময়, রসে ভরা, পাগল মানুষের এ বাণীও ঠিক
ভঙ্গম। আল নবোত্তম ঠাকুর মতামর বলিগাছেন—

“শাপদ্রব্যমহা দেহ, সকলি অনিত্য এই”

“শূণ্য যে মুখের হাস,

ତାଙ୍କ ନା ନାହିଁ ନାମ

পূণ্য যুক্তি দুই ভাগ করি।"—

“পুণ্য” শব্দে ঐহিক পারত্রিক সুখোৎপাদক কৰ্ম্মবিশেষ বুঝায়। নৈবদিক
সুখের ধর্ম-পুণ্য; এই জন্ত প্রেমিক ভক্তের পক্ষে উহার অনুষ্ঠান করা হয়ে

ধাক্কু তাগার নাম করা পর্যন্তও নিষেধ । প্রকৃত পুণ্যবানের শেষ প্রাপ্তি স্থান—ঐর্ধ্যধাম, মাদুর্ধ্যধাম নহে । বর্তমান কলিযুগে প্রকৃত পুণ্যবান কেহ থাকিতে পারেন না । পুণ্যবান্ বলা অহঙ্কার প্রকাশের নামান্তর । পুণ্যবান্—সকাম, অসুখকামী, প্রতুষ্টি মানীয় । চুরস বাশকের ছায় তাঁহারা চান, “কীর কই, মিঠাই কই, ধনং দেহি, পুত্রং দেতি” কিন্তু পতিত, পালপন্ন স্মরণ করিয়া পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শরণাগত ; ‘বা করেন প্রভু’ এই ভাবে অণু-প্রাণিত ।—এ চিত্রে আভিমোক্ষ । এই প্রতিচ্ছবিতে “পুণ্যবান্” ব্যক্ত । এই হৃদয়ের আলোচ্যের সোণাল ছটার স্তরে স্তরে আধার-লোচের হু একটরুণ আবৃত আছে । তদুদ্ঘাটন করা তেমন অসম্ভব নয় । অঙ্কন নৈপুণ্যের উপর দিয়া বর্ণ ফলাইতে কিকিং ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় ।—এচিত্রে পুণ্যবানের মুখে কালির ভাগ বেশী পড়িয়াছে ; রাধামাধব পুণ্যবানের মধ্যাঙ্গা রাখেন নাই, অথচ “প্রকৃত পুণ্যবান্কে” বর্ণসিংহাসন দিয়াছেন । লিখিয়াছেন, “বর্তমান কলিযুগে প্রকৃত পুণ্যবান্ কেহ থাকিতে পারেননা ।” লেখকের ভাব পূর্ণ যুগত্রে প্রকৃত পুণ্যবান্ মিলিত । কলিতে পুণ্যবান্ মিলে এবং সেই পুণ্যবান্ বড়ই অসম্ভব । রাধামাধবের মতে বোধ হয় কলির পুণ্যবান্ নিন্দাই । প্রকৃত পুণ্যবানের সংজ্ঞা এ গ্রন্থে পাষ্ট নাই । তিনি পুণ্যের মহিমা প্রকাশ্যাত্রে স্বীকার করিয়াছেন । আমাদের বিবেচনায় প্রেমিকের পক্ষে পুণ্যবান্ সক-যুগেই হীন, অপকৃষ্ট ।

পুণ্যবান্ ভাল কি পাপী ভাল, তদ্বিবরে লেখক স্পর্শ করেন নাই । এক দিকে যেমন পুণ্যবান্, অপর দিকে পাপীর উল্লেখ থাকিলে, বেশ কঠিন হইত । “পাপ” এর পরিবর্তে ‘পতিত’ একটা কথা পাই । “পাপ স্মরণ করিয়া পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শরণাগত, ‘বা করেন প্রভু’ এই ভাবে অণুপ্রাণিত হওয়া দ্বারা পতিত” এর কর্তব্য নির্ধারিত হইলেও, এহ কর্তব্য দ্বারাই “পতিত” এর সংজ্ঞা হৃদয় স্থাপিত হইয়াছে । “পতিত”ও “পাপী” এক নয় । পাপী অন্ধ, পতিত চক্ষুস্থান্ ; পাপী তমঃ প্রধান, পতিত সত্ব-প্রধান । পাপী—পাদান পতিত—কর্দম । বে লোটাইয়া পড়ে, সে পতিত । পাপী, অতর্কিত, পিছলিয়া পড়ে, পতিত সতর্ক, মধ্যাঙ্গার লোটাইয়া পড়ে । স্তবরাং সকল পাপী পতিত নয় । পাপী মস্তকের উপর পড়ে, পতিত পাড়লুও আঁহুর উপর পড়ে, পাপী

চেয়ে পুণ্যবান্ শ্রেষ্ঠ ইহা অপ্রতীক্য, অধিতর্ক। কিন্তু আবার পুণ্যবান্ চেয়ে পতিত শ্রেষ্ঠ ইহা এক অস্তিত্ব সত্য মধুর সত্য। অলার রাশির মধ্যে দুই এক ষণ্ড কাচও হয়। পাপীগণের মধ্যে দুই একজন পতিত কাড়ায়। কেবল অহঙ্কার দোষ চাণাইয়া পুণ্যবান্কে ধরু করিতে পারিনা। পুণ্যবান্ ও পাপী উভয়েই দুই রঙ্গের অহঙ্কার বরণ ভীষণ। পুণ্যের অহঙ্কার যেমন বলিয়াছে, হ্রিশ্চন্দ্রে; পাপের অহঙ্কার যেমন হিরণ্যকশিপু, শিঙাল প্রভৃতিতে। পুণ্য জ্ঞান গর্কে ঈশ্বর একবারে অদৃশ্য হন না, পাপ জ্ঞান গর্কে ঈশ্বরবিস্মৃতি; তার পর নাস্তিকতা। অহঙ্কার তুল্য পাপ নাই। এমন কি অহঙ্কারই সর্বপাপ বীজ। পুণ্যবানের যে অহঙ্কার, তাহা পাপের সূচনামাত্র। পাপীতে উহা বেশী দূর গড়ায়। জুগাই মাধাই, মহাপাপী, নিতাইচাঁদের কৃপায় পতিত পদ্য হইলেন, তার পর উদ্বার। নিতাই আগে পাপী ধরিয়া পতিত বানান তৎপর গৌরান্ উদ্ধার করেন। “আমি পাপী” ইহা জানি না না জানি, “আমি পাপী” এই জ্ঞান চিন্তে আগ্রহিত হইলে, এই জ্ঞানের গুরুভারে পাপী বড়ই নোয়াইয়া পড়ে; তখন এই অবনমিত দীন কান্দাল জীবের আত্মনামটি “পতিত।” এই অমৃত জীবাপন জীব নিরহঙ্কার বলিয়া নিম্পাপ। বিষ কোন বিশিষ্টাবস্থায় যেমন অমৃত হয়, পাপীও তেমন পতিত হয়। পুণ্যবান পাপী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, অহঙ্কৃত দৃষ্টতা নিবন্ধন পতিত চেয়ে অতিহীন। নিম্নভূমিতে জলেয় পতিবৎ, পতিতে ঈশ্বর আশ্রয় করেন। তাই রসিক লিখিয়াছেন—

“আমি পাপী” স্মরণ হইলে, অমৃতাপ আসে, তখন প্রাণ জুড়াইবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা অন্তর্ধামী ক্রীডগবান্ জানিতে পারিয়া কোল ধেন; তাই “ভগবান্ গৌরহরি পতিত পাবন।”—কি আশা ভরসার কথা! কহিতে শুনিতে পড়িতে প্রাণ শীতল হয়। জীবের সাধন তজন আর কি? একমাত্র “আমি পাপী” ভাবনা দূত করা। পাগলমাতৃবের মতে পিণ্ডি লেনাদেনার সহিত প্রেম-ময় ধর্মের সম্বন্ধ নাই।—ইহা সর্ববাদি সম্মত।

“সেবার অধিকারী” নয় পুণ্যবান্ সত্য, কিন্তু “তমু জনতপ পুণ্যবানের কাণ্ড্য” একথা পোষণ করিতে আমাদের আপত্তি আছে। জনতপকারী ঐশ্বর্যকাজ্ঞা শূন্যও হইতে পারেন। “নাহি চান তাঁরা ব্রজের মাধুর্য” আমরা এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা, কারণ হয়তো চান। কতকগুলি কর্তৃ ভক্তির

আমাদের, সুতরাং সে সব পুণ্য কর্ম বলিয়া উপেক্ষিত হইবে কি?—“নিম্ন
পাপস্বরূপে হইয়ে পতিত” “পতিত” এর খাটি সংজ্ঞা এইটি মনিক বাহিনী
“বর্ণাশ্রমে নাই প্রেমের গুণমগ্ন,” এখানে কে না মুক্ত হইবে?

পাপল মানুষের “স্বষ্টে মানুষ মাত্রেই পাপী” উক্তিতে বিসংবাদিতা
ধাকিতে পারেনা। এই মহাক্ষার দৃষ্টী ছাড়া কথাগুলি অমূল্যরত্ন পাখা
সন্দেহ নাই। ইনি বলিতেছেন ‘সত্যযুগ হইতে অসংখ্য যুগে মহাপাপ করিয়াছ,
সেই পাপ স্মরণ করিয়া—’ এখানে আমাদের সন্দেহ স্তব্ধতর। সুতরাং তর্ক
করা দৃষ্টতা হইবে মনে করিনা। প্রথমতঃ আমরা কীণ জীব, কেমনে আমরা
একবারে সত্যযুগ হইতেই, হুচারি জন্মে নয়, অসংখ্য জন্মে, আবার পাপ নয়
মহাপাপ করিয়াছি। এ উক্তি দর্শন সমর্থিত হইতে পারে কিনা? এতদ্বারা
বিশ্বাস জন্মে মহাপাপ অষ্ট পুরুষের অর্পিত কোনও সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ, সেই
মহাপাপ সকল স্মরণ করিবার উপায়ও সুবিধ কি আছে? তবে প্রত্যেকভাবে
না হইলেও মানিয়া নিলেই হয় “কলির জীব সকলেই পাপী।” পঞ্চাঙ্করে
কেহই পুণ্যবান নহে” একথা কেমনে বিশ্বাস করি? পুণ্য আছে পাপ নাই,
বা পাপ আছে পুণ্য নাই—এ দুইয়ের কোনটি সত্য নয়। প্রত্যেক মানুষের
যেমন দুই হাত, তেমন পাপও পুণ্য উভয়কে পাপ মনে করিয়া দৈত্যপ্রিয়
করাই কল্যাণ পথ।

ক্রমশঃ ।

সুখ্যাতি ।

(লেখক—জীযুক্ত -হরেশ কট্টাচার্য।)

—১০৫—

বিশ্ব-ব্যাপিরা র'য়েছ তুমি

ভবু তোমার আছে বিপদ।

কায় মলেপ্রাণে সার্থিছে সকলে

(জার্মিনা) কখন কোথায় কর নখা হ

প্রাণের কথা ।

বেদান্তসার বলিয়াছেন ;—“উপাসনানি সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক মামল ব্যাপার রূপানি ।” অর্থাৎ, সগুণ ব্রহ্মের প্রতি মমের ক্রিয়া-বিশেষের নাম উপাসনা । কেবল বেদান্তসার কেন, সকল শাস্ত্রই নানাভাবে কৌতুকে উপদেশ দিতেছেন যে, সর্লক্ষ্যধার পরমপুরুষ শ্রীভগবানের উপাসনা-বলেই জীব জীবন সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, জয়া-জয়-মৃত্যু-শোকতাণের অতীত যে পূর্ণানন্দময় অবস্থা তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে । এক্ষণে সহজে এই উপাসনার বিষয় একটু আলোচনা করা যাউক ।

* * *

এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, “যে অবস্থা লাভ করিলে জীবের কোন রূপ অভাব, কোন রূপ চিন্তা থাকে না, সেই অবস্থা লাভের জন্য যে আচরণ তাহাই উপাসনা ।” উপাসনা শব্দের ব্যুৎপত্তি—অতি সন্নিধানে থাকা । উপ এই উপসর্গের অর্থ সন্নিধি, আর আস ব্যতির অর্থ থাকা সুতরাং ঈশ্বরোপাসনা বলিলে তাঁহার সন্নিধানে থাকা বুঝিতে হইবে ।

* * *

উপ + আস + অনু + আ = উপাসনা । অর্থাৎ যে অবস্থা লাভ করিলে জীব পরম প্রেমময় শ্রীভগবানের প্রেম-সিদ্ধির গভীর তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, যে অবস্থার বলে জীব ভূমানন্দের অধিকারী হয় তাহার সাধনোপযোগী যে কৌশল তাহার নামই উপাসনা । হৃদয়োগ্য ক্রতির জাব্যাকার উপাসনার একটা অতি সুন্দর লক্ষণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন ;—“উপাসনং তু বধ্যশাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চিদাবলম্বনমুপলব্ধ্য তন্মিন সমান চিন্তাবৃত্তি সন্তান লক্ষণম্ ।” অর্থাৎ, বধ্যশাস্ত্র কোনও পথ অবলম্বন পূর্বক শ্রীভগবানে চিন্তাবৃত্তি ত্যাগ করাকেই উপাসনা বলে ।

* * *

একধে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, এরূপভাবে নিজের সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক সত্যের দুরাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, জীবের সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি অনন্ত। অর্থাৎ, আমরা বহু সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং পরেও করিব। ঐঔপন্যাসিক জীবোপদেশগুলি নিজ প্রিয় সখা অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

“বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

তান্যহং বেদ সর্কাণি নতং বেখ পরন্তপ ॥”

অর্থাৎ, হে অর্জুন। আমার এবং তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সে সময়টাই অবগত আছি। কিন্তু হে পরন্তপ! তোমার জ্ঞানশক্তি আরও থাকার তুমি তাহার কিছুই জানিতে পারিতেছ না।

* * *

জীব, কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ অর্থাৎ “আমিই কর্ত্ত্বের কর্ত্তা, আমিই সকল করিতেছি” এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম-দ্বারা জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু আপন স্বরূপ গোচরিত্ত হইতেছে না, আমি যে কে, এবং কাহার শক্তি আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়া জন্ময়ে বল-বুদ্ধি সকার করিতেছে তাহা বুঝিতে পারে না। যতদিন এই কর্ত্তৃত্বাভিমান হৃদয়ে বলবতী থাকে ততদিনই জীব সাংসারিক নানাবিধে বিস্তার হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এবং “আমিই স্থখী আমিই দুঃখী এই প্রকার অমৃত্যব করে।

* * *

কষ্ট বোধ হইলে যেমন কষ্ট শূন্য অবস্থা মনে পড়ে এবং অককার দেখিলেই যেমন আলোকের অস্তিত্ব আপনা হইতে মনে আগে সেইরূপ এই স্থখ দুঃখ জন্ম বৃদ্ধির অতীত যে জীবের নিত্য প্রীতিময় অবস্থা ও নিত্যানন্দময় ধাম আছে তাহা এই জাগতিক কণস্থায়ী স্থখ দুঃখাদি দ্বারাই বেশ অনুভূত হয়। যে পরমধামের শান্ত দাম্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রূপের দ্বারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হইয়া তাহারই প্রতিচ্ছায়া দ্বারা এই জগৎকে প্রতিবিম্বিত করিয়া এত মধুময় করিয়া তুলিতেছে সেই জ্ঞান ধরিত্র্যই কার্যকে পাণ্ডর।

বাইবে এই যে ছায়া ঘরিয়া কারাকে লাভ করিবার উপায় বা পন্থা ইহাকেই উপাসনা নামে অভিহিত করা যায় ।

* * *

এই উপদেশ প্রকার তেদে অনেক রকম দেখা যায় । যে কোন প্রকারেই হউক সেই পরম-পুরুষ শ্রীভগবানের সহিত একটী সখ্যক স্থাপন করিয়া লইয়া আপনাপন গুরুদেবের উপদেশামুসারে কার্য্য করা সকলেরই কর্তব্য । কারণ এমন দেবগন-বাহ্নিত মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া কেবল শৃগাল কুকুরের মত ভোগবিলাসে মত্ত থাকিয়া আত্মবাণী হওয়া কোন মতেই উচিত নয় । শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ;—

“লক্ষ্য কথঙ্কিরনুজম্য দুর্লভং

তত্রাপি পুংস্তং ক্ষতিপায়দর্শনম্ ।

যত্নান্ন মুক্তৌনবভেদে যুতধীঃ

সংযাত্ত্বহা স্বং বিনিহন্ত্য সঙ্গ্রহাৎ ॥”

শ্রীমদ্রোণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

অনুযোগ ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কাব্যবিনোদ ।)

—:~:—

ওগো ভ্রমালবনের আলো ।

ওগো, গোষ্ঠের রাখালরাজা ত্রজের সরসমণি কালো !

অসময়ে থেকে থেকে

বাশীর তানে ডুক ডেকে

উদাস প্রাণে কেন গো আশ্র প্রেমের আশ্রম আলো ?

ঘরেতে আর রইতে নারি,

জল করে বাই আনুতে বারি

সেবার, নদীর-কূলে কদম-তলে জোয়ার দেখে বাদি ভালো ?

ওগো নিষ্ঠুর পাষণ্ড হরি ।
 সেইকো অসাধ আস্তে হেথা, কলকে যে বড় ভরি ।
 বুঝেও তুমি বুঝনা যে,—
 যখন থাকি গৃহকালে
 তুলেও তুমি তখন যেন ডেকোনা হে বংশীধারী ।
 ডাকলে পরে আগন-হারী
 ছুটবো পথে পাগল-পারী
 সধাই কবে, কলকিনি হ'লো বুঝি কুলনারী ।

বিভু ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত নিবঞ্জন গোস্বামী ।)

হেরি আলোকে হেরি আঁধারে
 হেরি সাগরে হেরি ভূধরে
 হেরি মগরে হেরি কাননে
 হেরি পুলকে হেরি যোদনে
 হেরি, ঈশ্র-ধনুর বরণে,
 হেরি প্রথর-রবি কিরণে,
 হেরি, দামিনী-দীপ্ত, তারকা-সুপ্ত,
 আমার নৈশ গগনে ।
 রহ, অলেতে তুমি গলিয়া,
 থাক, বিমানে সদা মিশিয়া,
 তুমি, তুল ভুবনে, স্মৃত্ত কারণে
 আমিহ সদা ভ্রমিয়া ॥

হেরি নিকটে হেরি হৃদয়ে
 হেরি ভিতরে হেরি বাহিরে
 হেরি গোপলে হেরি গোচরে
 হেরি অমিয়ে হেরি গমলে
 হেরি বিশ্ব মাপিছ হাসিয়া,
 সদা, অমেয় রূপেতে সাজিয়া,
 তুমি, চন্দ্রমাতারা, মুক্তার পারা,
 আকাশে রহ শোভিয়া।
 তুমি, আমার মাকে বলিয়া,
 তবে, কেন হে মরি ভ্রমিয়া,
 মোরে, প্রজ্ঞা কর, কলুষ হয়,
 মোহ আধার নাশিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।*

(প্রথম প্রস্তাব)

(লেখক—শ্রীযুক্ত দিগন্ত নারায়ণ ভট্টাচার্য্য।)

—:o:—

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—স্বপ্নের যুগের অসংখ্য সৈন্য সামন্তের ভায়ে আক্রান্ত হইয়া পৃথিবী দেবী মনে মনে লোক-পিভামহ পদ্মবোমী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া ছিলেন। তিনি অশ্রুধর্মী পাণ্ডুরূপ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে ক্রান্তে তাঁহার নিকটে উপনীত হইয়া স্বীয় দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন।

* পতীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই প্রবন্ধের মাকে মাকে বন্ধ-বিক্রম বক্তা ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক বি, এ, ভাগবতরস মহোদয়ের শ্রমত বক্তৃতা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

গো, ব্রাহ্মণ, এবং বাপ-বজ্র-ঘোষী, তক্ত-নিন্দুক, পরজীকাতর পাগাচার পরায়ণ
কংশ ও তাঁহার অমুগত কেশী, প্রলম্ব, প্রকৃতি মানব বেশধারী দুর্দান্ত দৈত্য-
গণের অত্যাচার সহ্য করিতে তিনি একেবারেই অসক্ত হইয়া উঠিয়াছেন ।
ভগবান চতুর্ভূজ ব্রহ্মা, ধরণীর এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ত্রিলোচন শিব,
ও অজ্ঞাত দেবগণ ধরার সহিত কীরোদ সমুদ্রের তীরে গমন করিলেন । ব্রহ্মা
মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন সৃষ্টি করা আমার কার্য—কিন্তু সৃষ্টি রক্ষা ও পালন করা
ভগবান বিষ্ণুর কার্য সুতরাং তাঁহার নিকটে এসকল কথা জ্ঞাপন করা কর্তব্য ।
সেই সময়ে সেখানে তিনি সমাগত হইয়া ভক্তি পূর্বক বেদমন্ত্রে দেবাদিদেব
সর্বহুঃধ-বিনষ্টকারী সর্বভুতদ মঙ্গলময় ভগবান বিষ্ণুর স্তব, স্তুতি ও আরাধনা
করিতে লাগিলেন । কণকাল পরেই ভগবান বিষ্ণুর আদেশ আকাশবাণী স্বরূপ
শ্রবণ করিয়া দেবদুন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“হে স্বর্গধাম নিবাসী
অমরগণ ! যদি অমরত্বলাভের অভিলাষ থাকে তবে পরমপুরুষ ঐ ভগবানের
যে কথা শুনিতে পাইলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে সেইরূপ অনুষ্ঠান
কর । ভগবান্ বৈভূতনাথ অজ্ঞান্যামো,—তাঁহাকে কি আবার বলিয়া জ্ঞানদ্বৈতে
হয় ? তিনি আমাদের নিবেদনের পূর্বেই দৈত্য পৌড়িতা ধরণীদেবীর সমুদয়
সভাপ ও হুঃধ ক্রেশের কথা জানিতে পারিয়াছেন । তিনি আপনার বাক্য
রক্ষা করিবার নিমিত্ত মর্ত্যলোকে একট ব প্রকাশ হইয়া আপনার কাল-শক্তি
দ্বারা যতদিন পর্যন্ত ভূভার হরণ কার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন ততদিন তোমরা
নিজ নিজ অশেষ অংশের সহিত তৎসহচর বহু ও পাণ্ডবগণের পুত্র
পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিবে । পুরুষোত্তম
ভগবান ঐহরি স্বয়ংই বিভক্ত সব স্বরূপ জ্ঞানবান্ বহুদেব গৃহে আবিভূত
হইবেন । সুতরাং দেবগণীগণ সেবা পরিচর্যাদি দ্বারা তাঁহার তুষ্টি সম্পাদনের
নিমিত্ত এবং তদীয় জ্ঞানিনী শক্তিরূপিনী ঐরাধা ও কুস্মিনী সত্যভামা
প্রভৃতির দাসীত্ব করিতে জন্ম গ্রহণ করুন । এমন কি বিব-সম্বোধিনী ভগবতী
কিন্ধু মায়াজ লাক্ষ্যভাবে ঐক্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছেন ।

এখানে আমরা নরবপু ও মানবতার সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি । দেবতা-
গণ ও দেবগণীগণকে পর্যন্ত চরম ভোগ-ভূমি সুখময় ধাম স্বর্গ পরিভ্রমণ
পূর্বক মর্ত্য ভূমে নরবপু ধারণ করিয়া বাসু্য হইয়া আদিতে হইতেছে ।

হাঁহাঝাঝা দেব-অন্ন অপেক্ষা মানব-অন্নের বিলকণ প্রাধান্য, পৌরস ও সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইতেছে ।

যখন লীলা করণের সমুদয় বন্দোবস্ত, সমস্ত আয়োজন ঠিকঠাক হইয়া গেল তখন ঐক্য আসিলেন ।

অনাদি অনন্তকাল হইতে, সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে, উদ্ভাস্ত অস্থান্ত্র স্তব্ধ লংঘ্যে পবিত্র সামবেদ যাহার আগমনী সঙ্গীত গাইয়া আলিতেছেন সংঘম-কঠোর ষাষ্টিকের হোমানল-প্রজ্জ্বলিত বজ্রের পবিত্র মৃদুপুঞ্জ যাহার চরণ কমল অবেষণ করিয়া কত যুগ যুগান্তর, কতকাল মহত্তর, নীল নভোহলে ছুটিয়া বেড়াইতেছে,—প্রাণারাম প্রত্যাহার, ধ্যান বাহুর অবর্ণনীয় ক্রেশ সহ করিয়া যোগিগণ যাহার জন্ত নিবীড় অরণ্য ও তিত্তকষায় ফল পত্র সার করিয়াছেন ; সমুদয় বাসনা কামনায়, সমস্ত আশা তরসায়, জলাঞ্জলি দিয়া পশ্চিমাংকেরা—হুরারোহ পাছাড় পর্বতে—হুগম তীর্থে তীর্থে যাহার চরণের পূর্ণ স্পর্শ করিয়া মানব জীবন সার্থক করিবার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, হাঁহাকে পাইবার জন্ত সংসার বিরাগী তাপসগণ সংসার ত্রী পুত্র পরিজন পরিত্যাগ পূর্বক বৈরাগ্যের তুলি স্বপ্নে লইয়া অনশন অর্দ্ধাশনে দেহমাত্র রক্ষা করিয়া দেশে দেশে নগরে নগরে অক্ষতয়া সরনে দিবা রজনী অতিবাহিত করিতেছেন ; দৈত্যকুল চূড়ামণি প্রহ্লাদের প্রাণের সখা, তুলীতি-অকল-নিধি ধ্রুবের হৃদয়-নিধি—পদ্মপলাসলোচন,—বিপন্ন গজেন্দ্রের উদ্ধার কারী, মানবজীবনের পরমার্থ ধন আজ উপস্থিত ! কত যোগী যতি, কত জ্ঞানী বৃদ্ধ, কত সিদ্ধ চারণ যাহার পাদপদ্ম লাভের আশায় উজ্জ্বল দৃষ্টে জল জল মেত্রে ডাকাইয়া কত বন্ধনাগীতি কত নিবেদন প্রার্থনা করিতেছেন,—যাহার কোটি চন্দ্র বিনিমিত চন্দ্রানন নিরীকণ করিবার আশায় কত দেবর্ষি মহর্ষি কত ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি—জীবনের সমুদয় ভোগ-লালসা পরিহার পূর্বক পত্তীয় ধ্যানে—তাব সঙ্গীতে নিমগ্ন আছেন—সেই তিনি আজ জীবের সৌভাগ্য আকাশে সমুদিত ! চন্দ্র হৃদয় গ্রহ লক্ষ্যে যাহার আদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া প্রতি দিবা রজনী মাস বর্ষ রৌদ্র সৃষ্টি যেখ প্রভৃতি সম্পন্ন করিতেছে, পবনদেব যাহার অগভীর বিবাল ও অভুলনীর মহিয়ার কথা বহু বহু করে সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যব রাজি দিল সমস্তাবে অক্লান্ত বদনে থাইয়া বেড়াইতেছেন,

রত্নাকর যে রত্নঘরকে বন্ধে লাভ করিয়া উভাল ভরদে বাহ বিচার পূর্বক
আনন্দে নৃত্য করিতেছে, আনন্দের গভীরতায় ও মত্ততার আপনা আপনি উচ্চ
কণ্ঠে কল্লোল-সীতি গাইয়া আশ্ব প্রসাদ লাভ করিতেছে তিনি আজ কংশের
রাজধানী মধুরা নগরে উপস্থিত !

আজ মানবের সৌভাগ্যের সীমা নাই, অন্ত নাই । তববান্ আসিলেন,
কিন্তু কোথায়—কখন তিনি আসিলেন ? যেখানে ঐশ্বর্য মদমত্ত ধনশালী
রাজন্ত বর্গ, প্রজাবর্গের বৃকের রক্ত সদৃশ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়
করিয়া হুশোভিত—স্বর্ণ-মণ্ডিত মেঘস্পর্শী উন্নত শির মন্দিরে—আপনাদেরই
ছায় সেবা পূজার, রাজভোগের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন,—বেতন ভোগী
পুজারী ব্রাহ্মণ নানাবিধ বসন ভূষণে সাজ সজ্জার মাল্য চন্দনে ঐবিগ্রহের
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিত্য নতুন সাজে সাজাইয়া শত সহস্র দর্শকের প্রশংসা ও বাহবা
অর্জন করিতেছেন কিম্বা প্রতি প্রভাত সন্ধ্যায় উদাত্ত গভীর সামমন্ত্র কঙ্করে
মুখরিত শত শত তপোনিষ্ঠ ঋষির আশ্রমারণ্যে, অথবা যেখানে কর্ণকণ্ড
নিরত যাজ্ঞিকের বজ্রীয় ধূম পুঞ্জ কুণ্ডলায়িত ভাবে উঠিয়া উঠিয়া আশ্রম বৃক্ষ
পত্রকে ক্রম্বাষিত ও কজ্জল মণ্ডিত করিতেছে, কত বেদপাঠ, কত যজ্ঞোচ্চারণ,
কত শুদ্ধান্ত্তির বিচার, কত আয়োজন, কত পূজার সস্তার, কত শঙ্খ ঘণ্টায়
আবাহন—সেখানে তিনি আসিলেন না । আসিলেন কংশকারাগারে ।

বর্ষাকাল, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমারমণী রজনী, আকাশ ঘন-ঘোর-কৃষ্ণ মেঘা-
বলীতে আচ্ছন্ন, মূলধারে বুটি পড়িতেছে,—গুড় গুড় শব্দে মারো মারো মেঘ
গর্জনে হইতেছে—বিদ্যুৎ চমকিতেছে—যোগমায়া ভগবতী বিধ চরাচরকে
আপনার যোগ-নিদ্রায় মূঢ়ৈতন্ত করিয়াছেন । রাজপথে, রাজবাড়ীর দ্বারে
দ্বারে অন্ত্রে সন্ত্রে সাজ সজ্জায় হুসজ্জিত নগর রক্ষক—প্রহরীর দল গভীর
নিদ্রায় অচেতন । দেব মন্দিরের মঙ্গল প্রদীপ নির্বাপিত ! দেবল ব্রাহ্মণ-
গণ সন্ধ্যা আরতি সমাপন করিয়া,—নৈবেদ্য ও ভোগের সামগ্রিকুলি বেত্রে
পুটলীতে বাঁধিয়া লইয়া দেবালয়ের দীপাবলী নিভাইয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করতঃ
আপন গৃহে প্রস্থান করিয়াছেন । নগরী নীরব—নিষ্পন্দ ! পত্র পতনের—
শৃগাল কুকুরের শব্দ পর্য্যন্ত যথন নাই । এমন সময় শতকোটি চক্ষের সিক্ত শীতল
জ্যোতি পরাঙ্ক করিয়া কৃষ্ণচক্ষ কংশের কারাগারের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত !

যেখানে অপরাধীগণ, দয়া, তত্ত্ব, দোষী, পাপীগণ দাক্ষ কায় ক্রেশ ও নির্যাতনে বেদনা-বিদ্ধ হইয়া নিরন্তর নয়নজলে নির্জল কারাকক্ষ ভাসাইয়া দেয়, যেখানে আমরা ঘৃণার সহিত অপরাধীগণকে আবদ্ধ করিয়া নানা প্রকার কঠোর শাস্তিতে অর্জ্জ্বরিত করি, সেই পতিত পাপী অনাধ নিরাশ্রয় অপরাধীগণের কারাগৃহে পতিত-পাবন, পাপীর-শরণ, অনাধ-নাধ, বিধ্বস্ত হরি আসিয়া উপস্থিত। কারাগার হইলে কি হইবে, তক্ত বহুদেব দেবকীর যাতনা যে তাঁহার পক্ষে অসহ্য। বহুদেব দেবকীর অন্তরের ডাক যে সেই অন্তর্যামী হরির নিকট পহঁছিয়াছে, তিনি কি আর হির থাকিতে পারেন ? তক্ত-বংশল কি তক্তের বেদনা স্বচক্ষে দেখিতে পারেন ? তক্ত অনন্য-শরণ হইয়া কাতরে অশ্রুপ্রাণিত মেত্রে ডাকিলে যে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। আমরা মনে করি দেবালয়ে, মেঘম্পর্শা উচ্চশির মন্দিরে, তীর্থ ক্ষেত্রে—বৈকুণ্ঠেই শুধু তাঁহার বাস করিবার স্থান। এ কথা যে সত্য নয়,—তক্তের জন্য যে তিনি যে কোমল স্থানে গমন করিতে প্রস্তুত, তক্তের মান রক্ষার জন্য তিনি যে ক্ষটিক অন্তরে মধ্যে পর্যন্ত আবির্ভূত হইয়া থাকেন—পতিত-পাবন—পাপী-তারণ যে পতিত পাপীকে উদ্ধার করিয়া জ্বোড়ে লইবার জন্য ছল ছল মেত্রে তাহাদের পাপ-ফক্ষে ও শিশাচ-লীলা-নিকেতনে মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হন—তাঁহাই প্রমাণিত করিবার জন্য হরি আজ কংশ-কারাগারে অপরাধী বন্দীগণের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত। পাপীর চক্ষু নাই, তাই সে ভুবন মোহন শ্রামশূন্যকে দর্শন করিয়া জীবন মার্থক করিতে পারে না, কর্ণ নাই তাই তাঁহার অমির-করিত স্নেহ পূর্ণ বাণী শ্রবণ করিতে পারে না। তারা না দেখুক—না শুনুক, তিনি নিশ্চয়ই আসেন। পাপী ভুলুক তিনি ভুলিতে পারেন না। জীব সে সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই তার এত হৃদশা, এত হৃৎধ, এত ক্রেশ ! মায়ার এমন প্রাণান্তকারি বস্তু ন!

কৃক-নিত্যদাম জীব তাহা ভুলি গেল।

সেই দোষে মায়ার তার গলায় বাঁধিল ॥

* * *

নিত্য-বদ্ধ, কৃক হৈতে নিত্য-বিশুদ্ধ ।

নিত্য-সংসারী ভুক্ত মরুকাপি হৃৎধ ।

সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ডকরে তারে ।

আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় জারি তারে মারে ॥

(ঐচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ২২শ পরিচ্ছেদ ।)

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস ।

কৃষ্ণের তটস্থাপক্তি ভেদাত্মক প্রকাশ ॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অমাদি বহিমুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসার হুঃখ ॥

(ঐচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ ।)

প্রভু যে শুধু মন্দিরেই যান না, কারাগারেও যান, প্রভু যে শুধু মন্দিরেই বশ নম, ব্যাকুল আহ্বানেরও বশ, প্রভু যে শুধু সাধু পুণ্যবান ও ভক্তের পবিত্র গৃহেই আগমন করেন না পানী তাপীর নিকটে কারাগারেও যে তিনি কাইয়া থাকেন, তাঁহার যে সর্বত্রই গমনাগমন আছে ও হইতে পারে তাহাই ভালরূপে মন্ত্রস্ত্রাভিহিত বচন-বাণীশ অভিমানী বিপ্রগণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রভু আজ কারাকক্ষে উপস্থিত ! আর বাহুদেব দেবকী ? “প্রথম অমে স্বারজুৰ মনস্তরে দেবকীর নাম ছিল পৃথ্বী, আর এই নিম্পাপ বহুদেব স্তূতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন । ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে প্রজা-ভুক্তির নিমিত্ত আদেশ করিলে তাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ।

বর্ষাবাতাতপহিমবর্ষকালগণনাম্ ।

সহমানো ঋসরোধবিনিধুতমনোমর্দো ॥

শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশাত্তেন চেতমা ।

মন্তঃ কামানভীপন্তৌ মমারামনমীহথুঃ ॥

এবং বাৎ তপ্যতোর্ভদ্রে তপঃ পরমহৃৎকরম্ ।

দিব্যবর্ষসহস্রাণি স্বাদশৈবুর্দ্যুদ্বানোঃ ॥

(ঐমত্তাগবত, ১০ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ৩৪—৩৭ শ্লোক ।)

বর্ষা, বাত, যৌত্র, শিশির, গ্রীষ্ম প্রভৃতি কাল-গুণ সকল তাঁহাদিগের উপর বহিয়া বাইতে লাগিল । প্রাণায়াম দ্বারা তাঁহাদের মনোবল দৃবীভূত হইয়াছিল, বৃক্ষের গলিত পত্র ও বাহু মাত্র আহার করিয়া তপস্বানকে পুত্র-প্রাপ্তি কামনার কঠোর আরাধনা করিয়াছিলেন । তপস্বানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া হৃৎকণ্ঠের

তপস্যা করিতে করিতে দেব পরিমাণে ঝাঁপশ সহস্র বৎসর গত হইয়াছিল, এবং তাহাশ্রই কলে তাঁহারি ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

জলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত-লাগি ধার।

ভক্তের কিস্তর হয় আপন ইচ্ছার।

সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কংশ-কায়াগারে উপনীত হওয়া আর আশ্চর্যের বিষয় কি? শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়াছেন—

ভক্ত-রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার।

নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন বিহার।

অকর্তব্য করে প্রভু সেবক রাধিতে।

তার সাক্ষি বালী বধ শূর্য্যোব নিমিত্তে। (৩য় অধ্যায়, অন্ত্যগীতা)

আবার শ্রীভগবান শ্রীমুখেও বলিয়াছেন :—

ভক্ত-বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।

ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র তাই।

বদ্যপি স্বত্ত্ব আমি স্বত্ত্ব বিহার।

তথাপিহ ভক্ত-বশ স্বভাব আমার।

(১ম অধ্যায়, অন্ত্যখণ্ড চৈতন্য-ভাগবত)

শ্রীমদ্ভাগবতেও ভক্ত-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভক্ত-চুড়ামণি অবরিত্ব রাজার প্রসঙ্গে শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন :—

অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়ন্ত ইব দ্বিজ।

সামুদ্ভিগ্রস্ত-হৃদয়ে ভক্তৈর্ভক্ত-জনপ্রিয়ঃ।

নাহমাত্মানমাশাসে মন্তকৈঃ সামুত্তির্বিনা।

প্রিয়কাত্যস্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা।

সাধবো হৃদয়ং মহৎ সামুনাং হৃদয়ন্তহম্।

মদন্যন্তে স জানন্তি নাহং ভেত্যো মমাপি।

—আমার নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, আমি ভক্তাধীন, সামুগ্ধের সামুগ্ধ। আমার হৃদয় অভিভূত ও পরাজিত—ভক্তিতে ভক্তগণের আমি অভিধর প্রিয়। মন্তক সামুগ্ধ ব্যতীত আমি আমার আত্ম-বশ নহি; সামুগ্ধই আমার হৃদয়, আর সামুগ্ধের হৃদয়ই আমি—তাঁহারাও আমা ভিন্ন অন্য জানে না, আমিও

তাহাদের ভিন্ন আনি না, তাহাদের আমিহঁ গতি আমারও তাহারাই গতি। তাই ভগবান্ আজ যুগিত অঙ্ককারাক্তর কারাগৃহে ভক্ত-রক্ষার নিমিত্ত আবির্ভূত। সাধুদিগের পরিব্রাণ এবং সাধু-ভক্তগণ-বিদেষ্টা পাপাত্মগণের বিলোপ-উদ্ধার-সাধন উদ্দেশ্যে ভগবান্ এই রূপেই যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মৎস্যাদি অসত্যগণেরও এই কারণই আবির্ভাব হইয়াছিল।

ভগবান্ ঐক্যরূপে আসিলেন। মানুষ তাঁহাকে কত সুরে, কত ছন্দে, কত আকুলি বিকুলি করিয়া ডাকিয়াছে, তাঁহার জন্য কত সুন্দর সুন্দর, কত গগন-স্পর্শা দেবমন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে, তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া কত কাড় লঠন, কত রত্ন দীপ কত আলোক রোয়াই জ্বালাইয়াছে তিনি তথায় তখন আসিলেন না, তিনি আসিলেন প্রাবৃটের ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর তমিস্রা ভরা রজনীতে সকলে যখন নিদ্রামগ্ন। সুখ শয্যায় শাষিত। কেহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার অবসর পাইল না, সেই চিরপ্রায়ত্তমের রক্তোৎপল চরণ যুগল নয়নের জলে ধৌত করিয়া দিয়া কেশজালে মুছাইয়া দিবার সময় পাইল না। তিনি অঙ্ককার কারাগারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের কাল সর্বগুণ সম্পন্ন পরম রমণীর শোভা ধারণ করিল, রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও অন্যান্য গ্রহতারকা শান্ত ভাব ধারণ করিল। দিক্ সকল প্রসন্ন ও গগন মণ্ডলে নিখিল নক্ষত্রগণ প্রকাশ হইতে লাগিল। পৃথিবীস্থ পুর, গ্রাম, গোষ্ঠ এবং আকর সকল বহুল মঙ্গলময় হইতে থাকিল। নদী সকলের জল প্রসন্ন হইল, হ্রদ সকল কমল-মালার শোভাশালী ও বনরাজী সমূহ পক্ষি ভ্রমরাগির কলরবে পরিপূর্ণ, পুষ্প-কুসুম শোভিত হইয়া উঠিল। পবন সুবাস্পর্শ হইয়া পুণ্য গন্ধ দলদিক আমোদিত করিয়া বহিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে চন্দ্রভি ধ্বনিও হইল, গন্ধর্ব্বগণ সুস্বরে গান, সিদ্ধচারণ নিকর স্তব এবং অঙ্গরাগণের সহিত বিজ্ঞাপনগণ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল, দেব ও ঋষিমণ্ডলী চর্চাষিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, মনের আত্যন্তিকি আনন্দে জগদ্র সমূহ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল—এমন সময় পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয়ের জ্ঞান ভগবান ঐক্যচন্দ্র কংসকুরাগৃহে সমুদিত হইলেন। কিবা তাঁহার অপূর্ব্ব ভুবন-মনোমোহন রূপ;—

ভমভুতং বালকমবুজেকণং চতুর্ভুজং শশংগদাহাদ্যুধম্ ।

ঐবংসলস্রং গলশোভিকৌজতং পীতাস্বরং সাজ্জগদ্বাদনাতগম্ ॥

মহাশিবদেবীকিরীটকুণ্ডলবিধা পরিষক্ত মহাস্কন্ধলম্ ।

উদামকাক্যদগদগদাভিভিরোচমানং বহুদেব ঐকত ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, দশমস্কন্ধ, ৩য় অধ্যায় ৯।১০ শ্লোক)

পদ্মলাস তুল্য লুপ্তর লোচনদ্বয়, লক্ষ্যক্রেণ বদাপন্ন প্রভৃতি আয়ুধ শোভিত—
মুকোমল চতুর্ভুজ, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন বিরাজমান—কর্ণদেশে কোমল-
মণি,—পরিধানে পৌত্তবসন, বর্ণ নিবিড় জলধর তুলা শ্যামসুন্দর, মহামুলা
বৈদূর্য্য মুকুট ও কণক কণ্ডল শ্রীমুখের শোভা বহন করিতে বাইয়া নিজেরাই
পরম শোভন হইয়া উঠিয়াছে ।

কিন্তু বাহুঘের কি ভ্রম ! যুগযুগান্তর যাহার শ্রীমুখকমল ধ্যান করিয়া
আসিতেছেন, যাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কত বাৎসল্য প্রেমের অভিনয় করিয়া
আসিতেছেন—সেই বহুদেব দেবকী আজ তাঁহাকেই চিনিতে পারিতেছেন না ।
কত শ্রব, কত স্মৃতি বন্দনা করিতে লাগিলেন “হে বিত্তো ! অখিলেশ্বর ! তত্ত্ব-
দর্শীয়া বলেন—আপনা হইতেই এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রায় হইতেছে—অথচ
আপনি নিগুণ নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী । আপনি ত্রিলোকীর প্রাণনাথ, স্বীয় যার্য
দ্বারা স্তম্ভবর্ণ ধারণ করেন, সৃষ্টির নিমিত্ত যজোঋণাধিত রক্ত বর্ণ গ্রহণ করেন
এবং প্রায় সময়ে কৃষ্ণবর্ণ শীকার করিয়া থাকেন । হে বিত্তো ! আপনি এই
সমস্ত লোকের রক্ষা করিয়া আমার আলয়ে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আবির্ভূত হইরাছেন ।”

ভক্ত-কথামৃত ।*

(লেখক ।—শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে ।)

মহাপ্রভুর নিত্যলীলা, সর্বকাল স্রবৎ প্রকাশ আছেন ।

“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ ।

মত্তস্তা বত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥”

* মহানন্দ পার্ঠকমণ । এই প্রবন্ধটির সকল স্থানের সহিত আমাদের
মতের মিল হয় না । তথাপি, ভক্ত কথামৃত বলিয়া প্রকাশ করিলাম । বাকি
প্রবন্ধ পার্ঠে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে তবে তিনি উহা লিখিয়া পাঠাইলে
ভক্তিতেই যথাযথ প্রকাশ হইবে । (ভক্তি সম্পাদক)

“আমায় ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে করিয়াছেন দৃঢ় ॥”

লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রেমের বাধক ভক্তকর্ম, তজ্জন্য হরিভক্তিবিলাস স্মৃতি ইত্যাদি কোন শাস্ত্র মতপ্রভুর ঐমুর্তি প্রতিষ্ঠার বিধি প্রকাশ্যভাবে দেন নাই ; মহাপ্রভু, স্বতঃ স্ব-প্রকাশ, অজ্ঞান তমঃ নাশ হইলেই সর্বত্র মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইবেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে কোন ভক্ত শ্রীমুর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। ভক্তকে অবজ্ঞা করিয়া শ্রীমুর্তি পূজা করিলে পূজা বিড়ম্বনা হয়। কোন ব্যবসায়ী গুরু, অর্থ উপায়ে অন্য শ্রীমুর্তি সেবা প্রকাশ করিয়া ধর্মের এই প্রকার ব্যক্তিচার করিয়াছেন, পঞ্চম বেদ, আশ্ব সমর্পণকারী ভক্ত তিন্ন বেদ বিধি দ্বারা মহাপ্রভুর পূজা হয় না ; “বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দ লালা।”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত জগতের সকল গ্রন্থের সার, উহা পঞ্চম বেদ বলিয়া কীৰ্ত্তিত। আচণ্ডালে প্রেম দানই, উহার উদ্দেশ্য ; এই গ্রন্থে, সকল জীবের লয়ান অধিকার, তবে পতিত হওয়া চাই।

অমুরাগী গুণাভীত, কর্মাভীত, বাহু জগতে থাকেন না। তাঁহারা অধ্যাত্ম জগতে, নিকুঞ্জ লীলা দর্শন ও আশ্বাদন করেন। রাস মার্গ সাধারণের দৃশ্য নহে, তাবের গোচর ; যথা—

“ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব

গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥” (চরিতামৃত)।

বাউল বলিয়া কোন সম্প্রদায় নাই ; অপ্রাকৃত দেখে, ক্রুদ্ধ প্রেম, নিবেদ্যমান হইলে বাউল হয়। প্রাকৃত ধর্ম ধ্বজী, বাউল নহে ; উহার নকল বাউল। “তুমি এক বাউল, আমি দ্বিতীয় বাউল, অতএব তুমি আমি হই সমতুল।” চরিতামৃতের এই বাউলই বাউল। এ বাউলের অণুকরণ হয় না। বাহু জগতে নিরপরাধ নাম সংকীর্তন, অধ্যাত্ম জগতে রস আশ্বাদন। এই অধ্যাত্ম তাব কেবল স্বরূপ রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বতীত অন্য কেহ দেখিতে পান নাই, দেখিলেও বুঝিতে পারেন নাই। উহা অত্যন্ত নিগূঢ়। “বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মুঢ়।” “ঐশ্বর্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত ; ঐশ্বর্য শিথিল জ্ঞানে নহে মোর প্রীতি ॥”

“কর্ম্ম ভল যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি অপ ধ্যান,
ইহা দুইতে মাধুর্য্য মূলত ।
কেবল যে রাগ মার্গে, ভলে কৃষ্ণ অনুরাগে,
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য মূলত ॥”
এই ভাব অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত বহির্জগতে পাইবার উপায় নাই ।
“দেশ কাল পাত্র ভেদে ধর্ম্মাদি বিচার ।
সাধন ভক্তি এ চারি বিচারের পার ।
সর্ব্ব দেশ কাল দর্শী জন্মের কর্তব্য ।
ভক্ত পান সেই ভক্তি প্রটীষা, প্রোতষা ॥”

মাত্রাভীত না হইলে মাধুর্য্য-ভাব অনুভব হয় না, মাত্রাভীত হইবার জন্য প্রথমতঃ মহামাত্রা যোগ মায়ায় সাধনা করিতে হয়; তাহা বাক্য মনের অগোচর, অব্যক্ত, সাধু সঙ্গ লাভসম্মত; সম্প্রদায়ী বাউলগণ সাধুসঙ্গের অভাবে রাগ মার্গ আচ্ছাদন করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্মে কলস আনিয়াছেন। উহার মধ্যপ্রভুর মত লইয়াছেন বটে, কিন্তু তৎসহ একটু স্বমত সংযোজিত করিয়া সত্য পথটিকে কলঙ্কিত করিয়াছেন এক কলস হুন্ডে একবিন্দু স্রষ্টা দিলে সমুদায় হুন্ডাই মট্ট হয়। “নির্মূল সে অনুরাগে, না লুকার অন্য দাগে, শুদ্ধ বস্ত্রে ঘেন মসী বিন্দু।” এই সকল বাউল ঐচ্ছিক চরিতামৃতরূপ মহাসত্যপথে বিবর্ত-বিলাসরূপ একটা কল্পিত মেঘ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিবর্ত বাহু মহাপ্রভুর মত নহে; পরিণাম বাহু, অচিন্ত্য-ভেদাত্মক স্বতঃ স্বপ্রকাশ ভাব গ্রহণের হেতু ধর্ম্ম স্থাপন; “অন্তঃ কৃষ্ণ বহির্গোষ্ঠ” বাহিরে রাখাভাব। প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতি হইতে হইবে; বেরূপ কাঁচপোকা আরসলাকে নিজ রং ধরায়, তদ্রূপ। বাউলগণ বিপরীত কার্য্য করিতেছেন, প্রকৃতিভুলিকে ঐমতি সাজাইয়া প্রকৃত বোহে অপ্রাকৃতির অনুকরণ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছেন। মহাকবি চণ্ডিদাস প্রকৃতি স্বয়ং ঐরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া প্রকৃতি হইয়াছিলেন। “পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হব, এক দেহ বৈরা নিত্যেতে বাব।” ইহাদিগকে শরণাগত, পণ্ডিত, অকিকল হইতে হইবে। কিন্তু শিক্ষার ঘোষে সকলে সাধু মহাভিক্রমে ব্যবসায়ী গুরু হইয়া অনেক অবলায় জীবন নষ্ট করিতেছেন।

ইহারা যদি কোন প্রকারে সাধুসঙ্গ পায়, তাহা হইলে সমুদ্রে মনোমিলনের অ্যায় সমুদ্রার উপধ্বংসলি মহাপ্রভুই শরণাগত হয়। মহাত্মা শঙ্করাচার্যের মত অবৈতবাদ, উহা এই—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ ও মায়া মিথ্যা, ইহাতে নির্কারণ হয় ; সেব্য সেবক ভাব থাকে না।

শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর পরিণাম বাদ ও অচিন্ত্য ভেদান্তেদ তৎকে জগৎ ও মায়া, সত্য ও নিত্য। জীবের দেহে আত্মবুদ্ধিই মিথ্যা। “কৃষ্ণ নিত্য নাস জীব তাতা তুলি গেল। সেই দোবে মায়া তার গলায় বাঁধিল ॥” নাস প্রভু সম্বন্ধ ভিন্ন ভক্তির পথে হাওয়া যায় না।

“রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অন্যোন্মোহে মিলিলে রস আশ্বাসন করি ॥”

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোলাঞী।

* * *

“নির্কারণ কি আছে ফল, স্নেহেতে জল মিশার।

চিনি হওয়া ভাল নয় খেতে ভাল বাসি।

কৌতুকে প্রসাদ বলে, কল্পনা নিধির বলে

চতুর্কণ করতলে ভাবলে এলোকেশী ॥”

অচিন্ত্য ভেদান্তেদ—এইরূপ, প্রেমের বলে শ্রীভগবানের সচিত্ত ভক্তের মিলন, ইহা ভেদে, আর বাহ্যে ভেদ ; চিন্তা দ্বারা এ ভাবের অস্ত্র পাওয়া যায় না। তজ্জন্য অচিন্ত্য। চক্ষে এ ভাব দর্শন করিলে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়া যায়।

ভক্তকে অবজ্ঞা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিলে পূজা বিড়ম্বনা হয়। অর্থ উপায়েই ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ সেবা প্রকাশ, ধর্মের ব্যভিচার।—শ্রেম ব্যভিচার, বেদ বিধি দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা হয়না। “বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা।”

নব ছিন্নবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ যখন নিষ্ঠুর প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ দেহ দ্বারা পরব্যোম হইতে যে শব্দ বাহির হয়, তাহাই বংশীধ্বনি। বংশীধ্বনির বাহিরে বিষজালা, অন্তরে আনন্দ। বাহিরে পাকজন্তু শব্দধ্বনি হইতে থাকে, পাখ-গণের উহাতে স্তম্ভকম্প হয়, এই ধ্বনির স্বর এইরূপ—“প্রলয়কালীন জলদ গজের, ভিঠ ভিঠ সতত তজ্জের, জন-মনোহরা শব্দনসোদরা গর্জ গর্জ করে।”

আবার ভক্তগণের নিকট উহা—“কর্ণের, গভীর ধনি, নবধন ধনি তিনি, বায়ু গলে কোকিল লাজার । বায়ু এক প্রতি কণে, ডুবায় অগভের কাণে, পূনঃ কাণ বাহুড়িলা বায় ।”

“গুরু কৃষ্ণরূপ হল শাস্ত্রের প্রমাণে ।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥”

শব্দ ভ্রমের পার্থক্য এবং পরভ্রমে নিমগ্ন ভক্ত ব্যতীত গুরু হওয়া যায় না ।

“অক স্বভে অক চড়ে,

উতরেতে কুণে পড়ে,

কণীকে কি কর্ম ছাড়ে, তার কি প্রশল ।

এই যে তোমার ঘরে,

ছয় চোর চুরী করে,

তুমি বাও পরের ঘরে, এ তো বড় রহস্য ॥”

ঐগুরু, কৃষ্ণ, বৈকুণ্ঠ, নাম, সর্বকালে সত্য, নিত্য নূতন সত্যের লাবণ্য দাই । কাজেই মিথ্যাগুরু কেহই করিবেন না ।

প্রেরিত পত্র ।*

—:—

মাননীয় —ঐতত্ত্ব পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

ভক্তি ভাণ্ডার সম্পাদক মহাশয় ।—

ঐময়রাপ্রভুর ইচ্ছায় আজ কাল চারিদিকেই ভক্তি-মত্ত প্রচারিত এবং ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে, ইহা অবশ্যই সুখের বিষয়, কিন্তু দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা প্রাচীন যে করেকজন হতভাগা আছি এই প্রচারের মধ্যে সবতা অথবা ঐময়রাপ্রভুর প্রচারিত বিপুল মতবাদের বিপুল কার্য দেখিলে

* ময়মনসিংহ, মেয়পুর টাউন হইতে ঐনুজ্ঞ প্রেমামন্দ দাস মহাশয় এই পত্রখানি আনান্বিতক লিখিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য ভক্তিতে প্রকাশ করিলাম । এ সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন কিছু বাক্য, থাকে তাহা সঠিকইলে আমরা বাস্তবের ভক্তিতেই প্রকাশ করিব । (ভক্তি-সম্পাদক ।)

প্রাণে বড় থাকে। আবার তাহাই যদি কেহ গৌরব করিয়া সমর্থন করেন তবে নিতান্তই অসঙ্গ বোধ হয়। অনেক দিন হইতেই অনেক কথা ভাবিতেছিলাম। ভাবিতাম সহিয়াই বাইব, কিন্তু প্রু তাতা দিলেন না।

আপনি নিত্য-দীপা-প্রবীষ্ট শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদান্তরহ মহাশয়ের কনিষ্ঠ স্ত্রীয়াং আমাদিগের বরই আদরের পাত্র, আপনার ভক্তি-নিষ্ঠা দেখিয়া যেমন বড়ই মুগ্ধ হয়, তেমনই আপনার কাগজে সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ প্রবন্ধ দেখিলে আবার ততোধিক মনোকষ্ট পাই।

গত বর্ষের চৈত্র মাসের সংখ্যায় ভক্তিসাগর মহাশয়ের লিখিত “কি আনন্দ ঐচ্ছন্দ্যধরে” নামক প্রবন্ধ বাস্তবিকই নিতান্ত সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। ঐচ্ছন্দ্যধর দিবসে মহোৎসব কোন বিধি অনুসারে হইল? প্রাচীন নিত্য-সিদ্ধ শ্রীহরিনামের পরিবর্তে নূতন হাত গড়ান নাম দ্বারা অষ্ট প্রহর স্মৃতি হইয়া কেমন বিচার?

নিতাই গৌরের নাম শুনিবে না একপ গোড়ীষ বন্ধব কি তেহ আছেন? প্রবন্ধ পড়িয়াই বোধ হয় যেন সরল বিশ্বাসী কোমল শ্রদ্ধা ব্যক্তিগণকে ক্রোধান্বিত করিয়াই ভক্তিসাগর মহাশয়ের এ কল্পিত পরিবাদ। সূত্ৰবত কোন সঙ্কল্প বৈক্যব অরুণাচলব বাবু সম্মান্যদিগের মোসলমানি জরিগানের হুত্রে প্রচলিত নূতন ধরণের ‘প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ’ নামে অষ্টপ্রহর সম্পন্ন হওয়ার প্রতিবাদ করিয়া থাকিবেন। সত্য হলে প্রতিবাদ ঠিকই হইয়াছিল। যদি নিতাই গৌরের নাম দিয়াই অষ্টপ্রহর করিতে হয় তবে তাহারও প্রাচীন গান-আজ্ঞে, বখা-ঐল ঠাকুর মহাশয়ের কীতিতে “জয় জয় নিত্যানন্দ অবৈত গৌরানন্দ” এবং ঐল শিবনাথ চক্রবর্তীপাদেব” শ্রীমদ্বদীপ কিশোর চন্দ্র” প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত চরণ দাস বাবাজি মহাশয় ভজন শীল মহাত্মা ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ণ মহাজনদিগের প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি যদি নূতন হাঁচে নাম ঢালিয়া থাকেন তবে উহা “মেকী” নয়তো কি? নামের মহিমায় অতি

* যদি “নিতাই গৌর রাধেশ্যাম হরেকৃষ্ণ হরৈ রাম” এইটী হরেকৃষ্ণ নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তবে উহাকে “মেকী” বলা চলে। কিন্তু ঐ নামটী ঐরূপ নহে ঐনাম স্বয়ংই ভজনীয় তত্ত্ব ও অপেরমত নির্দেশ করিয়া দিতেছেন, বখা:—

“ভজ, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ, হরৈ কৃষ্ণ হরৈ রাম।” (ভক্তি-সম্পাদক ঠ)

আকুল একরূপ লক্ষ লক্ষ লোক 'মেকী' নামে ভূজিতে পারে কিন্তু রসজ্ঞ ভক্ত
মাত্রেই যেন আনন্দের পরিবর্তে উহা শেল সম বাঞ্ছিব।

কথা নিয়া সারা চায়ার অভ্যাস বা সময় আমার নাই। বহু কাগজে
নূতন নূতন বহু প্রকারের কথাই বাহির হইতেছে কিন্তু আপনার কাগজেও
এইরূপ স্বেচ্ছাচারী প্রবন্ধ দেখিয়া এত গুলি কথা দিখিয়া ফেলিলাম।
রূপাকরিষা আমার এই পত্রখানি আনুল প্রকাশ করিলে খুশী হইব।

আর একটা কথা বলি, উচ্চ নাম সংকীৰ্ত্তন কথিয়া অষ্ট প্রহর নিকট প্রাচীন
রীতি নহে * পূৰ্ণ দিবস সাধাক্ষে অদিবাস করিয়া রাখিতে হয় তৎপরে বধা
কালে শেষ বাত্রে নিশাত্ত লীলা ও কুঞ্জ ভঙ্গাদি অষ্ট কালীন সমগ্র লীলা গান
আরম্ভ করতঃ অহোরাত্র কীৰ্ত্তন করিয়া তৎপর দিবস নাম সংকীৰ্ত্তন দ্বারা নগর
ভ্রমণ অন্তে শ্রীকীৰ্ত্তনস্থানে ফিরিয়া আসিয়া সমাপন গীতিকা এবং শ্রীমহাত্ম
বিদায় প্রভৃতি গান দ্বারা উৎসব সমাপন করিতে হয় ইহাই প্রাচীন আচার।
নতুবা অকণ্ঠলের বাবু সম্যামৌদগের প্রচারিত বিকট চিৎকারে সজ্জাজন রক্ষা
পায় না। অলমিত বিস্তরেণ।

ভক্তির সাধন।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বুজাঙ্গ সরকাব, এম, এ, বি, এল।)

—::—

শ্রীপাদ রূপগোষ্ঠামৌ ভক্তি-রসামৃতসিদ্ধি গ্রন্থে ভক্তি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন;—

আনৌ প্রজ্ঞা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া।

ততোহনর্থ নিরুত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা কচিস্ততঃ ॥

অধাসক্তি স্ততো ভাব যত প্রেমাত্মকতি।

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাপ্তর্ভবে তথৈব ক্রমঃ ॥

* লীলা এবং উচ্চ নাম কীৰ্ত্তন উভয় প্রকার সঙ্গাচারই প্রচলিত আছে।
যহং সাধারণস্থলে লীলা কীৰ্ত্তনের নিষেধই দেখা যায়। (ভক্তি-সম্পাদক।)

অর্থাৎ সাধকের হৃদয়ে প্রেম আবির্ভাবের পূর্বাপর ক্রম এইরূপ :—(১) জ্ঞান (২) সাধুসঙ্গ (৩) ভজন ক্রিয়া (৪) অনর্থ নিবৃত্তি (৫) নিষ্ঠা (৬) রুচি (৭) আসক্তি (৮) ভাব (৯) প্রেম। উক্ত শ্লোকের অর্থে শ্রীমৎ জীব গোবামীপাদ অভিপ্রায় করিয়াছেন যে, প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্র অর্থ দ্বারা জ্ঞান ও তাহা হইতে শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস। তাহার পর ভজন ক্রীতি শিক্ষার নিমিত্ত পুনশ্চ সাধুসঙ্গ। অতএব প্রথম তিনটী অবস্থা সর্ব্বতোভাবে সাধুসঙ্গের উপর নির্ভর করে। ভজনের আদৌ সাধুসঙ্গই প্রধান। শ্রীমদ্ব্যাক্ত শ্রীমৎ সমাতন গোবামীকে ভক্তি-সাধন সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহাতেও সাধুসঙ্গের প্রথম স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন, বধা—

সংসঙ্গ, রূপ-সেবা, তপস্বত, দাম,
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান।

শাস্ত্রের নানাস্থানে ভক্তিসাধন সম্বন্ধে সংসঙ্গের মহিমা উক্তরূপে কীর্তিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান কণিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, বধা—

সত্যং প্রসঙ্গায়ম বীৰ্য্য সন্নিধৌ
ভবন্তি হংকর্ণ রসায়নাঃ কথঃ।
তজ্জৈমলাদ্যপবগ বজ্রনি
জ্ঞান রতিভাক্ত রতু কেমিষ্যতি ॥

অর্থাৎ সাধুসঙ্গের সংসর্গে আমার শক্তি সম্বন্ধীয় হৃদয় ও কর্ণের সুখজনক কথা হইতে থাকে, সেই কথা প্রবণ করিতে করিতে মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সৈবাং মতিভাবহরুক্রমাজিহ্নুং
স্পৃশ্যত্যানর্থাপগমো বদর্থঃ।
মহীরসাং পাদরজোহভিষেকং

নিকিঞ্চলানাং ন বৃণীত বাবৎ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

অর্থাৎ যে পর্যন্ত বিষয়ভিমানহীন সাধুসঙ্গের পদগুলি দ্বারা অভিষিক্ত না হইবে, সেই পর্যন্ত কাহারও মতি সংসার বাসনা নানের উপর যে ভগবানের চরণপদ্ম তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। বৃহদারদীর পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

ভক্তিস্ত তগবন্তক্ত সঙ্গেন পরিভারতে।

ভক্তি, ভগবত্কর্তার সঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুনশ্চ—

দুঃখিণ্ড রশ্মিজালে দ্বিবা হৃদি বহিস্তমঃ।

সত্ত্বঃ স্বক্ৰিময়ীচ্যো বৈশ্ণবাত্ত্বাং হি সৰ্ব্বথা।

সূর্য্য, কিরণমালা দ্বারা বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন, কিন্তু সাধুগণ তাঁহাদের সহকৃতিরূপ কিরণজালের দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে তিতরের অন্ধকার নাশ করেন।

. ভক্তিবসামুত্থিতদ্বারা উক্ত শ্লোকের হৃগ্নমসঙ্গমটীকার প্রীপাদ জীব-গোবামী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—“তত্র বহুশ্চ অপি ক্রমেণ সৎস্ব প্রারিক্রমেণ ক্রমমাহ আদ্যাবিতি ধরেন” অর্থাৎ ভক্তির বহুবিধ ক্রম আছে তাহার মধ্যে “আদৌ প্রক্কা” এই শ্লোকদ্বয়ে প্রারিক্রম একটা মাত্র ক্রম নির্দেশ করা হইয়াছে। ভক্তি শাস্ত্রের বিভিন্ন আচার্য্য মুখ্য ও গৌণভাবে ভক্তির অভ্যাসের বিভিন্নরূপ ক্রম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। জীসম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীমৎ-রামানুজাচার্য্য ভক্তি সাধনের ক্রিয়াকর্ম নির্দেশ করিয়াছেন বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যৌদ্ধ-বিপ্লবে যখন সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত ও কুরুপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন ক্ষয়শূন্য হইতেছিল, তখন ভট্ট কুমারিল ও স্বামী শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানপথ একটন পূর্ব্বক সেই বিপ্লব বিদূরিত করেন। কিন্তু তখনও তক্তের হৃদয়ধন, ভাবকের কণ্ঠমণি বিমল ভক্তিমার্গ অজ্ঞানের অন্ধরূপে নিহিত ছিল। অবৈতন্যাদীর হৃদ্যার্থ্য্যবিষমুচ্ছিত ব্রহ্মহৃৎ ভক্তি-লঞ্জীবনী স্মার দ্বারা সঞ্জীবিত করিবার মানসে, বোধায়ন বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীভাষ্য রচনা করিয়া পরম দার্শনিক তত্ত্বচূড়ামণি শ্রীরামানুজাচার্য্য ভক্তিমার্গ প্রসিদ্ধিষ্ঠিত করেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মতে তৈলধারায়ঃ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি সন্তানকণ প্রবা স্মৃতিই ভক্তিপদ বাচ্য। এই প্রবাসুস্মৃতিরূপ ভক্তির সাধন প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—“বাক্যকারশ্চ প্রবাসুস্মৃতে বিবেকানিত্য এব নিষ্পত্তিমাহ তত্ত্ব-বিবেক-বিমোকাভ্যাস-ক্রিয়া কল্যাণানবসাদান্তর্ভূতঃ, সত্ত্ববাৎ নিষ্কল্যাণাচ্চ।” অর্থাৎ বাক্যকার ও বিবেকানি নিমিত্ত হইতে প্রবাসুস্মৃতির সমুৎপত্তির কথা বলিয়াছেন ;—বিবেক, বিমোক অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অন্তর্ভূত এই সপ্ত কারণ হইতেই সেই প্রবাসুস্মৃতি লাভ করা যায়।

১। বিবেক :—জাত্যাশ্রয়-নিমিত্তাদৃষ্টাদম্মঃ কারুভির্বিবেকঃ ।

অর্থাৎ জাতিদোষ, আশ্রয়দোষ ও নিমিত্তদোষ দ্বারা দূষিত আহার্য হইতে শরীরকে রক্ষা করাই বিবেক । যে অন্ন উক্ত দোষত্রয়ের কোনও দোষ-দ্বারা কলুষিত সে অন্ন ভোজন করিতে মাই । এ সপক্ষে শাস্ত্র প্রমাণ “আহারভুক্তৌ সম্বন্ধকিঃ সম্বন্ধৌ ক্ৰাস্মৃতিঃ” আহার ভুক্তিতে সম্বন্ধভিন্ন ও সম্বন্ধভিতে ক্ৰাস্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইংবাজীতে একটা কথা আছে যে A man is what he eats অর্থাৎ মানুষের ভোজনানুসরণ তাহার চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে । জাতি আশ্রয় ও নিমিত্ত দোষ দ্বারা আহারীয় ভ্রম্য দূষিত হইতে পারে । ভ্রম্যের স্বভাবগত গুণকর্মিত যে দোষ তাহাই জাতি দোষ, যেমন পৌরাজ, রক্তন, মাংসাদি । কোন অগন্তক কারণ দূষিত অথকে নিমিত্ত দৃষ্ট বলে, যেমন কেশমখাদি অথবা রাস্তার ধূলি বা অন্য কোন আকর্ষণীয় মিশ্রিত অন্ন । কোন ব্যক্তি কোন ভ্রম্য স্পর্শ করিলে সেই ভ্রম্যের মধ্যে সেই ব্যক্তির গুণাগুণ অদৃষ্টভাবে অন্তর্গত হইয়া থাকে । সাধুব্যক্তির দ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন তাহার সদগুণ এবং অসাধুব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন যেমন তাহাব অসদগুণ অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে । সেইরূপ অসংব্যক্তির আশ্রয়দোষে যে অন্ন দূষিত হইয়া থাকে তাহাকে আশ্রয়দৃষ্ট বলে । সেইরূপ অন্ন যথাসম্ভব পারদর্জনে করিতে হইবে ।

২। বিমোক ।—বিমোকঃ কামানভিষঙ্গঃ ।

কোনরূপ কামনা বা কাম্য বিষয়ে আসক্তি না থাকার নাম বিমোক । অন্যাভিলাষ শূন্যতা ভক্তের একটী প্রধান গুণ । হৃদয়ে বিষয়াদির প্রতি আসক্তির লেশমাত্র থাকিলে উত্তমা ভক্তি বদাচ সে ভদ্রে ক্ষুণ্ণি পায় না ।

৩। অভ্যাস—কোন ভক্তবিষয় অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ চিত্ত সমাবেশ শিক্ষার নাম অভ্যাস । আমাদের জন্মজন্মান্তরের মূলীভূত সংস্কার বশতঃ মন সঙ্গীহা পঙ্গাদি বিষয় সমূহের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে । কোন ভক্ত বিষয়ে চিন্তা সংযোগ করিলেই মনোবৃত্তি বহির্মুখী হইয়া বিড়োহী হইয়া উঠে । পুনঃ পুনঃ এইরূপে ব্যাহত হইয়াও বিক্ষিপ্ত বৃত্তি সকলকে সংগ্রহ করিয়া ইষ্ট বিষয়ে তাহাদিগকে অতিনিবিষ্ট করা সাধকের কর্তব্য । শ্রীভগবানও গীতার এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি হিরন্ময়।

অভ্যাসযোগেন কৃতো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥১২৯॥

৪। ক্রিয়া—শ্রীরামানুজাচার্য বলেন, “শক্তিভঃ পঞ্চমহাষজ্জানুষ্ঠানং শক্তিভঃ ক্রিয়া।” শুধু ধর্মসাধকের জন্য কেন গৃহস্থ মাত্রেই পক্ষেই পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবাদ ব্যবস্থা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য স্বমত সমর্থন জন্য বৃহদ্রথপুত্রকোপনিষদ্ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা

ওমেতৎ বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিস্বিত্ত্ব

যজেন দানেন তপসানাম্বকেন। (বৃহদাঃ ৪।৪।২২)

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক্ত (ভোগহৃজ্জারাহিত্য) দ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন

কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্তনই যজ্ঞ। যুগবিশেষে সাধনার বিধিভিন্নতা আছে।

কৃতে যং ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতাযাম যজতো মথৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়ং কলৌ তদ্ধরিকীর্ণনাম্ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

সত্যযুগে নিযুক্ত ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ যাজন করিয়া, দ্বাপরে পরিচর্য্যা করিয়া যে ফল লাভ হয়, কলিকালে তাহা একমাত্র হরিসঙ্কীর্ণন দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

৬। ধ্যান কৃতে যত্ন যঃস্ত ত্রেতাযাম দ্বাপরেহর্চরন্।

যদাপোতি তদাপোতি কলৌ সঙ্কীর্ণা কেশবম্ ॥ (বৃহদ্রথপুত্রাঃ ১।১।১০)

অতএব কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ণনই শাস্ত্রানুসঙ্গিত প্রকৃষ্ট ক্রিয়া। রামানুজাচার্য্য তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কলিকালের পক্ষে যথোপযোগী বলিয়া মনে হয়না।

৫। কল্যাণ—সত্যজৈবদাদানাহিংগভিধ্যাঃ কল্যাণানীতি। সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা ও অনভিধ্যা (সফল চিন্তা) ইহাই কল্যাণ।

৬। অনবসাদ—দেশকাল বৈজ্ঞান্যেক্ষোবস্ত্রানুযুতেশ্চ তজ্জং দৈন্তমজ্ঞানং ব্রহ্মত্বং মনসোহবসাদঃ। তাবপর্ষরোহনবসাদঃ।

এ সংসারে আমরা যাহা চাই তাহা পাইনা, যাহা পাই নিষতির বিধানানুসারে তাহা আবার হ'রাইয়া ফেলি। কাম্য বস্তুর অপ্রাপ্তিতে ও প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদে আমাদের দুঃখদুর্কল হ্রদয়ে যে অশ্রুস্রবতা বিরাজ করে তাহার

নাম অবসাদ। অবসাদের বিশরীত অনবসাদ। তত্ত্ব বীতরাগ ও বীতশোক হইতে চেষ্টা করিবেন। ইহাই অনবসাদ সাধন।

৭। অমুক্তব—“তদ্বিশিষ্টায়োহমুক্তবঃ।”

কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি জনিত হৃদয়ে যে স্মৃতি হয় তাহার নাম উদ্ধব, তাহার অন্ত্য অমুক্তব। তত্ত্ব এই সংসারে উদ্ধবীর্ষ গিরিরাজবৎ বিচরণ করিবেন, সংসারের ঝঞ্জাবাতে তাহার হৃদয় অবসাদে সেকপ উদ্বেলিত হইবেনা, কৃতকার্য-তার প্রকল্প রণিকরণেও তাহা সেইরূপ উদ্ধবে ক্ষীত হইয়া উঠিবে না।

হৃৎখেদমুদ্বিগমনাঃ হৃৎখেসু বিগতস্পৃহঃ

বীতরাগভয়ক্ৰোধঃ স্থিতধীমুনিরূচ্যতে। গীতা ২।৫৬

যখন হৃৎখেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, হৃৎখেতেও কোন প্রকার স্পৃহা না থাকে, আর যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। শ্রীহরির চরণসরোজে যাহার মানসভঙ্গ মধুপানে মত্ত, সংসারের হালি কারা, আলোছারা, ষাত প্রতি-ষাত কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আরামামুজাচার্য্য ভক্তিসাধনের যে সাতটি ক্রম উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সকলগুলিকে ঠিক সাধন বলা যায় না; কতকগুলি অবস্থা ভক্তের লক্ষণ। বিশেষতঃ ভক্তিসাধনের মধ্যে সাধুসঙ্গের কোন প্রশঙ্গ না থাকায় ইহা নিতান্ত অসম্পূর্ণগোষে দৃষ্ট। কিন্তু তৎসঙ্গে তৎপ্রবর রামামুজাচার্য্য এ সম্বন্ধে যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ভক্তগণের নিকট নিতান্ত উপেক্ষনীয় হইবে না বলিয়া এস্থলে তাঁহার মত যথাসাধ্য সঙ্গলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বক্তব্য ।

বর্তমান যুদ্ধ বিদ্রোহে কাগজ ও মুদ্রন সরঞ্জামের মূল্য বৃদ্ধি জন্য আগামী ১লা ঘাণ্ হইতে ভক্তির মূল্য বাৎসরিক ১ এক টাকা হুলে ১০ দেড় টাকা ধাৰ্য্য করা হইল, বর্তমান সংখ্যার কভারের ২য় পৃষ্ঠায় সবিশেষ আলোচনা হইল, এবং আগামী বারেও হইবে। (ভঃ সঃ)।

প্রাণের কথা ।

বেদনা যখন লাগে, প্রাণ যখন হত্যাশের কঠোর কষাঘাতে কণ্ঠাঘত হয়, তখন আর কিছুতেই মন স্থির হইতে চায়না। যে সুন্দর অট্টালিকা প্রকৃত করিতে যাইয়া কত নিরীহ-নিপীড়িতের মর্শ্বভেদী ক্রন্দনের রোলে বহুক্ষণ একদিন কুণিয়াছিল তাহা যেন এখন মরুভূমি বলিয়া মনে হয়, যে প্রিয়তম পুত্রের মৃৎ-চুহনে একদিন স্বর্গস্থ অতিভূজ বলিয়া মনে হইত তাহা যেন এখন শত শত বিশিষ্টকণ্ঠনের ন্যায় বোধ হয়, যে অর্থউপার্জনের জন্য একদিন পাণ্ডু পথে, জাল জুরাচুরির পথে প্রাণ আনন্দে প্রধাবিত হইত, বিবেকের শত শত নিষেধ বাণী কিছুতেই স্নানিতনা তাহা যেন এখন ভগ্নস্তম্ভের মত জ্ঞান হয়। এই তাব আসে, কেবল তোমার আমার নয়, জগতের বাবতীর মল্লধোরই প্রাণে যখন একটা বেদনা, যখন একটা বর্ণনাভীত যাতনা অহুতব হয়, তখন এইভার আসে। তখন আর কিছুতেই প্রাণ স্থির মানেনা, সত্য সত্যই তখন সকল ভুলিয়া, সকল ছাড়িয়া কাতর প্রাণে কেবল বলিতে ইচ্ছা হয় ;—

ব্যথার ব্যপ্তি, হরি কে আছে আমার বেদনা জামাষ কায়ে ।

(আমার) ধরম করম, ভজন পূজন, সকলি গিরাছে দূরে ।

ধুলো খেলা-ভঙ্গে বজ্রগণস'ন,

হাসিতে খেলিতে আনুগালাগনে,

দিল ব'য়ে গেল, কিছুই না হ'ল (এখন) তাবনা হ'ল যে অন্তরে ।

ঊষ্ণিয়া প্রভাতে মনে করি আমি,

ভাবিব তোমায়ে ওহে অন্তর্যামী,

(কিন্তু) বত বাড়ে বেলা, তত হয় জালা, সকলি ভুলিই সংসারে ।

ক্রমে গেল বেলা ওহে বনমালী,

ভেম্বলি ক'রে এগে বাজাও হে মুরলী,

(খদি) দেবা নাহি দিবে, বল কেন ওনে, আশাতে কুলানে আধারে ।

ঐকীর্ষ্যে চর ভট্টাচার্য ।

নিবোধমগ্ন পণ্ডিতপ্রসর

দীনবন্ধু ক'ব্যতীর্থ বেদান্তরত্নের জা নী-প্রদম্ভ ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত অম্বদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ।)

(দ্বিতীয় ও প্রসারিত সংস্করণ ।)

—:—

হিন্দু সমাজের গর ও পুরোহিত না হইলে, ইহলৌকিক—কি পারলৌকিক কোন সংস্কার সম্ভব হইবার উপায় নাই। প্রকৃত গর ও পুরোহিত বাস্তবিক হিন্দুর অন্তঃ মঙ্গলের আকর। যাগাতে সেই আদর্শ বজায় থাকে ভক্তপ্রবর সাধক পণ্ডিত দীনবন্ধুর প্রাণ মেজনা কাতন হইত। তাই তিনি গর ও পুরোহিত সম্প্রদায়কে আদর্শে অমুদ্রণ হইবার জন্য, সাধারণ সমাজ সমিতিতে নানাভাবে উপদেশ দিতেন। সে উপদেশ সংদেশ্য প্রমোদিত, কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা ব্রাহ্মণের অযথা কু-সা বা বদ্বিত নিন্দা করা তাঁহার আচার্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

লোকের মধ্যে ধর্ম্ম ভাব শিথিল হওয়ার একটি প্রধান কারণ কি, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে তিনি বলিতেন—

‘দোষ কাহার ? কাহার পক্ষে সেই প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজের সুতর তমস কর্দশ্য ঘটিল। কেন লোকে পুরাতন মনুষ্যের আদর্শ ভুলিয়া পণ্ড-পন্থার অমুকরণ করিতে উদ্রুত হইল। সেই বিনিশী, সেই জালুখী-বম্ম সেই বেদ-বিশি রান্দিছে, অথচ ক্রিয়া বর্জিত অকর্ত্তানে প্রত্যেক ফল হয় না কেন ?’ রাগ করিও না, ভোমাদেব হৃদশা দেখিয়া, ভোমাদেব সমাজের অধঃপতিত অবস্থার বিষয় আলোচনা করিয়া বহু বচন-স্বর প্রয়োগ করিবাছি। কিন্তু যাহাদের দোষে ভোমাদেব এই অবস্থা আগিয়াছে, বাগাদেব অধঃপতনে ভোমাদেবের মোগার সংসার ভাবধন হইয়া গেল বাগাদেব কুবাবতারে ভোমাদেব যতিগতি বিকৃত হইয়াছে, তাহাদের কিবশে শাস্তি বিধান করা যাইতে পারে।

তাহারা কে জান কি ? তাহারা কলির প্রত্যক্ষমূর্ত্তি সমাচার ও শাস্ত্রজ্ঞান-হীন কতিপয় গুরু ও পুরোহিত এবং কণ্ঠ ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ।

এই সকল ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ভাবাপন্ন ব্যবহারে, ইহাদের অকথিত অত্যাচারে, ইহাদের মূর্খতা ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন আচরণে, আজ এই রিয়ার্ট হিন্দুসমাজ বিরুদ্ধ ও অসংগঠিত । যে ব্রাহ্মণ সর্বস্বতার আধার, যে ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ দেবতা স্থানীয়, যে ব্রাহ্মণ লোকশিক্ষক, সমাজ সংস্কারক ও কামনাভী বশিষ্ঠা অতীত কালের ইতিহাসে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, সে মইত আজকালের উপবীতধারী বান্ধুদিগের মধ্যে কয়জনের আদর্শ ? যে গুরু, শিষ্যের সকল সমুদায় ত্যাগ করিতেন, যে গুরু, ভাবাবেগে একজনকে গলায়, সে নম্রাণ গুরু সাক্ষাৎলাভ আজকাল করুনেনেব আশা স্বপ্নের পাত্র ? যে পুরোহিত সংসারীদিগের হিতকামনায় প্ররোচিত হইত, ক্রিয়াকর্ত্তের অনুষ্ঠান করিতেন, সে পুরোহিতের দল কোথায়, কোথায় ?

সকল গুরু-পাদে চিত্তই যে এই দেশীয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না । তবু তদ্বিকার্ষ্য দাতা ব্যাপার যে বৈদেশিক তাহাতে আশা অসম্ভব মান্যত নাই । ইহারা সমাজ ও দেশের কি ক্ষতি সাধন করিতেছে, ধর্ম্মের নামে কি অমানস অত্যাচারের প্রবৃত্তি করিতেছে, আগুন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিবন্ধন লোকদিগকে বিস্মৃত থাকিতে পারেন নন করিয়া কি দের অজ্ঞানতাব প্রচার করিতেছে তাহারা একটা হাতদণ্ড দিবে, শাসন কর ।

সংসারী লোক নানা ক্রমে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহাদের ক্রীড়িক ও পারমার্থিক মজ্জার জন্য পুরোহিত ও গুরু আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় । হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্ম্ম, আচার মঙ্গলতির জন্য সাধনাদি বাপার পুরোহিত ও গুরু নিকট শিক্ষা করিতে হয় । এই গুরু ও পুরোহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, অধ্যাত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, অলোভী, অক্রেমী ও আনন্দময় জিনে বসিয়া অতীত কালের লোকে ইহাদিগের উপদেশ শিরোনাম্য করিত । ইহারাও সমাজে অপ্রতিভ প্রভাবে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন ।

এখনও দেশের ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু সে সরলতা, সে শাস্ত্রালাপ, সে সমাচার তাঁহাদের নাই । এখনও লোকে সেই গুরু ও পুরোহিতের আদর্শ বলিয়া গ্রহণের শরণাপন্ন হয়, এখনও লোকে সমাজ ও

বংশোদ্ভূতের অল্প ব্রাহ্মণের সহায়তা প্রার্থনা করে। কিন্তু আর কতদিন বংশোদ্ভূতের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে? কতদিন আর এমন করিয়া জমিদারগণকে ভুলাইয়া গুরু ও পুরোহিতেরা আপনাদিগের পৈতৃক ব্যবসারে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন? কেমন করিয়া লোকে, নিরন্তর মর্থ-বেশনার অন্তর হইয়া, আত্মপ্রতিম বা আপনার অপেক্ষাও অধম ব্যক্তিকে ক্ষম বা পুরোহিতরূপে বরণ করিবে? অবিকৃত চিত্তে তাহাদের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিবে? নীরবে তাহাদের স্বার্থলোলুপ ব্যবহার অহুসোদন করিবে?

দোষতো তোমাদেরই, তোমরা তো আপন বুদ্ধি ও বিবেচনার অভাবে এই হুঁশি। কোণ করিতেছ? যখন বাজারে যাও, যখন দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় এদোকান ওদোকান ঘাটাইয়া তবে দ্রব্য ক্রয় কর, আবার যাহা ক্রয় কর; তাহা মকল কি আসল তাহা পরীক্ষা করিয়া লও। অধিকন্তু, ক্রয় করিবার পরেও বলিয়া থাক যে, যদি দ্রব্যের কোন দোষ থাকে তাহা হইলে ফেরৎ দিবে বা পরিবর্তন করিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু ধর্মের বাজারে তোমরা এমন অন্ধ হইয়া বেড়াও কেন? কেন তোমরা আসল ও মকল ব্যবসায়ীর পরীক্ষা কর না। পূর্নপুরুষ যে দোকান চাইতে ক্রয় করতেন, সেই দোকানদার যদি অসাধু হয়, তাহা হইলে তাহার মিকটে কি তোমার নীরবে, দ্রব্য লওয়া উচিত? হয়, তাহাকে সাবধান করিয়া দাও না হয় অপর সাধু-প্রকৃতির লোকের দোকানে যাও। পুরোহিত যদি শাস্ত্রজ্ঞান হীন হইলে, তাহাকে বলিও—“ঠাকুর! আপনি শাস্ত্রমতে ক্রিয়া কর্তব্য না করিলে, আপনি বধারীতি শাস্ত্রপাঠ না করিলে, আপনার দ্বারা কোন কৰ্ম্ম করাটব না, এবং আপনি যদি আপনার বংশধরদিগকে শাস্ত্রাভ্যাস না করান তাহা হইলে আমরা তাহা-দিগকে আত্মহীন করিব না, অল্প কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বধারীতি পৌরহিত্য বরণ করিব।” গুরু যদি মূর্থ হইলে, কেবল ইন্দ্রিয়সেবী ও কণ্ঠচাল লম্পট, হইলে, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে,—“ঠাকুর! আর এমন করিয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিতে আসিবেন না। যে মন্ত্র দীক্ষা দিবে, আমাদেরকে তাহার বস্তুপ্ৰকাশ করিয়া দিতে হইবে, আপনি তাহা পারিবেন তো? যদি না পারেন, তাহা হইলে আমাদের প্রাণে শাস্তি আসিবে কিরূপে, আমরা মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিব কিরূপে? আপনি বংশরাজ্যে একবার দর্শন দিয়া থাকেন,

আমাদের আর্থিক অবস্থার সংবাদ লয়েন ও তৎসঙ্গে আপনাকে অবহিত করিয়া রাখিয়াও ইচ্ছিত করেন। কিন্তু আমাদের পারমার্থিক উন্নতি কতদূর হইল, আমরা সাধন পথে কতদূর অগ্রসর হইলাম, তাহার অনুসন্ধান করেন না বা করিবার প্রবৃত্তিও হয় না। তবে কি অজ্ঞ আপনাকে অর্থ দান করিয়া প্রবন্ধময় সহায়তা করিব। যদি আপনার ও আমাদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, যদি দেশের ও সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতে চাহেন, যদি প্রকৃত গুরুদ্বারী হইয়া সংসারী জীবের সজাগ হরণ করিতে চাহেন, যদি ব্রাহ্মণের সেই প্রাচীন মহত্ব পুনঃস্থাপন করিতে চাহেন, তাহা হইলে শাস্ত্রাত্যাগ করুন। সাধন-তত্ত্ব-পথে অগ্রসর হউন ও তখন প্রকৃত শিক্ষক হইয়া আমাদিগকে শিক্ষাদান করিবেন, আমরাও অবনত মস্তকে আপনার উপদেশ শিরোধার্য করিব।

আমাদের বর্তমান সামাজিক অধঃপতন হইবার কারণ কিছু বলিলাম বটে, কিন্তু কিরূপে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিরূপে আবার এই দেশে কস্মী-শুদ্ধ, নিষ্ঠাবান জ্ঞানবান, পুরোহিত ও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাও কিছু বলি শোন,—

যদি দেশের লোকের পরিবর্তন করিতে হয়, যদি হিন্দু সন্তানকে পুনরায় হিন্দু-ভাবানুগ ও প্রকৃত মনুষ্য পদের যোগ্য করিতে হয়, যদি বিকৃত পাশ্চ-প্রভাবের পরিবর্তন করিয়া হৃদয়ে বিশুদ্ধ সত্যের উদ্বেগ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে উন্নত হইতে হইবে। কারণ, তাঁহারা সমাজ-শুদ্ধ, তাঁহারা ধর্মের পরিচালক। গৃহের ছাদ কাটিয়া দুটিয় জল প্রবেশ করিলে কয়দিন সে গৃহের অস্তিত্ব থাকিতে পারে? তোমাদেরও “সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। মাথা বিকৃত হইলে অজ্ঞা অথবা অসংজ্ঞা অবশ্যই বিস্তারিত হইয়া যায়। এই বিকৃত-মস্তকের চিকিৎসা—জ্ঞান।” স্বয়ং তপস্বী ঐক্যং বলিয়াছেন—
“নহি জ্ঞানেন সঙ্গুণ্যং পরিব্রজিষ্যতি।”

সুতরাং ব্রাহ্মণসন্তান জ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া লোকদিগকে প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা দিলে লোকের যতের পরিবর্তন হইবে: তাঁহাদের অবসর যথেষ্ট, শুধু ও পুরোহিতদিগকে চাকুরী করিতে হয় না। তাঁহারা যজ্ঞমান ও শিষ্যদিগকে অনায়াসে সংশিক্ষা দান করিয়া ও তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করিলে, সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে। তাঁহারা আপন

অজ্ঞিত জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞ লোকদিগের কুসংস্কার দূর করিবেন সামাজিক জীবনে জ্ঞানের বিকাশ করিবেন ।

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গুলে ব্রাহ্মণদিগকে, গুরু ও পুরোহিত-দিগকে ব্রাহ্মশক্তি সম্পন্ন হওতে হইবে, সেইজন্য একথা বার বার বলিতেছি ধনী না হইলে দান করিতে পারে না, কালাল নিজেই খাইতে পার না, সে কোথা হইতে দান করিবে ? সেইরূপ ব্রাহ্মণ, গুরু বা পুরোহিত নিজে শিক্ষিত না হইলে কিরূপে লোক-শিক্ষক হইতে পারিবেন ? অশিক্ষিত লোকে শিক্ষকের কার্য করিলে যে ফল হয়, সমাজে শাস্ত্র-জ্ঞানহীন গুরু ও পুরোহিতের দ্বারা সেইরূপ বিষময় ফল ফলিতেছে । লোকে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে কুসংস্কার প্রবৃত্ত হইতেছে ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ আচার্য্যদিগের ব্যবস্থা পালন করিয়া দিন দিন অশান্তি ও দুর্দশা ভোগ করিতেছে ।

এ দুর্দশা একদিনে চর নাহি, বহুশত বৎসর ধরিয়া বিবিধ বিপ্লবের স্বাভা-প্রতিঘাতে লোকের চিত্তের পরিবর্তন হইয়াছে । ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের নানাকারণে হীনবীৰ্য্য হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদিগের পূর্ব আধিপত্যটুকুর গৌরব ছাড়িতে পারেন নাই । ছাড়িবার প্রয়োজনও নাই, তবে কথটা এই যে, পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পূর্বের জায় শক্তি সম্পন্ন, জ্ঞানবান ও শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে, কতদিন আর তাঁহাদের এ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে ?

ফলত সেইরূপ হইতেছে ; লোকে দেখিতেছে, তাঁহারা যে সকল সমাজের পালন করে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাও পালন করেন না । সুতরাং তাহাদের হৃদয় হইতে ব্রাহ্মণভক্তি বিদূরিত হইতেছে । তাহারা ব্রাহ্মণ দেখিলে আর সেরূপ ভক্তিভাবে প্রণাম করে না বা করিবার প্ররুতিও হয় না । কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিবাদি প্রকৃত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান, তাহা হইলে আগ্রহ সহকারে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করেন । এই ছই জ্ঞেয় ব্রাহ্মণের এতেন দেখিয়া, নামধারী ব্রাহ্মণ সমাজদিগের কি চৈতন্য হইবে না, তাহারা কি আপনাদিগকে অধঃপতিত বলিয়া অনুতাপ করিবেন না ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইবার জন্য প্রয়াস পাইবেন না ?

আরও দেখ, মূর্খ পুরোহিত শিষ্যের বাটীতে কর্ম করিতে আসিলেন । শিষ্য শিক্ষিত, সুতরাং পুরোহিতের অর্জক উচ্চারণ বা ভ্রষ্ট পাঠ শুনিয়া সে

কিরাণে স্থির চিত্তে তাঁহাকে দিয়া কর্ম করাইতে পারে? তাহান মনে এই ভাবগিগের প্রতি ভিলমাত্র ভক্তির উদয় হয় কি? অনেক স্থানে এইজন্য পুরোহিতেরা লগ্নর বাটীতে বড় একটা বাতায়ন করেন না, বা শিক্তি বজমানের সহিত বিশেষ আলাপ করিতে সাহস করেন না। অন্দর মধ্যে গৃহিনীর মিকট সানারূপ চাটুবাঁকা ও শাস্ত্রের লোহাই দিয়া বিবিধ ব্যবস্থা নান করিয়া, আত্ম-অর্থাগমের উপায় করিয়া থাকেন। কিন্তু সে পথও বন্ধ হইতে চলিয়াছে। মূর্খ পুরোহিতদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও চরিত্র লোম্ব, লোকের বিশ্বাস কমিয়াছে, তাহারা পণ্ডতাবাসর কাণ্ডজামহীন পুরোহিতকে আর অনান্যসে বাটীর ভিতর বাতায়ন করিতে দিতেও সম্মত করেন না।

তাই সময় থাকিতে সাবধান করিয়া দিতেছি ও বলিতেছি যে পুরোহিত, 'ভুল সম্প্রদায় যদি আপনাদের ব্যবসা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, যদি সমাজে পূর্বের ভায় অগ্রতিহত প্রভাব অমূল্য রাখিতে বাসনা করেন, যদি লোকের মিকট হইতে ভক্তি ও সম্মান পাইবার প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে আব কালবিলম্ব করিবেন না, আপনাদের অককরময় তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া দেশের ও দেশের দুর্গতির আলোচনা করিয়া, সংগথে বিচরণ করুন, শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হউন, ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞাত করুন। আর তাঁহাদের কৃপায় দেশে জ্ঞানের বিস্তার হউক, দেশে শাস্ত্রময় ধর্ম-ভাবের উদ্বীর্ণনা হউক, হিন্দু-সম্প্রদায় ভগবৎ সম্পদের পরিচয় পাইয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করুক।

বন্ধ দুঃখ হয়। তোমাদের দুর্দশা অসুতব করিয়া প্রাণ বড়ই কাতর হয়। বলিব কি, কোন্ ব্যাপারের আলোচনা করিব? জীবনের যেনিক দিয়া দেখি, সমাজের যে অধ্যায় আলোচনা করি তাহাতেই অজ্ঞানতা অনিত ঘোর কুসংস্কারের ছায়া পড়িয়াছে দেখিতে পাই। জানি না, ভগবান কতদিনে তোমাদের স্মৃতি দিবেন, জামি নু। এ তাঁহার কেমন ধোলা। আমার মনে হয়, তোমরা এই কুসংস্কারপ্রাপ্ত হইয়াছ বলিয়া, ধর্মের প্রকৃত মর্ম ভুলিয়াছ বলিয়া মানব জীবনের বহু আদর্শ হারাষ্টয়াছ বলিয়া, আজ সংসারে শাস্তি নাই, সমাজে শৃঙ্খলা নাই। তোমাদের করষোড়ে মিনতি করিয়া বলি, অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কোন কর্ম করিও না, বা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া কেবল কড়কড়লি ভাবগিগের ব্যবসা রক্ষার প্রমাণে ভুলিও না। নিজে বুদ্ধিতে না

পার, যোগ্য ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রের মর্ম বুঝিয়া লইবে, তাহাতে যদি কেহ আগতি করে, তাহা গ্রাহ্য করিও না । কারণ সংকল্পে বাধা উপস্থিত হইলে তাহা কদাচ গ্রাহ্য নহে ।

তোমাদের দেশে এমন একটা কুসংস্কার আছে যে, গুরু যে মন্ত্র দিবেন, শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা শুনাইবেন, তাহা আর কাহারও নিকট বলিতে নাই । হায়, হায় ! ইহা অপেক্ষা অজ্ঞানতা আর কি হইতে পারে । গুরু যদি বেদজ্ঞ হইলেন, তাহা হইলে এ কথা বলিতাম না । কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে, অক্রেণীর মধ্যে বহু বহু কেবল স্তম্ভধারী ব্রাহ্মণ সম্ভান আছেন, তখন একথা বলিতে কোন আগতি বোধ করি না । কারণ মেরুণ গুরু যে মন্ত্র দিবেন, তাহা তো বেশ বুঝিতে পারা যায় । তাঁহারা মন্ত্রের স্বরূপ জানেন না, অথচ শিষ্যকে স্রীক্ষা দিতে যান । হৃৎকের কথা বলিব কি, অনেক স্থলে শিষ্যদিগের মুখে তনিয়াছি, গুরু কি মন্ত্র দিয়াছেন, তাহা তাহারা ভাল শুনিতে পায় নাই । আবার কেহ বা গুরু মুখ-নিঃসৃত অন্তর্জ লক্ষ শুনিয়া তাহাই ইষ্ট-মন্ত্ররূপে জপ করিতেছে । হায় ! হায় ! জন্মকাল ধরিয়া এইরূপ অন্তর্জ মন্ত্র জপ করিলে তাহার কি সফলতা হইবে ? এ মন্ত্র জপে কি তাহার রুচি হয় ? কেবল লোক দেখানো জপ করিতে হয় বলিয়া তাহারা জপ করে মাত্র । ইহা অতিরঞ্জিত নয়, সত্য কথা, যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি । একজন শিষ্য গুরু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর একবার আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিল যে, তাহার ইষ্টমন্ত্র জপে রুচি হয় না । তাহাতে আমি পরীক্ষা করিয়া জানিলাম যে, মন্ত্র অন্তর্জ হইয়াছে এবং তাহার ক্ষেত্রে সে বীজ সুপ্রকাশিত হইতে পারে না । অবশ্য এই ভ্রম সুশোধিত হইবার পর তাহার প্রাণে অপরূপ আনন্দ হইয়াছিল সে ভগবৎ চিন্তায় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়াছিল ।

কিন্তু তোমাদের দেশে এরূপ করিবার যো নাই । গুরু “রং” “বং” “কং” ইত্যাদি হটক একটা মন্ত্র দিয়া গেলেন ও যাহাতে কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করিয়াও গেলেন । অথচ জন্মে সেই বীজ ধারণে, তোমাদের কোন অক্ষুর উঠিল কিনা তাহার সন্দেহ লইলেন না । আর ভোমরাও মন্ত্র জপ করিয়া প্রাণে শান্তি পাও না এবং সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহসী হও না । ফল তাই হৃৎক, ফল তাই হাহাকার । যদি গুরু-লক্ষ্যদায় ঐকিকারী

বিবেচনা করিয়া অন্তর্দৃষ্টি বলে শিষ্যের জ্ঞানের পরিচয় লইয়া বীজ মন্ত্র দান করেন, তাহা হইলে কি তাহা ব্যর্থ হয় ? তাহা হইলে কি মন্ত্র জপে, শিষ্যের প্রাণে অশান্তির কণামাত্র থাকিতে পারে ? যদি শিষ্য গুরুকে অকপট-চিত্তে তাহার প্রাণের ভাব জ্ঞাপন করেও মন্ত্রের স্বরূপ-তত্ত্ব আনিয়া জপ করিতে বসে, তাহা হইলে তাহার জীবন যে কি আশঙ্কময় বলিয়া বোধ হইবে, তাহা ধারণা হয় না। সে তখন সেই পরম আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে ও আশঙ্ক্যহারা হইয়া দয়াল গুরুর উদ্দেশে বার বার জয়োচ্চারণ করিবে।

কবে আবার সোঁদন হইবে, কবে গুরু সস্ত্রাদায় আবার লোকসমাজ উন্নত করিবে ? আর কি হিন্দু-সম্ভান আপনার আত্মার সন্মতির জন্য লাগান্নিত হইবে না, পারলৌকিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে না। এতো হুদিনের সংসার, যেখানে চিরদিনের সম্বন্ধ তাহার ব্যবহার মনযোগী হইবে না ?

সহস্র পাঠকগণ ! বেদান্তরত্ন মহাশয়ের জীবনী এইবারে বিলুপ্ত ভাবে শীত্ৰই পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে, আমরা আর ভক্তিতে ইহা বাহির করিব না।

জ্ঞান ও ভক্তির একতা খণ্ডন।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য্য।)

—:—

কোন কোন সাধক পণ্ডিতের মতে জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু। অর্থাৎ, কোন কোন সাধক পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, জ্ঞান স্বতন্ত্র, ভক্তি ও স্বতন্ত্র। যে বিষয়টির লইয়া সাধক পণ্ডিতগণের মধ্যে উক্তপ্রকার মতভেদ চলিয়া আসিতেছে, মীমাংসার জন্য তাহার একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যিক। আলোচনার সামর্থ্য আমার নাই। লক্ষ্যশক্তিমানের শক্তিই আমার লক্ষ্য

জাগরুক হইরা, এই কাণ্ডে আমাকে প্রবৃত্ত করাইতেছেন। সুতরাং আলোচনার দোষ বা ভুল পাঠকগণই বিচার করিবেন।

‘যৎকৃতং যৎকরিষ্যামি তৎসৰ্বং ন ময়াকৃতম্।’

‘স্বয়া কৃতং হি ফলভুক্ তমেব মধুহৃদন ৭’

একণে দেখা যাউক জ্ঞান এবং ভক্তি এই উভয় শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় লভ্য অর্থ কি ? জ্ঞা—ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে টন্ প্রত্যয় করিয়া জ্ঞান শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা; “তত্ত্ববস্তুর” বস্তুার্থ উপলব্ধির নাম জ্ঞান। জ্ঞান একটি সাধন মার্গ। এই মার্গের অনুসরণ করিলে “তত্ত্ববস্তুর” উপলব্ধি হয়। ভজ—ধাতুর উত্তরে ভাববাচ্যে ক্রীলিঙ্গে জিন প্রত্যয় করিলে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ভক্তির অর্থ ভজন প্রবৃত্তি। “তত্ত্ব-বস্তুর” ভজনে (অর্থাৎ সৰ্বাস্তঃকরণে অতিপূজনে) যে “স্বাত্মবিকী” প্রবৃত্তি তাহার নাম ভক্তি। “স্বাত্মবিকী” বলিবার তাৎপৰ্য্য এই যে, তত্ত্ববস্তুর বস্তুার্থ উপলব্ধি হইলে, তাহাকে ভজনা না করিয়া থাকি যায় না। ভক্তি একটি সাধন মার্গ। এই মার্গের অনুসরণ করিলে “তত্ত্ববস্তুর” প্রতি ভজন প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান এবং ভক্তি ইহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় লভ্য অর্থ, ইহারা কি বস্তু, এবং ইহাদের অনুসরণে কি ফল, তাহা পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাতে এক কথার জ্ঞান এবং ভক্তির অর্থ এবং অনুসরণ ফলের বিষয় পার্থক্যই দৃষ্ট হইল। তবে বস্তু বস্তু নির্ণয়ে মাত্র একতা নিদ্রিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ উভয়ই সাধন মার্গ। বস্তুতঃ উভয়ে এক হইলেও অর্থ এবং অনুসরণ ফল যখন পৃথক হইতেছে, তখন উভয়কে সর্বাবস্থ-সিদ্ধ এক বস্তু বলা বাইতে পারে না।

একণে দেখা যাউক যে সকল পণ্ডিতগণ উভয়কে এক বলেন, তাহারা কোন্ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন ? তাহাদের যুক্তি এই যে,—‘স্বাধ্য বস্তু যখন এক, তখন জ্ঞান ভক্ত্যাদি সাধন মার্গ সহস্রটী থাকুক না কেন, আপাততঃ তাহারা কিকিত বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও স্বভাব্যাহানে পছঁছিয়া তাহাদের এ বিভিন্নতা আর দৃষ্ট হইবে না।’

উত্তম কথা! যুক্তি ও আপাততঃ মন্দ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে এই যে,—তত্ত্ব-

বহু নমুনা ভুক্ত: একরূপ হন, তাহা হইলে, যে মার্গের সহিত যে মার্গের বস্তই বিভিন্নতা থাকুক না তাহাদিগকে এক বলিতে হইবে। কিন্তু “তত্ত্ববস্ত” একমাত্র হইয়াও “বিভিন্নস্বরূপে” তাহার প্রতিভাত হওয়া বদ্যাপি “বস্তাধ” হয়, তাহা হইলে, এক এক মার্গ অনুসরণের দ্বারায় তাহার “প্রতিভাত” এক এক “বিভিন্ন স্বরূপের” উপলব্ধি হওঁয়া অসম্ভব নহে। তাহা হইলে মার্গভুলিকে এক বলা সুযুক্তি সম্ভব হইবে না। কোন এক মার্গ অবলম্বনে তাঁহাকে কোন এক “প্রতিভাতস্বরূপ” মাত্র অবগত হওয়া যায়; ইহাই বলিতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে তাঁহাকে (তত্ত্ববস্তকে) “প্রতিভাত জ্ঞান স্বরূপে” এবং ভক্তিমার্গ অবলম্বনে তাঁহাকে (তত্ত্ববস্তকে) “প্রতিভাত ভগবৎ স্বরূপে” অবগত হওয়া যায়। সুতরাং “তত্ত্ববস্ত” একমাত্র হইয়াও “বিভিন্নস্বরূপে” প্রতিভাত হওয়া প্রমাণিত হইলে, জ্ঞান এবং ভক্তির মার্গ দুইটি ও বিভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

একগে দেখা যাউক “তত্ত্ববস্ত” নিরূপাচন উপলক্ষে শাস্ত্র কি বলেন— শাস্ত্রকে আমরা সৰ্ব্ব প্রথমেই বলিতে দেখিতে পাই “নমন্যে বহুরূপায়” অর্থাৎ “তত্ত্ববস্ত” বহুরূপ। তাহার “বহুরূপবস্তের” প্রমাণ স্বরূপে সৰ্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তায় সৰ্ব্বত্র শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা;—

“বদন্তি ০ তৎ তত্ত্ববিন্দুভূতং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ং।

ব্রহ্মৈতি পরমাত্মৈতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

শ্রীভাগবত বলিতেছেন,—“যেটি অদ্বয় জ্ঞান (যথাৎ তত্ত্ববস্ত) তত্ত্ববাদীর নিকট সেইটিই ‘তত্ত্বরূপে’ জ্ঞানীর নিকট সেইটিই ‘ব্রহ্মরূপে’ যোগীর নিকট ‘পরমাত্মা’ রূপে এবং ভক্তের নিকট ‘ভগবানরূপে’ প্রতিভাত হন। অতএব জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ইহারা একটি একটি পৃথক্ মার্গ এবং ইহাদের অবলম্বনে ‘তত্ত্ববস্ত’ এক একটি পৃথক্ পৃথক্ “প্রতিভাত এক বিধ স্বরূপের” উপলব্ধি হয়। তত্ত্ববাদীগণ কোন মার্গ অবলম্বনে অদ্বয়জ্ঞানকে “তত্ত্ব” বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহার কোন আভাস এই শ্লোকে পাওয়া না গেলেও জ্ঞানাদির দ্বারায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতিভাত পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপের সকল গুলির উপলব্ধি তত্ত্ববাদীগণ যে আপন মার্গ অবলম্বনে করিয়া থাকেন, তাহার আভাস সুস্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে। তত্ত্ববাদীগণের মার্গ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

উক্তশ্লোকের দ্বারায় এই পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এই তিনটি মার্গ অবলম্বনে “তত্ত্ববৃত্তকে” ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান এই তিনরূপে জানা যায়। এবং তত্ত্ববাদীগণের মার্গ বাহ্যাই হউক সেই মার্গ অবলম্বনে অসংখ্য প্রতিভাত স্বরূপের সহিত “তত্ত্ববৃত্ত” বৃথার্থ স্বরূপ জানা যায়।

এবং তাঁহার “বহুরূপকে”র প্রমাণ স্বরূপে শাস্ত্রীয় ভূমি ভূমি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তবে ঐমত্যাগবত হইতে প্রমাণ স্বরূপে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া কাত্ত হওয়া গেল না। সে শ্লোকটি এট—

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাধ্যং পরম উদ্ধব।

ন সাধ্যায়ত্তলপ্ত্যাগো যথা ভক্তিশ্রমোজ্জ্বিতা ॥

ঐভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন—“হে উদ্ধব! যোগ, জ্ঞান, সাধ্যায়, তপ এবং ত্যাগাদি মার্গ অবলম্বনে আমি তাদৃশ সাধ্য হই না, আমাতে উজ্জ্বিতা ভক্তি মার্গ অবলম্বনে যেকপ সাধ্য হই। উক্ত শ্লোকের দ্বারায় ইহাই প্রমাণিত হইল যে,—জ্ঞানাদি বিভিন্ন মার্গ দ্বারায় আমি ব্রহ্মাদি “বিভিন্নস্বরূপে” প্রতিভাত হই। তদ্ব্যতীত ভক্তির দ্বারা আমি ব্রহ্মকে প্রতিভাত হই, আমি আমার অসংখ্য প্রতিভাত স্বরূপগণের মধ্যে সেই স্বরূপকে অধিকতর ভালবাসি। সুতরাং প্রমাণিত হইল জ্ঞান এবং ভক্তি এক বস্তু নহে। জ্ঞান স্বতন্ত্র। তত্ত্ববৃত্ত স্বভাবতঃ একরূপ হইয়াও বহুরূপে প্রতিভাত হন ॥ জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার একরূপ এবং ভক্তির দ্বারা আর একরূপ জানা যায়; জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির মধ্যাদা অধিক। যেহেতু জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি সাধ্য “স্বরূপ” জানা যায় না; কিন্তু ভক্তি দ্বারায় জ্ঞান সাধ্য—“ব্রহ্মকে” অন্যায়সে জানা যায়। ইহার শাস্ত্র প্রমাণ ভূমি ভূমি আছে; এবং বাহ্য ভাবে উদ্ধারে কাত্ত রহিয়ায়।

ভক্তির উপরেই হউক, কিম্বা ভক্তির অন্তর্গতই হউক কোন একটি শূনির্মূল একপ মার্গ আছে, যদ্বারা “তত্ত্ববৃত্ত” অসংখ্য প্রতিভাত স্বরূপের সহিত বৃথার্থভাবে জানা যায়। কিন্তু জ্ঞান ইত্যাদি অসংখ্য মার্গ অবলম্বনেও তাঁহাকে সে রূপে জানা যায় না। এক্ষণে তত্ত্ববৃত্তের বিকিত আলোচনা আবশ্যক হইতেছে। শাস্ত্রানুসারে “তত্ত্ববৃত্ত” বহুরূপ হইলে তাঁহাকে যে স্বরূপে বিনির্দয় করিবেন তিনি সেইস্বরূপকেই তাঁহার একমাত্র নিত্য সত্য মনোভব স্বরূপ

বলিয়া জ্ঞান করিবেন। অপর সহস্রটী স্বরূপ থাকিলে ও তিনি তাহা জানিলেন না, না জানার কারণ হুতরাং মানিবেনও না। কিন্তু শাস্ত্র বাকা না মানিয়া পথ নাহ। যিনি যে স্বরূপ অবগত হন, শাস্ত্রও বদ্যাপি সেই স্বরূপটিকে নিত্য সত্য সমাভন একমাত্র স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়া অপরগুলিকে একেবারে অস্বীকার করেন তবে উক্ত সাধকগণ আপন "দৃষ্টস্বরূপে" শাস্ত্রনির্দিষ্ট জ্ঞানের সহিত অধিকতর বিবর্ত হইয়া যুগী হইতে পারেন। কিন্তু তাহা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। কারণ কোন কোন শাস্ত্রের কোন কোন অংশে তৎ তৎ সাধক দৃষ্ট তৎ তৎ স্বরূপকে নিত্য একমাত্র স্বরূপ অঙ্গীকার করিলেও সকল শাস্ত্র সর্বাংশে তাহা কখনই অঙ্গীকার করেন না। এই কারণে অধিকাংশ সাধকগণ আপাততঃ আপন আপন "হৃদস্বরূপে" ক্রিয়াকালের জন্য স্থির বিবর্তের ন্যায় প্রতীত হইলেও নানা শাস্ত্রের নানাংশে বিভিন্ন নির্দেশ লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই বিচলিত হইতে দেখা যায়। তাই সাধকশ্রেষ্ঠ "রাঘ্ব এসাদেন্দ্র" মুখে শুনা যায়— "জাননায়ে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়, কাল মেয়ের বরণ করিয়া ধারণ (শ্যামা) কখন কখন পুরুষ হয়।" "জগদ্বতার "স্বরূপটী" যে যথার্থ "তত্ত্ববস্তুর" একমাত্র নিত্য সত্য স্বরূপ কোন কোন শাস্ত্রের কোন কোন অংশে তাহা স্বীকৃত হইলেও অন্যান্য শাস্ত্রের অন্যান্যংশ দৃষ্টে সাধক বিচলিত হইলেন। এহকপে বিচলিত হইয়া মৌভাগ্যহীন সাধকগণ "তত্ত্ববস্তুর" স্বরূপ সম্বন্ধে দুইটি অতিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম—তিনি বহুরূপীয় (গিরগিটী জাতীয় জন্তু বিশেষ) ভায়। অর্থাৎ মুহুঃমুহুঃ এক এক স্বরূপে পরিবর্তিত হইতেছেন; তাহার দৃষ্টিতে যে স্বরূপটী গড়িতেছে, সে সেইটিকে তাহার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। কিন্তু যে সাধক একান্তে বহুৰূপ বলিয়া তাহার সকল গুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি তাহাকে "একমাত্র স্বরূপে" নির্দেশ না করিয়া "বহুরূপ" বলিয়া নির্দেশ করেন।

দ্বিতীয়—"তত্ত্ববস্তুর" বাক্য মনের অগোচর। হুতরাং সাধকগণের মনে তাহার যে যে স্বরূপের উদয় হয়, সে গুলির কোন একটীই তাহার স্বরূপ অহে। জীব তাহার স্বরূপ জানিতে পারে না।* স্বরূপ লইয়া যে বন্দু সেটা অলৌক। হুতরাং মনে মনে তাহার কোন একটা স্বরূপ কল্পনা না করিয়া তাহাকে নিম্ন-লিখিত মস্ত্রে প্রণয় ও স্তুতি করাই যুক্তি সম্মত।

"তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোহসি মহেশ্বর।

বাদৃশস্তব্ধং স্বহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ ॥

ত্রেমশঃ—

* তাহার রূপায় জীব সকলই জানিতে পারে। (ভক্তি-বিশ্বাদক।)

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের হোলী ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত মধুসূদন সাহা দাস ।)

—:০:—

কিশোরী সহিত খেলে কিশোর রঙ্গিণী,
আজি “হোলী” মহোৎসবে, মাতিয়াছে গোপী সবে,
আবীর লইয়া খেলে করি কত তর্জিয়া,
হৃৎকের তরঙ্গে সবে উঠিছে নাচিয়া ।

রতন আসনে শোভে কিশোরী কিশোর,
চৌদিকে সঙ্গীগণ, নাচে গায় অতুলন,
বাজায় সায়ঙ্গ বীণা ভাবেতে বিভোর,
প্রেমানন্দ বারিধীর নাহি সীমা গুব।
আবীর কুমকুম ফিকে প্রিয় সখীগণ ;

পিচ্কারী আনে কেহ, ভুলিয়াছে দেহ গেহ,
সুগন্ধি সলিলে গুলি বিবিধ রঞ্জন,
লক্ষ্য করি তুহু’ অঙ্গে ছুড়ে ঘন ঘন।
ললিতা বিশাখা আর হুচিহ্না চম্পকা ;

নিজ নিজ দল লয়ে, ভজে কান্ধ বিগময়ে,
জব বাধে ধ্বনি দিয়া মারে আঁকা বাঁকা,
আবীরে রঞ্জিত আজি বৃন্দা তরু শাখা।
কোন সখী, নানা তুল করিয়া চবন ,

আনন্দে গাঁথিছে মালা, সাজাইতে প্রাণ কালী,
কেহ বা পরায় গলে সম্মিত আনন,
জব বাধে ধ্বনি উঠে পুরি বৃন্দাবন ।

হেন তাগ্য কবে মোর হইবে উদয় ;
সখীর অঙ্গুলা হ'রে, তজিব দৌহারে যেয়ে,
দেখিব সে "হোলী" খেলা অতি সুখময়,
ভক্তগণ কৃপা করি তাও পদাশ্রয় ।

অকিঞ্চন কৃষ্ণ-ভক্ত ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য ।)

—:~:—

ধন্য তুমি ভক্ত বর, ধন্য ধরাংলে,
তোমার মহিমা বর্ণে হেন সাধাকার ?
প্রাণিত বদন বক্ষ তব, প্রেম জলে,
ভুবন-বিমুক্ত-কর, — স্বরূপ তোমার ।
সংসারের শত কষ্ট অম্লান বদনে,
সহিতেছ; বহিতেছ, কত দুঃখ তার,
তথাপিও দুঃখ নহে; শ্রীকৃষ্ণচরণে
অপিয়াছ কর্ম ফল, বস আপনার ।
বিষয় বিপত্তি বাধা করি উলঙ্ঘন,
আনন্দধারের পথে চলিয়াছ হায় ।
ভজন কণ্টক বিহ্ন, কষ্ট অগণন,
অনায়াসে অবিরত, ঠেলিয়া হুপার ।
প্রেম পরমম জ্যোতি মাধা শ্রীবদন,
সতত তোমার সাধো । দোষ হয় জ্ঞান,
এ রাজ্যের লোক নহে, তুমি এক জন,
শোকে তাপে চিত্ত তব নহে পরিস্রান ।
লাঞ্ছন দারিদ্র্য আসি তোমার উপর,
নিরন্তর করিতেছে কত অত্যাচার,

যোগ শোক জরা আদি অরাতি মিকর,
 লইতেছে পদে পদে পরীক্ষা তোমার।
 অভিমনি, অহঙ্কার, কায়ে জামি কব,
 কিছুই জাননা তুমি, এমনি সরল।
 ভীতি শূন্য শান্তি মাধা তোমার হৃদয়,
 তোমার আরাধ্য সাধ্য তরতি বেবল।
 নগণ্য জঘন্য অতি নীচ মূর্থ জন,
 কেহ যদি ভাবে, তুমি রুট নহ ত'ত্তে ;
 "তনাদপি" শ্লোকে যত ভক্তের লক্ষণ,
 প্রত্যেক করিহু আজি, সকলি তোমাতে।
 সকল প্রাণিকে দেখ, আপনার সম,
 সকল মানবে তব সম সমানর,
 বৈষ্ণবের মাহি কর জোঠ লঘু ক্রম,
 সকলি সম্বট সদা তোমার উপর।
 মাহি তব শাস্ত্র পাঠ, তেজ কোলাহল,
 মাহি জাম তর্ক যুক্তি বুধা বাক্য ব্যয়,
 প্রেম ভক্তি মাধা তব চিত্ত নিরমল,
 সাধু গুরু বৈষ্ণবের পদ তবাক্ষর।
 অটুট বিশ্বাসে পূর্ণ তোমায় লক্ষয়,
 অনুরাগ, মিষ্টা শান্তি আনন্দ আধার,
 তজনের রস জরা, হ্রজ ভাবনর,
 জ্যোতির্ময়, দিব্যধাম, শূন্য অহঙ্কার।
 সম্পদ সন্তম কিবা কামিনী কাকসে,
 কস্মিন্তে পারে না তব চিত্তকে চকল,
 রিপয় খাটেনা বর্প তোমায় সদলে,
 যুগে মাহি অম্য কথা, শুধু "হরিবোল।"
 বিলাস খাসনা রসে নহে কর্তৃ রত,
 চিন্ময় আনন্দ বল, বপের বেরানে,

প্রমত্ত, নির্মূল চিত্ত, তোমার সত্তা।
 প্রাণ মাতা দিবানিশি, হরিগুণ গানে।
 দৈন্য-বিনয়ের ধনি তুমি মহাশয়,
 তোমার বচনে ক্ষরে অমৃতের ধার,
 সর্বদা মনেতে তব অপবাধ ভয়,
 ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাধা কিঙ্করী তোমার।
 চিনেনা তোমাকে কেহ, স্বদেশে বিদেশে
 করে না জিজ্ঞাসা কেহ, অতিহীন জানে,
 কে জানে মঞ্জিয়া আছি, তুমি কোন রসে,
 কে জানে রয়েছে তুমি কি রূপ দেখানে।
 নিবিড় পল্লীর এক নিভৃত কোণেতে,
 তোমার বসতি অতি নগণ্য প্রদেশে।
 না চিরুক লোকে, অপচর কিবা তাতে ?
 না আত্মক কাঁচে কেহ, কিবা যায় আসে ?
 সুরাসুর যক্ষ রক্ষ, কিংব চারণ,
 বাধা করে যদা দাঁর চরণ পঙ্কজ,
 তোমার হৃদয় মাঝে সে আশ্রয় ঘন,
 বলিতে বিজয় দন্য তোমার জীবন।

শ্রীগৌরাজের মোহন রূপ।

গীতিকার।

(লেখক—শ্রীযুক্ত রমিক নাল দে।)

—:—

হৃদয় নির্মূল হ'লে, কুটে এ মোহন রূপ, সে কি—রূপ ?

না মিলে তুলনা।

মনোময় রূপ হুই, বিরাজে মনের মাঝে, এ কেণ্ডো

চিন্তা, রূপ, নহে ত কোন।

রাধা-ভাব-কান্তি যুত এ যে কপ ফুলিত,
 ঝলক ঝলকে সুধা বর্ষে ।
 চিত্তের মালিঞ্চ ছুটে, অন্তর কুটিয়া উঠে,
 মায়ায় অতীত ভাব-স্পর্শে ॥
 গম্যণ আলোক করা, দিব্য সুসমায় তরা,
 ওই রূপ কি লাভ্যময় !
 ভাবহ্যাতি ছুড়াইয়ে, বিয়া দেয় জুড়াইয়ে ;
 নবযুগে নব ভাবোদয় ॥
 ঐরাধাভাবের হ্যাতি—সম্মিত কপ-ভাতি,
 ভাবকের চিত্তময় ধন ।
 সদানন্দ প্রেমধন, এ কপের এক কণ,
 অনুভবে প্রীতি অনুলন ॥
 মনের মানুষ-কপে “পাখিল মানুষ” মোর,
 আয় ছুটে, আয় ওরে আয় ।
 ফিলানে ভাব-ভরস, হৃদয়ে কবকু রস,
 ডুবে যাই প্রেমের বন্যায় ॥
 নব-রঙ্গাবন-মাঝে, রমনীর নব মাঝে,
 এ কপ্ ফুটুক অন্তরেতে ।
 মিরূপন-রূপ-ধনি, মানস প্রতিমা ধান্ধি,
 রাখি যেন অতি ‘ষতনেতে’ ॥

“শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ‘ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ’”

(লেখক ।—শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন ।)

—:—

ঐশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গৌরীলা-সমুদ্রের মহনোখিত অমৃত । ত্রিভাষ
 জালায় অগিত জীবের পক্ষে উহা মহামৃত স্বরূপ । কত ভবঘূর জীব এই
 অমৃত পান করিয়া জমর হইয়া গিয়াছে ও বাইতেছে । চরিতামৃতের প্রত্যেকটি

কথাই মূল্যবান ও উপাদেয়। বহুমূল্য মর-কতের সহিত তাহার তুলনা হয় না। যিনি না পড়িয়াছেন, তাঁহাকে বুঝান যায় না। হৃদ্ধ দেখিয়া যেমত তাহার মাধুর্য্য আশ্বাদন করা অসম্ভব, সেইরূপ চরিতামৃত না পড়িয়া আমার এই সামান্য লেখার দ্বারা রসাস্বাদন করা ততোধিক অসম্ভব।

শ্রেমই এই চরিতামৃতে বর্ণিতব্য বিষয়। শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু যে প্রেমের বন্যায় বঙ্গদেশ ভাসাইয়া ছিলেন, চরিতামৃতে তাহার একটি বখাবথ আলগা উঠিয়াছে। ফটোগ্রাফের ন্যায় তাহা অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। অশরীরি প্রেম একবার মূর্তি ধারণ করিয়াছিল। লোভাগ্যের বিষয় তাহা আবার ভারতের কোমল কলিঙ্গা স্বরূপ আমাদের এই বঙ্গদেশে। সেই মূর্তি, মান মহাপ্রভুর প্রেম-মূর্তি এই চরিতামৃতে অমৃত প্রলেপ দিয়া অঙ্কিত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট শিল্পী যেমন সুনিপুন ভাবে প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করে, চরিতামৃতকারও শ্রীগোরাঙ্গের দিব্যোন্মাদ ও প্রেমোন্মাদ বিরহের দশম অবস্থা ও উৎকর্ষের শেষ দশা যেমন ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেম-মূর্তিটা সাক্ষ্য-আকাশের তারকা-স্বরূপের ন্যায় বেশ জুটিয়া উঠিয়াছে, প্রেমেতে অঙ্কিত মূর্তি, আলিঙ্গন করিলেও প্রাণ জড়ায়। চরিতামৃতে শ্রীগোরাঙ্গদেবের যে প্রেম-মূর্তি তুলি দিয়া আঁকা হইয়াছে, সেই মূর্তির পদ স্পর্শ করিতে পারিলে আমরা ধন্য হই। এ প্রেম পণ্য দ্রব্য নহে। দানই এ প্রেমের ধর্ম্ম। দুদানেই এ প্রেমের সূত্র। প্রতিদান চাহিয়া কেহ কখনও এ উদ্যানেন্দ্র প্রবেশ করিতে পারে না। ফলের সৌরভ বিনামূল্যে বিতরিত হয় চাঁদের জ্যোৎস্না, মলম সমীরণ ক্ষুদ্র বিক্রমের সামগ্রী নহে। প্রাতঃ সূর্য্য রাস্ম শীতকালে কত মধুর। কিন্তু শাল বনাতের মত তাহার কোনও মূল্য নাই। বনের কুন্দ বৃক্ষ, জাতি, গোলাপ সুন্দরীগণ হইতে কম মূল্যবান নহে। কিন্তু উহার পণে বিক্রয় হয় না। এ প্রেমও তেমনি অমূল্য। স্বপ্রাণিষ্ঠের ন্যায় প্রেমিক কবি প্রেমভবে উন্নতভাবে যাহাকে পাইবার জন্য, এমন সুখের সংসার পরিত্যাগ করিয়া, যমুনার নূহ তরঙ্গ-তাক্ত নীপ তরু-মূলে শ্যাম তমলারত কুঞ্জে বসিয়া দার্শনিক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহার সপক্ষে এই হৃদ্ধ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

হায় ! বঙ্গের সেই এক দিন শুভ দিন ছিল, যেই দিন বঙ্গ ভাষার চরিত লেখার হুজুপাত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর মহিমাধিত আদর্শ হইতেই বঙ্গ সাহিত্যে চরিত লেখার হুজুপাত হইয়াছে। সেকালে চরিতাখ্যানগুলি সংস্কৃতের কোলে ঘুমাইতে ছিল। তাহাদিগকে বঙ্গ ভাষার হাঁচে ফেলিয়া গড়িতে তখন পর্যন্তও কোন বাদ্গালী চেষ্টা করে নাই। ভাষা চিরদিনই ভাবের নিকট পরাজিত। তাহার প্রেমের উদ্দাম দৃশ্য দেখিয়া বাদ্গালী আত্ম বিস্মৃত হইয়াছিল। তাই প্রথমতঃ বৈষ্ণব বাদ্গালী কবিগণ মহাপ্রভুর সেই আদর্শ প্রেমময় পুণ্য জীবন বঙ্গ ভাষায় লিপি বদ্ধ করেন। যেহেতু মানুষ স্বপ্নন ভাবে ভ্রম্য হইয়া যায়, তখন সে বিদেশী ভাষার ‘ভাসা ভাসা’ বুলিতে মনের সম্পূর্ণভাষ কুটাইতে পারে না। তাই বাদ্গালী কবি মহাপ্রভুর আদর্শ লইয়া বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্ট করিতে লেখনী ধরিলেন। সেইদিন কি বঙ্গ ভাষার শুভদিন নহে ?

দীনা বঙ্গভাষা বেঙ্গল দেশের অধিকৃত মহাপ্রভুর প্রেম-চরিত-ধারা বহন করিয়া গঙ্গা পারার ন্যায় ভিলা হইয়াছেন। তাই “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” লেখক শ্রীমুক্ত দ্বৈনন্দ চন্দ্র নেন মহাশয় লিখিয়াছেন “এই গীতি কাব্য যদি কুমার ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাহিত্য প্রদর্শনাত্ত দেখাইতে পারি, তবে আত্মগবিরার রাস্তা আত্মবিমর্ষের কথা শুনাইয়া অগংবাসীকে মুগ্ধ করিতে পাবি, সন্দেহ নাই।”

এই দার্শনিক তত্ত্ব মঙ্গলিত প্রেমময় মহাকাব্যের রচক ভাগ্যদান বঙ্কিম কবিরাজ ঠাকুর। তিনি ১৮৯২ খঃ বঙ্গমান জিলার অন্তঃপাতী ঝাংটপুর নামে বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতা ভগীরথ অন্ন বয়সে কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস নামক দুই পুত্র বাধিয়া পরলোক গমন করেন। মাতা শুনন্দা এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রদ্বয়কে লইয়া বড় বিপদে পতিত হইলেন। শামীব মৃত্যুর পর কতিপয় দিবস পরে শুনন্দা দেবীও কালগ্রাসে পতিতা হইলেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস পিতৃশ্রমার গৃহে প্রতিপালিত হন।

আজীবন কষ্ট বুকে করিয়া তিনি দরিদ্রতার কোলে লালিত পালিত ও সংবন্ধিত হইতে লাগিলেন। প্রকৃতি তাঁহাকে যেন বড় ঘৃণায় চক্ষে দেখিয়াছেন। সংসারে কোনও দিনই তিনি সুখের মুখ দেখেন নাই। সংবৎ চিত্ত কৃষ্ণদাস

দ্বার পরিগ্রহ করিয়া তবে সুখের আশা করিতে পারেন নাই । সুতরাং আজীবন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাসের জীবন শরৎ-কমলবৎ নির্মল ও পবিত্র ছিল ।

এই সময়ে শ্রীনিরঞ্জনপ্রভু কামটপুর গ্রামে আগমন করেন । আজন্ম হুঃখী কৃষ্ণদাস নিরঞ্জনপ্রভুর উদ্দায় প্রেম ও ভক্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন । এই সংসার হইতে উৎকৃষ্টতর অন্য এক সংসারের চিত্র তাঁহার চক্ষের উপর ফাটিল সুতরাং তিনি নিরঞ্জনপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধামবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন । নিরঞ্জন কৃষ্ণদাস ভিক্ষারূপে দ্বার পাথের সংগ্রহ করিয়া শ্যামসুন্দরের কোন নিকেতনে পৌঁছিলেন ।

সেইস্থানে পৌঁছিয়া তিনি রূপ সনাতন, জীব, রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি গোপালী প্রভুগণের নিকট শ্রীমদ্ভগবতাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । তাঁহার নির্মল চিত্তে ভক্তির কথা অতি পরিস্কৃষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়াছিল । সেকালে বৃন্দাবন বাসী বঙ্গালী বৈষ্ণবগণ এক হইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে “শ্রীচৈতন্য ভাগবত” পাঠ করিতেন । কিন্তু উহাতে শ্রীগৌরোদয় মহাপ্রভুর অন্তলীলা বিশদভাবে বর্ণিত না থাকায় বৃন্দাবন প্রবাসী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মহাপ্রভুর অন্তলীলা বিশদভাবে বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন । এই সময়ে বৃদ্ধ কবিরাজ ৭৬ বৎসরের গুণী অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে তিরোধামের অবশিষ্ট দিনগুলি গণিতে ছিলেন । এই বিষম অনুরোধে তিনি একটু গোলমালে পতিত হইলেন ।

পুত্রারি আসিয়া গোবিন্দজীউর আদেশমাত্র হস্তে দিয়া গেল । এই অত্যাশাধ্য ভগবৎ কৃপা যেন বৃদ্ধকে যুবকের ন্যায় শক্তিশালী করিয়া তুলিল । তিনি আর আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিলেন না ।

কিন্তু কবিরাজ এই সময়ে দৃষ্টি শক্তি হারািয়া ফেলিয়াছেন । লিখিতে হস্ত বারং বার কাম্পিত হয় । অশরীরি জগা আসিয়া তখন তাহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি শিথিল করিয়া দিয়াছে । এই অবস্থায় তিনি যে গ্রন্থ লিখিয়া যাইতে পারিবেন এমন তাঁহার স্মরণ ছিল না । প্রতিপদে পদে তিনি নিরাশার তীব্র বাতনানুভব করিতে লাগিলেন । অবশেষে এই অমায়িক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ৮৫ বৎসর বয়সে ৯ বৎসরের সমবেত পরিভ্রমের ফলে এই গ্রন্থ সমাধা করেন । এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সংস্কৃত নানাবিধ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ

স্বরূপ যে শ্লোক উঠাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে এসংলা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। (অনুসন্ধানী, ৫ম সংখ্যা) আমরা তাহা নিয়ে লিখিয়া দিতেছি।* এতদ্বিতর তাঁহার সুরচিত শ্লোকও গ্রন্থ মধ্যে অনেক সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সে এতগুলি গ্রন্থ পর্যালোচনা করিয়া এইরূপ দার্শনিক ও তত্ত্ব নির্ণায়ক গ্রন্থ রচনা করা বর্তমান শিক্ষাভিমাত্রী পণ্ডিত মণ্ডলীর পক্ষেও বিজ্ঞাবহ স্বতন্য সম্ভব নাই।

এই গ্রন্থে বৈষ্ণবোচিত কেমন বিনয় ও দীনতা, ভক্তির কেমন নির্মূল ব্যাখ্যা, প্রেমকে কেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক উন্নত প্রাণীতে হৃদয়বদ্ধভাবে সংযোজিত করার নৈপুণ্য প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই বহুভাগ সমলঙ্কৃত প্রচৈতন্য চরিতামৃত এক অগ্নীয় বস্তু। আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি এই চরিতামৃতের অমৃত-ধারা যিনি একবারও পান করেন নাই। তাঁহার

* (১) অভিধান শব্দভাণ্ডার (২) অমর কোষ, (৩) আদি পুরাণ (৪) উত্তর চরিত (৫) উজ্জ্বল নীলমণি, (৬) কাব্য প্রকাশ (৭) কৃষ্ণ কর্ণামৃত (৮) কৃষ্ণ সম্ভর্ড (৯) কৃষ্ণ পুরাণ (১১) ক্রম সম্ভর্ড (১২) গুরু পুরাণ (১৩) গীত গোবিন্দ (১৪) গোবিন্দ লীলামৃত (১৫) গৌতমীয় তন্ত্র (১৬) চৈতন্য চন্দ্রোদয় মাটিক (১৭) জগন্নাথ বসন্ত নাটক (১৮) দানকেলি কোমুদী (১৯) দারদ পকয়াত্র (২০) নাটক চন্দ্রিকা (২১) নৃসিংহ পুরাণ (২২) পদ্মাবলী (২৩) পঞ্চদশী (২৪) পদ্ম পুরাণ (২৫) পাবিনি স্তব (২৬) বরাহ পুরাণ (২৭) বিষ্ণু পুরাণ (২৮) বিষ্ণু মাধব (২৯) বিশ্ব প্রকাশ (৩০) বীর চরিত (৩১) বৃঃ গৌতম তন্ত্র (৩২) বৃঃ দারদীয় পুরাণ (৩৩) ব্রহ্ম সংহিতা (৩৪) ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ (৩৫) বৈষ্ণব ভোবিনী (৩৬) (৩৭) গীতা (৩৮) ভক্তি রসামৃত সিদ্ধি (৩৯) ভক্তি সম্ভর্ড (৪০) ভক্তি লহরী (৪১) ভাবার্থ লীপিকা (৪২) ভারতী (৪৩) ভাগবত পুরাণ (৪৪) ভাগবত সম্ভর্ড (৪৫) বলমানসতত্ত্ব (৪৬) মহাভারত (৪৭) মহু সংহিতা (৪৮) বসুনাচার্য কৃতামলক মন্ডার প্রোত (৪৯) রামায়ণ (৫০) রঘুবংশ (৫১) রূপ গোষ্ঠামীর করচা (৫২) লঘু ভাগবতামৃত (৫৩) ললিত মাধব (৫৪) ক্ষম মালা (৫৫) স্বাভব-তন্ত্র (৫৬) গোবিন্দদাসের করচা (৫৭) সাহিত্য দর্পণ (৫৮) হরিকৃষ্ণ বিলাস ইত্যাদি।

এখনও বঙ্গভাষার সারস্বত তীর্থের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া রসাহুত্ব করিতে অনেক দেৱী আছে।

বৃন্দাবনের যুগ্মল সমীরণ, কুঞ্জবনের মধুপ গুঞ্জিত কুমুমের মৌরত ও ভ্রমর পুঞ্জের 'রাধা শ্যাম' রব, যমুনার তরলোথিত উজান-প্রবাহ ভাবুক রসিক কবি কৃষ্ণদাসের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের এক অভিনব ছায়া পাত করিয়াছিল।

সেই নিখুঁত যমুনা তটে ভক্তির অবতার প্রেমের দেবতা জীতৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমময়ী মুক্তি বেকপ নিখুম সুন্দর ভাবে তাহার চন্দ্রে মুদ্রিত হইয়া^৬ ছিল, কবির কাব্যে তাহার একটা অতি সুন্দর প্রাতিচ্ছায়া উঠিয়াছে।

ক্রমশঃ।

সমালোচনা।

(গাগল রাধামাধব) (প্রথম খণ্ড)

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর)

(পূর্ব প্রকাশিতেরপর)

—:—

পাঠকবর্গ গাগল মাসুকের এই কয়েকটি কথা প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন—“কলিকালে পতিত আতি হুখে থাকিবে এবং পুণ্যবান্গণ বিধ্বস্ত হইবেন।”—এই উপদেশবাণী যেমন অদ্ভুত ভেমন সুন্দর। অদ্ভুত, যেহেতুক “কলিকালে” কেন সর্ব্বথুগেই পতিত আতি ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া হুখী। আরো অদ্ভুত, যেহেতুক “পুণ্যবান বিধ্বস্ত হইবে”—পাপীর একবারে উল্লেখ নাই। আমাদের এইটি মনেতে হইবে যে পাপীর বিনাশ প্রত্যক্ষ, পুণ্যবানের বিনাশ পরোক্ষ। পাপীর নরক লাভ বিনাশ, পুণ্যবানের স্বর্গলাভ কালে পতনের হেতু। সুতরাং পাপীও পুণ্যবান উভয়েই বিধ্বস্ত হয়, কেবল দীন দীন কাকাল ভগবানের দয়াপাত্র প্রিয়পাত্র হয়। সেই ভগবৎপ্রিয় ভক্তের বিনাশ নাই। এই পরোক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবটি উহার হৃদয়। স্বস্তির ভারতে

কেন সমস্ত অগতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার না হইলে জীব অহঙ্কারের কালানলে উৎসন্ন হইবে সন্দেহ নাই। পাগল মানুষের এই অমূল্য উপদেশ অনুসরণ করিবেন। আর একটা উপদেশ বড়ই সমরোচিত। মাদৃশ অধর্মেরও প্রাণের কথা—“যাহাদের শ্রীবিগ্রহসেবা আছে তাহাদের দুর্দশা দেখিলেই বুঝিবেন।” বস্তুতঃ আমরা দেখিতেছি শ্রীবিগ্রহ সেবকগণের দুর্দশার আর সীমা নাই। ইহার মৌলিক কারণ অপরাধ। শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা দ্বারা শত সেবাপরাধ জাগ্রা থাকে। অপরাধ সাধ করিয়া কিনিয়া আনিবার প্রয়োজন? শ্রীমূর্তি-সেবা যেমন অমৃত তেমন বিষ। অতএব এ বিষয়ে সবারই সাবধান হওয়া আবশ্যিক। ইদানীং আমরা মূর্তি প্রতিষ্ঠার এক দারুণ রোগ দেখিতেছি। এ সিদ্ধান্ত ভুলিলে চলিবেন। যে “পতিতই শ্রুখী”—শাস্ত।

বর্তমানে ভারতবর্ষ বিদ্বানের উদ্যান।—কত না হিম্মোল খেলিতেছে! তাঁহারা নাটক নভেল কাব্যাদি পড়েন--শেক্সপিয়র পড়েন, মিস্টন পড়েন, কালিদাস পড়েন, বঙ্কিম পড়েন, আরো সকল কত কি পড়েন, আর হুখে ডুবির বসেন এবং গ্রন্থকারের মস্তকে কত বা “বাহবা”-চন্দন মাখা পুষ্প বর্ষণ করেন। “কিন্তু একখানা বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করুন” এ অনুরোধ যেন কাণে বিষ ঢালে। কি জেদ, হোক না সে অমৃতপানাবার, তবু স্পর্শ করিবে না,—একটা যেন বসনের মুণ বস্ত্র স্বরূপ উদ্‌গার উছলে। দেবগণের ক্ষীরোদ মণ্ডনে চল্লি, অমৃত, ধ্বস্তরি উঠিয়াছিল; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষীরোদ সিঁদু ধকন, দেবের দেব শ্রীবৈষ্ণবগণ তাহা মগ্নন করিয়া শ্রীগ্রন্থ শাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন। উহা ষথার্থ-অমৃতনিবি, উহার রসাপাদে জীব অমর হয়, আনন্দবিভোর হয়। হৃদীতল হয়, তবরণে মুক্ত হয়। তাই বলিতেছি, উচাতে তাঁদের বিরণ কত কলমল করিতেছে, কত অমৃতধারা উছলিতেছে, কত ধ্বস্তরি সভা মিলাইয়াছে। ক্ষীরোদ মগ্নন ব্যাপারে দেবগণ মধ্যে অধাক হইয়াছিলেন শ্রীবিষ্ণু। বৈষ্ণব-গণের শাস্ত্রসিদ্ধি মগ্ননে অধ্যাক স্বয়ং শ্রীশ্রীমহাশ্রু। ক্ষীরোদগির অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলেন দেবগণ, দৈত্যগণ বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আধুনিক সময়ের পুণ্যবান বিদ্বানগণ শ্রীবৈষ্ণবগ্রন্থ সিদ্ধির দুর্লভমিত সত্ত্বোণে বঞ্চিত। যিনি জমিবা অমৃত পান করিলেন না, তিনি উৎসন্ন হান বৈ কি? শ্রীশ্রীমোর-নিত্যানন্দের উপদেশ ব্রহ্ম মধু রসি পুণ্যধানে চিত্তে প্রবেশ করেন। তাহাদের

চিন্তা ভাবসমৃদ্ধিই থাকিয়া যায় এবং আঁধারে বিধ্বস্ত হয়। অগ্নিয়া যে উত্তম সামগ্রী ভোগ করিতে পার না, সে অবশ্য,—তাহার জন্ম নিরর্থক—সে, প্রকৃতই “অগ্নিয়া না মৈল কেনে ?”

গঙ্গার যেমন বহুশাখা ও উপনদী আছে, হিন্দুধর্মও তাদৃশ নানামত, নানানীলা দ্বারা পরিমণ্ডিত। সকল শাখাও উপনদীর মুখ্যা যেমন গঙ্গা, সেইরূপ সমস্তও সর্ব-লীলার মূলসত্য পরিপাক স্বরূপ বৈষ্ণবধর্ম। বিভিন্ন মতসমূহের সমীকরণাক্রম বিধানেরা ধাঁধায় পড়িয়া যান। এই গোলক ধাঁধায় নিপতিত উৎসন্নাবস্থ জীবের কল্যাণ চিন্তা করিয়াই শ্রীশ্রীগৌরানন্দদেব নানা দেবদেবীর পূজোপাসনার উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিয়া * এবং নানামতের সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ “শ্রীনাম” প্রচার করাইয়া এক অপূর্ব চিন্তচমৎকারকারী বেদিক বিজ্ঞানময়, সত্যময়, প্রেমময়, রসময় ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ করিয়া গিয়াছেন। জাতীয়তার, একতার, মনুষ্যতার ও হৃদয়ের একমাত্র নিদান এই ধর্ম। হিন্দুধর্ম এক মন্দির দোকান। উহাতে নানাবিধ সুমিষ্ট সামগ্রী সুসজ্জিত আছে। বালক দোকানে প্রবেশ করিয়া অবাকু প্রপ্রতিভ হইয়া চাওয়া থাকে, কোনটির পরিচয় করিতে পারেনা। কোনটি ধাবে, কোনটি না ধাবে এই সুমস্যার ভুলে গোল পরিয়া সারবস্তুর রসাবাদে বঞ্চিত হয়। -হয়তো বালক অসার সামগ্রী দিয়া পেট ভরিয়া কেলে সার সামগ্রী পরিয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভু তাই দয়া করিয়া সর্ব-সামগ্রীর রসস্বরনির্ব্যাস লইয়া এক রসামৃত খণ্ড তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। পসারের মোটেই ঐ এক সামগ্রী, যে চোকে সে পায়, খায়, আনন্দে নাচে গায়। জীবনের অঙ্গসময়ে অপার চূড়ান্ত লাভ! পূণ্যবানেরা তাহা একবার ভুলেও চাঞ্চিবার চেষ্টা করিবে না। কেবল নানানৈবেদ্যে ঠৌক দিয়া, পরধর্ম যাজন করিয়া বাহাহুর্নি করিবে।—এর চেয়ে আশ্চর্যকথা আর কি হইতে পারে।

একে বর্ণভেদ, তাহাতে বেশভূষা ভেদ। শ্রীগৌরানন্দ ঠাকুর একটি মাত্র ভজবেশ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। শিখাটি বৈদিকী; কিন্তু এখন

* ইহাতে যেমন কেহ মনে না করেন যে, শ্রীগৌরানন্দদেব দেবদেবী পূজার বিরোধী ছিলেন। কলিজীব অপারক-বলিয়াই তিনি অত্র কঠোর সাক্ষ্যের পরিবর্তে মাঝ মাঝে প্রচার করিয়াছেন। (ভঃ পঃ ৭)

ব্রাহ্মণেও উহা অসত্যতার চিহ্নধারণ বলিয়া মনে করেন। মূলকথা মনগড়া ধর্ম্য পরিত্যাগপূর্বক একবিধ ধর্ম্য, একবিধ ধর্ম্য ধারণ না করিলে জীবের উচ্ছেদ নিরাকরণ অসম্ভব হইবে। দূরদৃশী রাখামাধব লিখিয়াছেন :—

“প্রেমের সাধন গৃহীরও হইতে পারে, সম্যাসীর পক্ষে দুর্লভ।”—

“যুক্ত বৈরাগ্যস্থিতি সব শিকাহিল।

শুক বৈরাগ্য জান সব নিবেধিল ॥”

“সম্যাসীর পক্ষে দুর্লভ”—এখানে পাগল মানুষ “সম্যাসী” শব্দে শুকবৈরাগ্য ধরিয়াছেন। তাহা পরায়ের দ্বিতীয় চরণ পাঠে সাব্যস্ত হয়। কারণ “সম্যাস” দ্বারা কস্ম ফলে অনাসক্তি সূচিত হয়। এই যথার্থ সম্যাস গৃহীরও অবলম্ব্য, উহা ব্যতীত প্রেমগাতের আশা নাই। “সম্যাসীর পক্ষে দুর্লভ” পাঠে সহসা পাঠকের ভ্রম উপজাত হয়।

“আমি আপনাদিগকে প্রেমদান করিবার জন্য অতিথি ; একবার উগ্ৰুৎ হইলেই, বিশ্ব-প্রেমে পুরিত হইতে পারেন। আমিওআপনাদের ন্যায় গৃহী। সম্যাসীর বিচার আমি চাইনা, কেবল চাই—মহাপাপী। মূর্খ, চণ্ডাল, কুর্ট, অন্ধ, ধঞ্জ, পতিত সকলেই প্রেম পাইবার সমান অধিকারী।” বিচার মুখচন্দ্র হইতে এই সুবাসীভল অন্তরবাণী বিনিসৃত হইয়াছে তিনি যে অসামান্য বিশ্বপ্রেমিক তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিধির কূপে বা তৎকূলে নাম-পদ্য কল ভাল হয় না। বিধিকূপের প্রবাহ-স্বরূপ রাগ-সলিলে উহার সুন্দর বিকাশ হয়। নামের হুটিকল পূণ্যফল ও প্রেমফল। একশ্রেণীর লোকে ব্রতচারাদির ন্যায় নাম করেন। উহার নামের সাক্ষ্যমাধুর্ঘ্যের উদ্দেশ লনন। তাহারা কেবল মনে করেন, নামে বিদ্র নাশ হয়, পুণ্য হয়—নাম করি। নামের প্রকৃত শিব্য বিনি, তিনি অপর ব্রতচারাদি হইতে যজ্ঞরাজ নামানুবাদকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। সুতরাং নিরপরাধে নামরসাখাল করিয়া প্রেমফল প্রাপ্ত হন। বর্ণাপ্রম ধর্ম্মাদি কেবল সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার জন্য বিধি বদ্ধ হইয়াছে।

“প্রেমসে মিলে নন্দলালা।”—কৃষ্ণ, প্রেম-মন্দিরের প্রীতিগ্রহ। নিরপরাধ নামাজ্রয়ে সেই দেবতুল্য প্রেমধামে প্রবেশ করা যায়। অপরাধ এড়াইবার একমাত্র উপায় দীনতা বা পতিতমন্যতা। পুণ্যকর্ম্মাদি দ্বারা শুভাবের অপচয়

সাধিত হয়। এই হুত্রে সিদ্ধান্ত করা যায় যে পতিত জনেরই নামে অধিকার পূণ্যবান কর্মীর অধিকার নাই। তাহার পক্ষে নাম পরমার্থ। বর্তমান সময় বিবাহ, প্রাক্ত, শনিপূজা, নারায়ণ সেবাদি সামাজিক ব্যাপারেও তরির সংকীর্ণতন একটু তলঙ্গ মধ্যে রাখে। হু একটি গানের পর কয়েক মের বাতানা বিলাইয়া দেওয়া হয়। অমূকের রোগ দূর হইয়াছে মানাসিক শ্রীনামসঙ্কীর্ণন মাদ্রলিক ক্রিয়ার অঙ্গ হইল। এবস্থিধ নামসংক্রীত দ্বারা ভূরি অপরাধ অর্জিত হয়। কীতন চলিয়াছে, ভামাক ও খুব চলিয়াছে, পান দিচ্ছে, চিবাচ্ছে; হুচারিটী মজাদারী রগড় গজ রহস্যও চলিয়াছে, বেন খন্তর বাড়ীর অমোদ। ঈদৃশ হরিনামের গ্রাম্য কোজুকে বাহার। যোগ দেন জাহারা মুখ অপরাধী। হরিনাম সাধন পকম বেদবিহিত যজ্ঞবিশেষ। এই নাম-পৌষ বেদচতুষ্টয়ে- পদিষ্ট কশ্ম-চোনার সংস্পর্শে বিকৃত হইয়া যায়। নাম-সাধন প্রাণী এক অপূর্ণ ধরণের, কর্মকাণ্ডের সঙ্গিত উহার তত সংগ্রহ নাই। লজ্জাবতী লতা যেমন করস্পর্শে চলিয়া পড়ে, শ্রীনাম কলসতিকাও শুভাশুভ কশ্ম স্পর্শে স্ত্রিয়মান হয়। উহা অপর কোন কর্ম পদ্ধতির অঙ্গ নয়। উহা শুদ্ধ নিরপেক্ষ। নাম ধরতো অন্য সব ত্যাগ কর। যদি বাঁচিতে চাও, ইহাই সেবন কর, অন্য ঔষধের প্রয়োজন নাই। যদি মরিতে সাধ, একটী বটী ও পাঁচন, পান আদা অমুপানে সেবন করিয়া যমের পাচনীর গ্রহাব খাও। নাম সাধন প্রাণী জলপথ—নদী বাহিয়া যাও এ ঘাটে সে ঘাটে নৌকা লাগাহয়। ব্যবসাদারীর প্রয়োজন নাই। রাখামাধব বলেন :—

বর্ণাশ্রম ধর্ম ও নিজ নিজ গৌর ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়া অচ্যুতগৌর এবং দাসপ্রভু সম্বন্ধ না হইলে কোন রূপ নাম সঙ্কীর্ণন করিবার উপায় নাই।—আশাকরি তত্ত পাঠকবৃন্দ রাখামাধবের এই উচ্চারিত মন্ত্র লুট করিয়া ধরিবেন। সামাজিক শ্রীসম্পাদনের কোশল স্বরূপ শ্রেণীবিভাগ সহ প্রধান প্রধান কতকগুলি কর্ম মানবসমাজে বর্ণিত হইয়াছে। হুতরায় বর্ণাশ্রম ধর্ম মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নয়। জীবের যেটি সাধারণ পরমার্থ লক্ষ্য সেটি তগবৎ প্রেম লাভ। তাহাতে বর্ভেদ জন্য আবিলতা ও বৈলক্ষণ্য নাই।

“আমি বর্তমান থাকিতে আপনাদের সহিত সমুদয় শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রস্তুত। আমি গোপনে বা চুপি করিয়া বলি নাই। একটীবার সমুদয় যুক্ত

হইলেই আপনাদের ধর্ম্ম মীমাংসা হইবে ।” রাধামাধব শিক্ষিত সমাজকে অতি বল দর্পে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে আমাদের ভরসা হয় তিনি কলতরুর ন্যায় সবারই সাধ মিটাইয়া দিতে সক্ষম, কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনি যেমন আহ্বান করিতেছেন, তেমন আকর্ষণ করিতেছেন না। তিনি আকর্ষণ করিলে বহু জীবের ভূরি লাভ হইত। দীপালোকাকর্ষণে বহু বহু কীট জুটিয়া আত্ম-সমর্পণে প্রয়াস পায়।

শাগল মানুষের চিত্র রসিক বেকপ আঁকিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। এই আলংখ্য দর্শনে রাধামাধবকে জীবসিদ্ধ জন বলিয়া মনে হয়। আমরা “গোরা গোরা” সদা চীৎকার করি, জীবন ক্ষয় করি, অথচ গোরাভাবের তম্বু এই পাললরিকে যেহে একবার স্বেধিনা। এটি আমাদের হৃদয়গত বৈ কি ?

“ভক্তি স্মৃতি পুরাণ পঞ্চরাত্রের বিধি সকল একবাক্যে কলিকালে তপানপি হুনীত হইয়া উচ্চ হরিনাম সংকীর্তনের উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত আলোচনা ও তদনুযায়ী কথ্যানুষ্ঠান কলিযুগেব বিধি প্রতিপালিত ধর্ম্ম। যাহারা এই শ্রীগ্রন্থবহুর আত্মা পালন করেন, তাহাদের সমস্ত বিধিই পালন করা হয়। আবার যাহারা তাহা অবহেলা পূর্ব্বক অর্থও প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস সংযত মতদ্বৈতবাদির ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহারা প্রভুর নিকট অপরাধী হন।

কলি যুগধর্ম্ম নামবন্ধ সাধন। তন্ত্রক্য প্রেম। মধুময় প্রেমানুরাগ প্রাণ ধর্ম্ম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সুপ্রতিষ্ঠ। উহার যথার্থ নকশা শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং তদনুযায়ী আচরণই কলি-কল্যাণ যুগধর্ম্ম। কলি-জীব ধর্ম্ম। হরিতত্ত্ব বিলাসাদিস্মৃতি উচ্চ সোপচার পূজা চর্যাাদি ছাপরের ধর্ম্ম। শ্রীনামমণি ভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত রাগ-ধর্ম্ম পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই হরিতত্ত্ব বিলাস বিধিচর্যা উপেক্ষার নয় ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু একান্ত বিধিচর্যার রাগমাগ আচ্ছাদিত না হয় হুহাই রাধামাধবের উদ্দেশ্য। রাধামাধবের কটাক কেবল কপট ধর্ম্মী জনের প্রতি। তিনি অগ্নিহীন অন্ধারের পক্ষপাতী নহেন। দর্পণ হারাইয়া কেবল ফেঁদু ধানিতে কি উপকার হয় ?

রাগপ্রাণ বৈকল্যবর্ণ্য কঠোর ব্রাহ্মণ বিধির আটনৈতে সঙ্কচিত ? নিপ্পুত হইতেছে সন্দেহ নাই। তবু কেবল দেহ সাধনযোগ্য করিবার জন্য হরিভক্তি বিলাসবিধি অবশ্য প্রতিপাল্য। সুতরাং উহা ঐচৈতন্যচরিতামৃতের পরিণতি রূপে বক্তব্য। উহা ধর্মোপদেশ বলিয়া গৃহীত না হওয়ায় আমাদের রাখামাধব বড়ই মর্শ্বব্যর্থী। এতৎ প্রতি ব্রাহ্মণের কৃপাদৃষ্টি পড়ুক ইহা আমাদের প্রার্থনা। নিখুঁত রসোজ্জ্বল ধর্ম্যে বিধি ছিন্ন দিয়া ধর্ম্মধ্বংসকীট প্রবেশ করতঃ সরস প্রাণ-ধর্ম্মকে নীরস জড় করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মণে নিরাঙ্কন হরিভক্তি বিলাস, আপামর সারারণ তত্ত নিরাঙ্কন ঐচৈতন্যচরিতামৃত। ব্রাহ্মণে এখনও যুগধর্ম্ম অবতরণ করেন নাই। তাঁহারা তেজস্বী উর্দ্ধে দ্বারস-সোপানে আছেন। “হরিভক্তি বিলাস সত্যযুগ হইতেই ছিল; তাঁহার অন্য অবতারের প্রয়োজন ছিলনা।”—ঠিক কথা। মহাপ্রভু হরিভক্তি বিলাস আনেন নাই, তদুচ্চ কোন দিব্যচমৎকারী বিশিষ্ট বস্তু তিনি আনিয়া দিয়াছেন। তদন্তই ঐচৈতন্য-চরিতামৃত, বাহা আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়, আশাদনীয়।

“কলিযুগের যুগধর্ম্ম সর্বাংশে নূতন। এই জন্য, নবদীপ ধাম, নবলীলা নবনঙ্গ; পুরাতন বিধির সহিত ইহার বিপরিত ভাব; প্রেমের গতি কুটিল, সকলই উল্টা ব্যাপার।”—কি সুন্দর, কি সুন্দর। “অনপিতচরী” ধর্ম্মের ইহাই একমাত্র হ্রত ও ব্যাখ্যা। উল্টা হইলেও ব্রাহ্মানন্দ (শান্ত) পর্যন্ত উল্টা নয়, তৎপর্যন্ত যুগত্রয়সিদ্ধান্তের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর উহা পূর্ণানন্দ সম্বন্ধ (মধুর) ঘটিত। বিষদ্ব্যস্ত্রবৈপরীত্যক্রম।

“কলিযুগে আশ্রম বর্ণের ভেদ নাই; সকল জাতিই পতিত এবং সকল বর্ণেরই একপ্রকার ধর্ম্ম।” বাহারা এই সাধুক্তি মানেনা, তাঁহারা নিশ্চয় পুণ্যমরীচিকামূর্খ, এবং জৈবব্যবসায় প্রমত্ত। শ্রবণকীর্তনাদিতে বর্ণনির্কীর্ণেবে সকলেরই সমান অধিকার এবং সফলভাগী। “সকলধন্যান্ পরিত্যজ্য মায়েকং পরণং ব্রজ” এই বংশীরব বাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, বাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে এবং মস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবৎপ্রসন্ন হইয়াছে, তাহার আতি ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, তাহার অপরাধও নাই। নাম সঙ্কীর্ণন সম্বন্ধে রাখামাধব বলেন “ইহাও বাহ্য ধর্ম্ম।” কারণ—

“সেই গোপীভাবামৃত্তে যার লোভ হয় ।

বেদ-ধর্ম ছাড়ি সে কক্ষকে ভজায় ॥”

পতিত নিরপরাধ জন নামাকীর্তনফলে ঐ ভাব প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হন ।

“স্বাগমার্গ বল পূর্বক প্রচার করাই যুগধর্ম” (কলি যুগধর্ম) সত্য সত্য, নিগূঢ় সত্য ! তোমাকে বল পূর্বক বলা যাইতেছে “তুমি শুভ শুভ কর্ম পরিত্যাগপূর্বক নিরপরাধে নীম কর, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমলাভ করিবে।—কেবল ইহাই কর, ইহাই কর।”—বলপূর্বক প্রচার কিরূপ আমরা বুঝি নাই। তবে ধারণা হয় যেমন ‘হরেকৃষ্ণের কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব’ ইত্যাদি রূপ ওজস্বিতার ভাষাই বল ।

“মহাত্ম সত্যাব হস্ত তারিতে পামর ।

নিজকার্য্য নাই তবু যান তার স্বর ॥”

পাগলমামুষ মহাজনের সত্যাব বর্ণনায় এই পাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন । কিন্তু এ বড় বিস্ময়কর “তবু যান তার স্বর” এ সত্যাব আমরা স্বাধামাধবে বেশী দেখিতে পাইনা ।

ধর্মবন্ধু শ্রীমান রাসিক লাল “আসল পাগল ও নকল পাগল” এর বর্ণনা ব্যপদেশে যে দুটি কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাদের মৌলদ্বয়শূণ্য “ভোজনে আনন্দ নাই, আনন্দ ভজনে” এই একছন্দেই প্রকাশ পাইতেছে । তিনি আরো লিখিয়াছেন “এদীনহীন সেবক ভিন্ন সকলেই তাঁহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন । শরণাগত অতিথি হইলেও বহু জননায়েক দরিদ্র বলিয়া তাঁহার সহিত বাক্যলাপও করেন নাই ; কেহ কেহ তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিতে কুণ্ঠিত হন নাহা।”—এ সব অতি মর্মান্তিক কথা । অন্ততঃ স্বাধামাধব আমাদের তরু বলিয়া পূজ্য, না হয় দরিদ্র কাকাল বলিয়া দয়াপাত্র । তাহাতে স্বাধামাধবের না হইয়া আমাদের কৃতি ; কারণ, হয়তো কর্মমলম্পৃক্ত মহামণিটী দূরে নিক্ষেপ করিলাম । স্বাধামাধবের দুঃখ নাই, কারণ সর্বদেশে সর্বযুগেই মহাপুরুষগণও বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন লক্ষ্যচক্রে ভগবান্ ও ভূত হইয়াছেন । বীত ক্রেশ্বিদ্ধ হইলেন, রামসীতা বনবাসী হইলেন, কৃষ্ণ মথুরা হইতে পলায়ন করিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ মার খেয়েছেন । স্বাধামাধব নিত্যানন্দের জন, তাঁহাকে অনেক সহিতে হইয়াছে । বর্তমানে ইংরাজী

শিক্ষা প্রভাবে “মলিন বেশের আদর নাই।” রসিকতায় মূৰ্খ নহেন, আমাদের একবার স্তন্য উচিত রসিক কি বলেন। রাধামাধব গৌরের কালীন সন্দেহ নাই। নিজ সেবা চেয়ে ভক্তের সেবার ভগবান্ সন্মতিক তুষ্টি। কিন্তু রাধামাধব অভিধির প্রাপ্যও বঞ্চিত হইয়াছেন। অবিদ্যান্ হাটকোট পরিয়াছেন, বিদ্যান্ ধৃতিচান্দরে উপস্থিত। এতলে কাহার পূজা হওয়া উচিত? রাধামাধব বেশভূষার বৈফল্য নহেন, খাটি জিনিষ।

“প্রভু বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ব্রাহ্মণকে দয়া করেন নাট, মাধামুগ্ধ করিয়াছেন।”—একথায় আমার বেশ চৈতন্য জমাইল, আর তৃপ্ত পঙ্ক চেফের কথা মনে আগিল। দক্ষযজ্ঞেই পাপের প্রাধান্টিত। অনেক ব্রাহ্মণের মুখে এই পদচিহ্ন নিয়া গৌরব করিতে শুনিয়াছি। তার হয়, জীবের দশা কি হ'লো। ঐক্লব রাধাকে বলিতেছেন “দেহিপদপদ্মবমুদায়মু”—ঐক্লবদেব গোষ্ঠামী তাহা কণ্ঠে লিখিতে পারিলেন না। আর যে সে ব্রাহ্মণে তৃপ্তপদ-চিহ্ন কাহিনী গাহিয়া বুক ফুলান।

পদসেবার সুখ বা সন্তোষ করেন দানী। ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের যথেষ্ট চিহ্ন ধরার পুলি পান না। দণ্ডায়মান ব্যক্তি পদ সেবা করিতে পারে না, অবনত হওয়া আবশ্যিক।

“মাধুর্য্যভাব স্ত্রীলোকের অতি সহজ”;—কিন্তু তৎপ্রাপ্তির সুবিধা স্ত্রীলোকে ততটা প্রস্তুত হয় নাই; সুতরাং সহজ হইয়াও ফল নাই। “ভক্তকে অবহেলা পূর্ব্বক শ্রীমুক্তি পূজা করিলে, সে পূজার বিড়ম্বনা ও অপরাধ বটে।” এ বিড়ম্বনা আমরা সর্বত্র সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভক্তরূপী ভগবান্ একথায় আমাদের বিশ্রাম থাকিলে আমরা শ্রীমুক্তি নিয়া এত ঘটা ও অপরাধ সৃষ্টি করিতাম না এবং ভক্তের অমর্যাদা করিতাম না। জীবের কল্যাণকল্পে মর্দনশীল শ্রীশ্রীগৌর-ভগবান্ তাঁহার নিজগণ দ্বারা প্রয়োজনানুরূপ শ্রীবিগ্রহসেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন,—ব্যক্তিগত শ্রীমুক্তিসেবার তদধিক প্রয়োজন নাই। শ্রীবিগ্রহসেবা উচ্চাধিকারী, সিদ্ধ জনের হস্তে গজে।

“বাউল বলিয়া কোন সম্প্রদায় নাই, অপ্রাকৃত দেহে ক্রমপ্রমে দিব্যোন্মাদ হইলে বাউল হয়।”—বাউলের ইহাই দিব্যোন্মাদ সংজ্ঞা। ইহা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অভিধানুরূপ বটে। কিন্তু “সম্প্রদায় নয়” বলা

বাইতে পারে, “সম্প্রদায় নাই” বলা বাইতে পারেনা। “সম্প্রদায় ছিলনা এও বলা বাইতে পারে। অপ্রাকৃত দেহে না হইয়া প্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ প্রেম দিব্যোগন্তগণের গঠিত দলকে বাউল সম্প্রদায় বলিব না কেন? এরূপ দলের অস্তিত্ব ইত্যন্তঃ বিকিশিত দেখিতে পাই। আমাদের রাখামাধব অপ্রাকৃত দেহে বাউল, সুত্তরাং বেশভূষা বিহীন বৈষ্ণব রত্ন। তিনি গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় বাউল সম্প্রদায়েয় অস্তিত্ব স্বীকার করিরাছেন।

“নিরপরাধ নামসকীর্তন তৃণাদপি ধর্ম্য।”—তৃণাদপি ধর্মের এ মূর্ত্ত অতি তৃপ্তিকর ও সুপক।

“গোবামী ধর্ম্য—রাগমাগায়।”—কিন্তু আমরা সমাজ ও আশ্রমের ক্রকুটি ভয়ে জাগিয়াও নিদ্রিত, অথবা লোক-তুষ্টির দানে রাগ রাগিনী ছাড়িয়া বিধির সঙ্গীত গাহি। রাগের মূল ও উদ্দীপক বিধি এখানে বিধি ধর্তব্য নয়।

মালাতিলকাদির প্রতি পাগল মানুষের কটাক্ষ বেশী। তিন মাদৃশ অধর্মের প্রতিবাদ বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলেন—“মালাতিলক ধারণ হীনবেশ” বা “তৃণাদপি” ভাবের পরিচয় দেয় না; “উহা বৈষ্ণবচিহ্ন।” আমি অধম বলি, জমিলেই একটা বেশ থাকিবে। বেশ নানা। তন্মধ্যে নিদ্রিষ্ট বৈষ্ণববেশ ভদ্রবেশ মাত্র, কোন ধর্ম্যচিহ্ন নয়। কাপে উহা ধর্ম্যচিহ্ন বলিয়া কাজত হইয়াছে। মালাতিলক বিনয়চিহ্ন ও সৌম্য সৌন্দর্য্য সাধক। হ্যাট্ কোট্ সটি-আদি দস্তের মূর্ত্তি খাড়া করে। তবে এমন একবেশ আছে বাহা কোন দিকে বোঁকে না উহা এক নির্বিকার বেশ বাহা তাবের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। রাখামাধব সেই বেশেরই পক্ষপাতী। অঙ্গচিত্তাক্রান্ত বস্তুতঃ ইদানীং অপাত্রেই বেশী দেখিয়া হাসি পায়। মাধায় অতি দীর্ঘশিখা, গদায় অতি মোটা মালা দেশকাল পাত্র বিচারের অনুকূলে ব্যবহৃত হউক। ভিত্তর বাহির মিল থাকিলে এসব মানায় ভাল। আমার প্রেমভক্তির ওজন একছটাক কিন্তু মালায় ওজন একসের এক কেনম? বাহা হউক্। এসবে বেশী আসিয়া যায়না, কিন্তু স্ত্রীপাতার প্রতি বাউলগণের (কাহ্নুক লম্পট গোড়ীবৈষ্ণব বাধারা, জাহারও বাউল) অত্যাচার দেখিয়াই পাগল মানুষ পাগল সাজিয়াছেন। রাখামাধব প্রকৃত বাউল, বাউলের নিধাতক। রাখামাধব নারীজনবদ্ধ নারীজাতির ধর্ম্মরক্ষক। মঙ্গল জীভীজয়নিভাই দেবেন্দ্র নাথ প্রভুর জীমুখেই জীনবধীপের বীতংস হৃতির কথা তিনিই এক সময় স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

ক্রমঃ—

একটী প্রাচীন কিম্বদন্তী ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী ।)

—:~:—

যুদ্ধ প্রচারা বা সরস্বতী পরম সাধু বৈষ্ণব ছিলেন । এই মহাপুরুষ
শ্রীধাম প্রাণে থাকিতেন, কখন কখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিতেন ।
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ঠনি একজন কৃপাপাত্র ছিলেন । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার
নামোল্লেক দেখিতে পাওয়া যায় । শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত যখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে
শ্রী সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হন সেই সময়ে যুদ্ধসরস্বতী প্রসঙ্গ
লাল বস্ত্র সনাতন গোস্বামী শিরোভূষণ করিয়া জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট
উপস্থিত হন । যুদ্ধ সরস্বতী সন্ন্যাসী বলভূক্ত । তাঁহার বৈষ্ণব সন্ন্যাস
না হইলেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপর উহার অচলা ভক্তি ছিল । পণ্ডিত
জগদানন্দের শ্রীগৌরঙ্গপ্রভুতে একনিষ্ঠতা পরীক্ষা করিবার জন্য সনাতন
গোস্বামী এই রক্ত বস্ত্র অন্য সন্ন্যাসী সাধুর নিকট প্রসাদ যন্ত্রে গ্রহণ করিয়া
মস্তকে বাধিয়াছিলেন । যখন পণ্ডিত জগদানন্দ ভূমিগমন এ বস্ত্র প্রসাদ
প্রভু দত্ত নহে, তখন তাঁহার মনে দুঃখ হইল, ক্রোধও হইল ! তিনি ভাতে
হাঁড়ি দিয়া সনাতন গোস্বামীকে মারিতে উদ্যত হইলেন ।

তিনি ক্রোধভরে কহিলেন :—

তুমি মহাপ্রভুর হও পার্শ্ব প্রদান ।

তোমাসম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ।

অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে ।

কোন ঐছে বয় ইহা পাবে সহিবারে ।

তখন সনাতন গোস্বামী হাসিয়া তাঁহার শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ প্রভুতে এক নিষ্ঠতা
পরীক্ষা করার কথা বলিলেন ।

যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বাধিল ।

সেই অপূর্ণ প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিল ।

এই মুহূর্ত্ত ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে একটি অভ্যুত্কৃত কিসদন্তী বহুকাল হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। আমি শ্রীকৃন্দাবনে শ্রীগোপালভট্ট পরিবারের বড় দর্শনচাৰ্য্য শ্রীযুক্ত দামোদর লাল গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরাক্ষ পতপ্রাণ পরম পণ্ডিত শ্রীল বনমালী গোস্বামীব নিকট যেমন শুনিয়াছি তেমনি বর্ণনা করিব। শ্রীপত্রিকার পাঠকবৃন্দ কিসদন্তী অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু এই অভুত কিসদন্তীর মধ্যে কিছু কিছু রমিক চন্দ্র শ্রী শীনবদীপ চন্দ্রের তাৎকালিক ভারত সত্রাট আকবর বাদশাহের প্রতি কৃপার পরিচয় পাইবেন। সেই জন্যই এই কাহিনীটি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ করিতে বাসনা হইল।

মুহূর্ত্ত ব্রহ্মচারী নৈটিক সন্ন্যাসী। শ্রীশ্রয়গ ধামে তাঁহার হুতীর। তাঁহার আশ্রম বর্ত্তমান ফোর্টের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত সংরক্ষিত এই ব্রহ্মচারীর একটি সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তিনি প্রতাহ হরিদ্বারের গোমুখী নিঃসৃত গঙ্গাদক আনয়ন করিয়া তাহার গুরুদেবের পূজা ও সেবার জন্য তাঁহার আশ্রমে রাখিতেন। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী দিগ্ধ পুরুষ ছিলেন। পদব্রজে শ্রয়গ হইতে হরিদ্বারে নিত্য বাতায়াত সন্ন্যায়ের গন্ধে অমস্তব। কিন্তু শিষ্যটি তাঁহার গুরুদেও একটি ভবধের বলে আকাশ পথে প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার বাইতেন। একটি গুটিকা মুখ মধ্যে রাখিলেই স্বচ্ছন্দে তিনি বিমান বিহার কবিত্তে পারিতেন এই গুটিকার এই গুণ ছিল। একদিন হরিদ্বার হইতে তিনি এক কলস গলা জল লইয়া দিল্লির উপর দিয়া প্রয়াগে আনিতেছেন। পথি মধ্যে দেখিলেন এক অপূর্ব্ব আলোক মালা বিভূষিত অট্টালিকার উপরে মনি মুক্তা প্রবল সজ্জিত মনোহর স্বর্ণ-পালকে দুই ফেণ নিত শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে। শিষ্যের মনে মনে উহা দেখিবার লোভ হইল। তিনি শুধায় নামিলেন। উত্তর শয্যা প্রস্তুত দেখিয়া তাহাতে বিশ্রাম করিবার লোভ জন্মিল। সেখানে কোন লোক দেখিলেন না। স্বর্ণ পর্য্যাকে স্থখে শয়ন করিলেন এবং ক্রন্দনের মতো মিট্রাভিভূত হইলেন। বধাকালে হমায়ুন বাদশাহ তাঁহার শয়ন কক্ষে আসিয়া দেখিলেন পর্য্যাকেপরি একজন অপরিচিত অর্দ্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ হইতে বিছানার উপর একটি জ্যোতিমান গুটিকা পতিত হইয়াছে। তিনি কিবৎকণ চিন্তা করিয়া গুটিকাটি তুলিয়া লইলেন এবং দিগ্ধ গাত্রবস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। তাহার পর এই আগন্তুক

সন্ন্যাসী কি করে দেখিবার নিমিত্ত কিছু না বলিয়া অত্যন্ত ভাবে অন্য পালকে নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিলেন। যথাকালে এই বিমানচারী সন্ন্যাসী শিষ্যের নিজাতত্ত্ব হইলে, তিনি ঘেঁষিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে এবং তাহার মুখে গুরুদত্ত সিন্ধু গুটিকা নাই। এই সময়ে হুমায়ুন বাদসাহ নন্দ্রা হইতে উঠি রা. আগন্তকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বয়ং সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিলেন। সন্ন্যাসী শিষ্য সন্ন্যাসীর সম্মুখে ভীত চকিত হইয়া আত্মবৃত্তান্ত সকল কথা যথ পরিচয় দিলেন এবং সেই গুটিকাটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদসাহ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুটিকাটি প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বলিলেন কোন ভয় নাই নির্ভয়ে চলিয়া যাও, কিন্তু তোমার গুরুদেবের সহিত একবার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে হইবে। সন্ন্যাসী শিষ্য ইহা স্বীকার করিয়া যথারীতি গঙ্গাজল কলস লইয়া আকাশ পথে গমন করিলেন।

সেদিন গুরুদেবের আশ্রমে পৌঁছিতে বিশেষ বিলম্ব হইল। তাহাতে গুরুদেব মুহূর্ণ ব্রহ্মচারী শিষ্যের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং এই অপরাধে তাঁহাকে বর্জন করিলেন। আর হরিদ্বার হইতে গঙ্গাজল আনয়ন করা হইল না। অন্য বিষয় শিষ্যও তাঁহার ছিলনা। সেই দিন তাঁহার আর এক বিপদ হইল। গোয়ালী ছুড় দিয়া গিয়াছে। শিষ্য সেবক কেহ নাই। ছুড় না ছাঁকিয়া স্নেহন করিলেন বোধ হইল যেন একটা গোরোম তাঁহার উপরস্থ হইল। ইহাতে তিনি বিষম হুঃখিত হইয়া বিষয় টিহে কোন প্রকারে দিনান্তিপাত করিয়া চিন্তা করিতে করিতে রাত্রে শয়ন করিলেন। সেই রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি এই পালে যখন যোনি প্রাপ্ত হইবেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া মুহূর্ণ ব্রহ্মচারী বড়ই ব্যথিত হইয়া শিষ্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে শ্রণায় কবিবা করযোড়ে দাঁড়াইলেন। গুরুদেবের মুখে তাঁহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে তিনি তখন সন্ন্যাসী ভবনে গমন ও তাঁহার আদেশ শু. দেবকে ব্যক্ত করিলেন, গুরুদেব তাহা শুনিয়া সঙ্কটে শিষ্যকে আদেশ করিলেন, “তুমি বাদসাহকে কহিও আমি তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব, তখন তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।” এই বলিয়া মুহূর্ণ ব্রহ্মচারী হুঃখে দেহত্যাগ করিলেন। তাহার শিষ্য গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। হুমায়ুন বাদসাহ এই কথা শুনিয়া একটু হালিলেন। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

সিদ্ধ পুরুষদিগের যথা বাক্য তথা কার্য । মুক্তদ্বন্দ্ব স্বরস্বতী যথা সময়ে আকবর বাদসাহ রূপে ভারতবর্ষের অধিতায়ী সম্রাট হইলেন । তাঁহার হিন্দুতাব ও হিন্দুদিগের প্রতি প্রীতি দেখিয়া অনেকে মনে করিতেন মুসলমান বাদসাহের এরূপ হিন্দুতাব কি করিয়া হইল । আকবর বাদসাহ জীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম্বাসম্মিক সম্রাট । শ্রীশ্রীমদ্বহাগ্রভূর প্রধান পার্শ্বদবর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল । শ্রীকপ সনাতন গোদামী হরিদাস ঠাকুর, শ্রীকব গোদামী প্রভৃতি প্রভূর প্রধান পার্শ্বদবর্গের সহিত আকবর বাদসাহ বিশেষ পরিচিত ছিলেন । তাহার কাহিনী লিখিতেছি শুচন ।

এসিদ্ধ সঙ্গীত বেত্তা তানসেন হরিদাস ঠাকুরের শিষ্য । এই হরিদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমদ্বহাগ্রভূর একজন অম্বরস ভক্ত । শ্রীহৃদ্যাবনে এই মহাপুরুষ বাস করিতেন । তিনি ভজনানন্দে দিনাতিপাত করিতেন । নিধুবনে তাঁহার আশ্রম ছিল । এখনও তাঁহার চিত্র মূর্তি নিধুবনে বিরাজ করিতেছেন ও পূজিত হইতেছেন । শ্রীশ্রীবক্তবিহারী শ্রীবিগ্রহ এই মহাপুরুষ হরিদাস ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত, নিধুবনে এই শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ হন । এমন অপরূপ রূপ সম্পন্ন পরম জ্যোতির্ময় আশ্রম শ্রীবিগ্রহ জীহৃদ্যাবনে আর দ্বিতীয় নাই । তানসেনের মুখে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গীত বিদ্যার পাদদর্শিতা শ্রবণ করিয়া আকবর বাদসাহ তাহার সহিত পরিচয় করিতে সমুৎসুক হন । তানসেন বাদসাহকে বলেন তিনি রাজবেশে যাইলে, তাঁহার গুরুদেব তাহাকে দর্শন দিবেন না । কারণ তিনি সাধু ফকির, রাজ দর্শন করেন না । আকবর বাদসাহ ইহা শুনিয়া হৃদ্যবেশে তানসেনের ভৃত্য সাজিয়া হরিদাস ঠাকুরের সহিত শ্রীহৃদ্যাবনে যাইতে উদ্যত হইলেন । তানসেন বাদসাহকে লইয়া যথাকালে গুরু নিকট উপস্থিত হইলেন । হরিদাস ঠাকুরের সেই দিবস প্রবল জ্বর হইয়াছিল । তিনি কষ্টসাথে দিয়া নিজ গুহার বসিয়া কাঁপিতেছিলেন । তিনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন । আকবর বাদসাহ যে হৃদ্যবেশে তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিয়া পূর্বেই তান সেনকে কহিলেন “তুমি বাদসাহকে সঙ্গে করিয়া কেন আসিয়াছ ?” তানসেন গুরুর নিকটে বিশেষ লজ্জিত হইয়া বাদসাহের আনয়ন বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিয়া গুরুদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । হরিদাস ঠাকুর এত হাসিয়া মনে মনে জ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ‘আজ

আকবর বাদসাহ আসিয়াছেন, অব, তুমি কিছুকালের জন্য আমাকে ছাড়িয়া এই কছার উপর অধিষ্ঠান কর'। আমি বাদসাহকে দু'একটি গান শুনাইয়া দিব।" এই বলিয়া ছিন্ন কথ্যখানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাদসাহ, তানসেন প্রভৃতি উপস্থিত লোকজন সকলে দেখিলেন ছিন্ন কথ্যখানি ধর ধর কাঁপিতেছে। তড়বড়র এ প্রকার জ্বর-কম্প দেখিয়া আকবর বাদসাহ বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের সাহায্যের পরিচয় পাইলেন। তাহার পর হরিদাস ঠাকুর বাদসাহকে বলিতে আজ্ঞা দিল, মন্টার রাগিনীতে একটি গীত ধরিলেন। যেমন হুব তাপ লয় বোগে গীত ধরিলেন, আকাশ মণ্ডল ঘন মেঘাবৃত হইয়া আসিল, এবং সেইক্ষণেই বৃষ্টি পড়ন হইল। মন্টার রাগিনীর এই ধর্ম্ম। ইহা দেখিয়া আকবর বাদসাহ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হরিদাস ঠাকুরের শরণাগত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। হাইবার সময় আকবর বাদসাহ অতি দীনতার সহিত হরিদাস ঠাকুরকে কহিলেন "আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি, আজ্ঞা হয় ত কিছু করি।" হরিদাস ঠাকুর কহিলেন, আমি ফকির, সাধু, আমার কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাই, তবে যদি তোমার বাসনা হইয়া থাকে, শ্রীমুনার কেনীঘাটের এক কোণের এক খানি ইন্দ্রনীলমণি পাথর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যদি পার উহা সেরামত করিয়া দিও" তানসেনকে সঙ্গে করিয়া আকবর বাদসাহ কেনীঘাটে আসিয়া সেই শুদ্ধহান দেখিলেন। দেখিয়া নিজের অপারগতা স্বীকার করিয়া বলিলেন "এত বড় ইন্দ্রনীলমণি প্রস্তর আমার নাই। যাহা আছে, অতি ক্ষুদ্র তাহাতে কিছুই হইবে না।" এই কথা বলিতে বাদসাহের বিশেষ লজ্জা হইল। আকবর বাদসাহের গম্ভীর করিবার জন্যই যে হরিদাস ঠাকুর তাহাকে এই কথা বলিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা গেল।

তাহার পর আকবর বাদসাহকে তানসেন শ্রীজীব গোখামীর নিকটে লইয়া গেলেন। শ্রীজীব গোখামীরমত পণ্ডিত তৎকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিলেন না। আকবর বাদসাহ তাহার নাম ভূনিয়াছিলেন তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। শুণীপণের আদর করিতে তিনি সত্যত প্রস্তুত ছিলেন। শ্রীজীব গোখামীর নিকট আকবর বাদসাহ বহুক্ষণ বসিয়া নানা কথা আলাপন করেন। তাহার সহিত কথাস্বর্ত্তার বাদসাহ সর্বিশেষ সন্তুষ্ট হন। হাইবার সময় বেরূপ হরিদাস ঠাকুরকে দৈন্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ বাদসাহ

শ্রীজীব গোস্বামীকেও জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে শ্রীজীব গোস্বামী কহিলেন ‘বলি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে একটা উপকার করিতে পারেন। এই ভারতবর্ষ রাজ্য আপনার অধীন। আপনি হুকুম করিলে, যেখানে হিন্দুশাস্ত্র আছে, পুরাতন পুঁথি আছে, তাহার এক এক খণ্ড নকল আমাকে শ্রীরুদ্দাবনে পাঠাইলে হিন্দু জাতির বড় উপকার করা হইবে।’ আকবর বাদসাহ রাজ বাটীতে আসিয়া সকল সুবেদারের প্রতি এই হুকুম জারি করিয়া অনেক গ্রন্থ শ্রীরুদ্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অন্য্যই বৈষ্ণব ও গোস্বামী গ্রন্থের এত বাহুল্য প্রচার। এখনও অপ্রকাশিত কত গ্রন্থ রত্ন যে এই রুদ্দাবনে নষ্ট হইতেছে তাহা বলা যায় না। শ্রীরাধা দামোদরে ছই গৃহ পূর্ণ প্রাচীন পুঁথি কীট দষ্ট হইয়া ধ্বংস প্রায় হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামীর সংগৃহীত এই সকল পুঁথি। আকবর বাদসাহের হুকুমে শ্রীরাধা রুদ্দাবনে ঐ সকল গ্রন্থরত্ন নানা দেশ হইতে আনীত হয়। গভর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেক চেষ্টা করিয়াও এই সকল অমূল্য গ্রন্থ রত্ন শ্রীরাধা দামোদরের সেবাহিত গোস্বামীদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। মূর্খ অশিক্ষিত লোক এই সকল অমূল্য বস্তুর আদর কি জানিবে।

শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর সহিতও আকবর বাদসাহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহাবও একটা কাহিনী আছে। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর নাম শুনিয়া আত্মা হইতে আকবর বাদসাহ, তাঁহাকে আহ্বান করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী প্রথমতঃ শ্রীরুদ্দাবন ছাড়িয়া আত্মা বাইতে সম্মত করেন না। অনেক বিবেচনা করিয়া তিনি এক দিবসের জন্য বাদসাহের হুকুম তামিল করিতে রাজি হন। অর্থাৎ প্রাতে বাইয়া সন্ধ্যার মধ্যে পুনরায় যাহাতে শ্রীরুদ্দাবনে করিয়া আসিয়া রাত্রি বাস করিতে পারেন তাহা বন্দোবস্ত হইলে তিনি বাইতে পারেন, এই সঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী আত্মা বাইতে স্বীকার করিলেন। আকবর বাদসাহ শুনিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী সৰ্ব্ব প্রধান হিন্দু কবি, এবং তাঁহার সম্বন্ধে তিনি বিশেষ উৎসুক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর কথামত তিনি সেই দিনই শ্রীরুদ্দাবনে যাহাতে তাঁহার পুনঃ আগমন হয় তাহার সকল বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী শ্রীরুদ্দাবন হইতে আত্মা সম্রাট সদনে যাত্রা করিলেন। বাইবার সময় তাঁহার বহির্বাসের অগ্রভাগে একটি ক্ষুদ্র কোটা করিয়া কিছু

শ্রীকৃষ্ণাবনের রজ লইলেন। ইচ্ছা হইল এই বহুমূল্য পরম পবিত্র দ্রব্য বাদসাহকে উপঢৌকন দিবেন। বধাকালে আশ্রয় পৌছিলামাত্র বাদসাহের সম্মুখে তিনি উপস্থিত হইলেন। আকবর বাদসাহ মহাসম্রাটের সহিত তাঁহাকে সাদর সন্তাষণ করিয়া বসিতে আজ্ঞা দিলেন। সম্রাট কৌণীনধারী বৈকব সন্ন্যাসী ভারতেশ্বর আকবর বাদসাহের সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান। তিনি বহির্বাসের প্রান্ত হইতে রজের কোটাটি খুলিয়া বাদসাহের হাতে প্রদান করিলেন। সাগ্রহে আকবর বাদসাহ সন্ন্যাসী প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া কোটা খুলিয়া দেখিলেন যে উহাতে বালু পূর্ণ মাত্র। সহাস্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ গোখামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “ককির সাহেব এ কি বস্তু তুমি বাদসাহকে উপঢৌকন দিলে?” শ্রীকৃষ্ণ গোখামী হাসিয়া উত্তর দিলেন “বাদসাহ! আমার বাহা কিছু গুণ জ্ঞান আপনি লোকমুখে শুনিয়াছেন তাহা এই সামান্য বস্তুর গুণে, তাহা ব্রজের রজ। উহার শক্তিব কথা কি আর বলিব। বহু মূল্য বিবেচনা করিয়াই আপনার জন্য কিছু আনিয়াছি।”

এই কথা শুনিয়া আকবর বাদসাহ সেই কোটা হইতে মহানন্দে কিছু রজ লইয়া মস্তকে দিলেন। মুসলমান বাদসাহের হিন্দু ধর্ম্মে যে কতদূর বিশ্বাস তাহা এই কার্যে প্রকাশ পাইল। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি যে আকবর বাদসাহের বিশেষ আস্থা ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। রজ-রজ-প্রাপ্তে আকবর বাদসাহের যবনবদূর হইল। তিনি পবিত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোখামীকে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ককির সাহেব। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যে অমূল্য রজ দিলে, তাহার প্রতিদান স্বরূপ আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। রাজারসীতি নজর দিলে পুরস্কার দিতে হয়। আমি রাজা, রাজনীতি অনুসারে আমার নিকট তোমার কিছু প্রদত্ত আছে। তুমি কি চাও প্রকাশ করিয়া বল।”

শ্রীকৃষ্ণ গোখামী হাসিয়া বলিলেন “বাদসাহ! আমি সাধু সন্ন্যাসী, ককির, আমার ত কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। তবে যখন আপনি আগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু দিবেন, তখন আমার প্রার্থনা আপনাকে জানাইতে আপত্তি বোধ করিনা। সমস্ত হিন্দু প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ আমি আপনার নিকটে এই প্রার্থনা করি যে যেন কেহ চৌরালি ক্রোশ ব্যবধান শ্রীভ্রজ মণ্ডলের মধ্যে পত্ন হিংসা করিতে না পারে” আকবর বাদসাহ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এই

হকুম আরি করিয়া দিলেন, এবং তাহার একখানি নকল ঐরূপ গোবামীর হাতে দিলেন । আকবর বাদশাহ ঐরূপ গোবামীর সহিত অনেকফণ বহুবিধ ধর্ম্মালোচনা করিয়া তাঁহাকে সসন্ত্রমে বিদায় দিয়া সেই রাতেই ঐরূপদ্বন্দ্বনে পৌছিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ।

এই সকল কিস্কদন্তী নিতান্ত অমূলক নহে । আকবর বাদশাহ যে মুকুন্দ স্বরূপতী ছিলেন, তাহার প্রমাণ না থাকিলেও উহা অসম্ভব নহে । সাধুপুরুষ-দিগের অলৌকিক কাণ্ডে অবিরাস করিতে নাই । এখানে আর একটি কাহিনী বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব । যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ অপুত্রক ছিলেন । ঋদ্ধি বাবা নামক একজন সিদ্ধ পুরুষ তীর্থ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে যোধপুরে আসিয়া কিছুদিন থাকেন । মহারাজা ও মহারাণী এই মহা পুরুষের অদ্ভুত যোগবলের কথা শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাদের মন হৃৎ জানাইলে ঋদ্ধি বাবা কহিলেন “মহারাজ ! আপনার পুত্র সম্ভাবনা নাই । যখন আপনি আমার নিকট পুত্র প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন, আমার কর্তব্য আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা অতএব আমিই আপনার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব । অদ্য আমার সমাধি হইবে আপনি আমার মৃত দেহ বধা রীতি সংকার করিবেন ।” রাজা যশোবন্ত সিংহ এষ্ট কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন । মনে তাহার সাধুর কথার বিশ্বাস জন্মিল না । তিনি ঋদ্ধি বাবাকে বধারীতি অভিবাদন করিয়া রাজত্ববনে প্রত্যাগমন করিলেন । গৃহে আসিয়া আর একবারও আলোচনা করিলেন না, এবং কাহাকেও কিছু বলিলেন না ।

বধাকালে ঋদ্ধি বাবা দেহত্যাগ করিলেন । তাহার শিষ্যগণের প্রতি এমন আদেশ ছিল যে, তাঁহার মৃতদেহ যেন রাজাকে দেওয়া হয় । শিষ্যগণ সমস্ত রাত্রি রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিলেন । রাজা বা তাঁহার লোক কেহ আসিলেন না দেখিয়া তাঁহারা গুরুদেবের মৃতদেহ বধারীতি সমাধিস্থ করিলেন । রাত্রিকালে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের সাধুর কথা মনে হইল । তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, সাধুর বাক্য অবহেলা করিয়া তিনি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন । কি করিবেন আর উপায় কি ? মনে মনে তাঁহার বিষম অশান্তির উদয় হইল । তিনি সিদ্ধাভিভূত হইলে স্বপ্ন দেখিলেন যেম ঋদ্ধি বাবা তাহার সমুখে দাড়াইয়া কহিতেছেন “মহারাজ ! আপনি আমার কথা অবহেলা করিয়া ভাল করেন

নাই। আমার যে কথা সেই কাজ। আমি যখন বলিয়াছি আপনার পুত্ররূপে
অন্য গ্রহণ করিব তাহা হইবেই। তবে কথের বিষয় আমার বাক্য অবহেলা
করার জন্য আপনার ভাগ্যে পুত্র-মুখ দর্শন নাই। পুত্র জন্মবার আগেই
আপনার দেহভাগ হইবে।" সাধু নাথের সফলতা হইল। জিজ্ঞাসিত
অন্য গ্রহণ করিবার পূর্বেই মহারাজা যশোবন্তসিংহের মৃত্যু হইল। এ কাহিনী
রাজ পুত্রনার ইতিহাসে বিশেষ ভাবে লিখিত আছে।

এ সকল কাহিনী বটে, কিন্তু অলৌকিক কাহিনী সাধু সনকে হইলে তাহা
বিশ্বাস করিতে হয়। আকবর বাদসাহ যে পূর্ন জন্মে সাধু পুরুষ ও হিন্দু ছিলেন
তাহাতে আশ্চর্য্য কি। কথ্যকল ভোগ বিধির নিয়ম। সে নিয়মের অধীন
সকলেই। অনানিতি বিস্তরেন।

কর্ত্তাভজ্ঞা সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া ভ্রম।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী)

—:—

মহারাজা ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায় সকলের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া
পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার—বাউল, সাঁই, দরবেশ, নেড়ানেন্ডি প্রভৃতি
বৈরাগীগণকে ও কতিপয় দমলপ্রজ্ঞ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণসম্মান লোকগণকে কর্ত্তাভজ্ঞা
সম্প্রদায়দিগের সতিত মিশ্রিতে দেখিয়া, এবং কর্ত্তাভজ্ঞা সম্প্রদায়ের
ধর্ম্ম-প্রচারক অউলে চাদক প্রীকচৈতন্য মহাপ্রভু ইত্যাদি বলিয়া ঘোষণা
করে গিয়া—কর্ত্তাভজ্ঞা সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া ভ্রমে
পতিত হইয়াছেন। আমার এই সকল প্রকারের সংগৃহীত বিবরণীতে
“কর্ত্তাভজ্ঞা সম্প্রদায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা” বলিয়া প্রকাশ করায় অপরেও
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই দার্শনিক অলৌকিক বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বোধে আমরা
ইহার প্রকৃত বিবরণ, যতদূর সম্ভব করিতে পারিয়াছি, তাহাই সর্ম্মসংক্ষেপে

মধ্যে প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পাঠক-ব দোষে পাইবেন কর্তৃত্বজ্ঞা সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা নহে, উহা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়।

কর্তৃত্বজ্ঞা সম্প্রদায়ের মত।—ইহাদিগের ব্যাখ্যানুসারে একেশ্বরবাদী লোকেরাই প্রকৃত কর্তৃত্বজ্ঞা। কর্তৃত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর, আর তাঁহাকে বাহারা ভজন করিতে পারেন তাহারা কর্তৃত্বজ্ঞা। বীজ মন্ত্রের মূল হুত্র “গুরু সত্য” পরবর্তী মন্ত্র—“কর্তা আউলে মহাপ্রভু আমি তোমার তুমি আমার তোমার হুখে চলি কিরি তিলাকি তোমা ছাড়া নাই। আমি তোমার সঙ্গে আছি দোহাই মহাপ্রভু।” প্রকারান্তর।—“কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার, তুমি আমার, তোমার হুখে চলি বলি, বা বলাও তাই বলি, বা থাপুবাও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলাকি নাই, গুরু সত্য, বিপদ মিথ্যা।” এই মন্ত্রের নাম ষোল আনা মন্ত্র। কোন ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমে “গুরু সত্য” এই বীজ মন্ত্র পাইয়া থাকে, পরে উহার যখন প্রগাঢ় ভক্তি ও ধারণা শক্তি জন্মে, তখন “কর্তা আউলে মহাপ্রভু ইত্যাদি” ষোলআনা মন্ত্র পাইবার অধিকারী লইয়া কর্তৃত্বজ্ঞা সম্প্রদায় ভুক্ত হয়। তৃতীয় মন্ত্র বধা;—মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ ধোঁজা, তবে হুত্র কর্তৃত্বজ্ঞা।

ইহাদিগের মতের মন্ত্রদাতা গুরুর নাম “মহাশয়” আর শিষ্যের নাম “বরাতি।” ইহাদিগের কর্তৃমানুযায়ী নিজ পুরুষের নাম “পাজসাব্যস্ত।” এই সম্প্রদায়ী লোকের নাম “উগবজ্জ্বল।” “ষোষপাড়ী” ইহাদিগের বাড়ী, নিজ নিজ বাসস্থান “বাসাবাড়ী।” মৃত্যুকে ইহারা “দেহরাধা” বলেন। কারণ জীবাত্মা অমর, তিনি এখানে দেহ রাখিয়া অন্যদেহ ধারণ করেন। ইহাদিগের আতি বিচার ও অন্নবিচার নাই—সকলবর্ণের লোকই এমন কি মুসলমান পর্যন্ত এ ধর্ম গ্রহণ করিবার অধিকারী, এবং যে বর্ণের লোকই হউক একবার মূলমন্ত্র গ্রহণ পূর্বক এ ধর্মভুক্ত হইলে, ইহারা তাহার সহিত অন্নপান গ্রহণ করেন। ইহার পোষকে ইহাদিগের একটি বচন আছে, যথা “লোকের মধ্যে লোকাচার, সংস্কার মধ্যে একাকার।” ইহাদিগের মতে মানুষ মানুষের মেঘ ও পুজ্য ভক্তি! অপব কোন দেবদেবীর আরাধনা বা উপাসনার আবশ্যক নাই। ইহাদিগের গুরু অর্থাৎ মহাশয় মুখে পুরুষ পরম্পর; ক্রমে জনশ্রুতিতে ধন্যমান্য চলিয়া আসিতেছে। ইহাদিগের মতে পরমহীমন্, পরমব্যহরণ ও পরমত্যাগম

এই তিনটী “কায়কৰ্ম্ম” ;” আর এই ত্রিবিধ কায়কৰ্ম্মের ইচ্ছাকপ “মনঃকৰ্ম্ম” ;” ত্রিবিধ্যকখন, কটু কখন, বুধাভাষা ও প্রলাপ ভাষা এই চারি প্রকার “বাককৰ্ম্ম” এই দশবিধ কৰ্ম্ম নিষেধ। ইহাই আউলিয়া চ’দের উপদেশ ও আস্থা বলিয়া ধ্যাত। ইহাদিগের মধ্যে কয়েকটী গীত প্রচলিত আছে। সেগুলির মধ্যে অনেক গুলি রামশরণ পালের পুত্র রামহুলালের রচিত। এই গুছিই ইহাদিগের “শাস্ত্র”বাক্য। এই সকল গীতকে ভাবের গীত বলে, এই গীতের আলাপ ও আলোচনাই ইহাদিগের উপাসনা। নিম্নে একটি গীত উদ্ধৃত হইল।

ভজরে ভজরে তার চরণ।

ও যার নাম করিলে হয়, সকল জালা নিবারণ ॥

তুমি বারেক ভজে দেখো, মজা নু পাও, বুকে স্নেহে ক্ষান্ত হ’য়ে থেকো,

সেই দীনহীনগণ জনার মনোরঞ্জন ॥

যে জন ইক্ষুবৃক্ষের পেয়েছ সন্ধান, অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে রসপান,

তেমনি জীণ হ’তে হ’তে দুঃখপাবে অভিশয় নানানৌ মতে ভাই,

ছেড়োনা এই দীনহীনগণ জনার মনোরঞ্জন ॥

প্রতি শুক্রবার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর ইহাঁরা স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে এই সকল ভাবের গীতের আলাপ করিয়া উপাসনা করেন। এই উপাসনার জন্য মিলনকে “বৈঠক” বলে।

বৈষ্ণৱধৰ্ম্মাচার্য গোষ্ঠামিগণের নিকট ইহাদিগকে দীক্ষিত হইতে দেখা যায় না, শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণৱ শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ করিতে শোণা যায় না। বর্ণধর স্ত্রীগণের প্রাধান্য ইহাদিগের মধ্যে নাই, ইহাদিগের গুরু অর্থাৎ “মহাশয়েরা” প্রায় কেহই ব্রাহ্মণ নহেন।

এই সকল আনিয়া এবং তাঁহাদের পুৰোক্ত আচার অনুষ্ঠান দেখিয়া কে বলিবে কৰ্ত্তাভজা সম্প্রদায় বৈষ্ণৱ সম্প্রদায়ের শাখা। ইহা যে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, তাহার আর কোন ভুল নাই। আমরা ইহাকে হিন্দু-সম্প্রদায় বলিতেও সম্মত হই। ইহা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় হইলেও এই সম্প্রদায়ী বুদ্ধিজীবীগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানসে ইহাকে হিন্দুধৰ্ম্ম সম্প্রদায়ের আওতায় লুক্কায়িত রাখিয়া কমল-প্রভ ব্যক্তিগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকেন। সে কারণ প্রকাশ্যে

হিন্দু ধর্মের কোন বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া ইহারা পূর্বোক্তমত ধীরে ধীরে স্বসম্প্রদায়িকগণের মধ্যে বিস্তার করিতেছেন। যদিও আমরা এই সম্প্রদায়িক অনেককে এখনও বাচিতে লক্ষ্মীপূজা, মণীপূজা করিতে দেখি, স্বজাতি ও স্ববর্ণের মধ্যে যথাবিধি বিবাহাদি আদান প্রদান করিতে দেখি, ক্ষুরও পুরোহিত রাখিতে দেখি; তথাপি যে ইহারা বিরুদ্ধাচারী তাহার আর কোন ভুল নাই। ইহাদিগের সমক্ষে আর কিছু না বলিয়া, পাঠকগণকে ইহার বিচারের ভার অর্পণ করিলাম। পাঠকগণই বিচার করুন।

ইহাদিগকে চৈতন্য সম্প্রদায় বলিয়া লোকের ভ্রমের কারণ,—“কর্তা আউলে মহাপ্রভু” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ এবং ইহাদিগের পরদ্বিগিতে বৈরাগী ও নেড়ানেড়ি লইয়া নাম সংকীর্তন, রূপাক্ষেপের বিগ্রহ মূর্তি লইয়া দোলরাস করা, রামশরণ পালের ও সতীমার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবগণের মহোৎসবের ন্যায় মহোৎসবাদি করা—নির্দেশ করা যাইতে পারে।

আউলেনাদ, রামশরণ পাল ও সতীমা ইহারা কে তাগা প্রকাশ করিবার পূর্বে ইহাদের পাঁচটা পরদ্বিগ আছে তাহা এস্থলে উল্লেখ কাবতেছি। এই সকল পরদ্বিগে ষোড়শাড়ায় মেলা হইয়া থাকে, সেই মেলার বহুলোকে সমাগম হয়।

১ম, ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই সময়ে একদিনে, দোল ও রাসযাত্রা হইয়া থাকে। দোলচৌকিতে ও রাসাসনে যদিও প্রকাশ্যে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি দেখিতে দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু স্তম্ভ ভাবে ঐ মূর্তির পশ্চাতে আউলিয়া চাঁদের আশা বাড়ি ও কড়া বস্ত্রে আবৃত করিয়া বালিশের আকারে স্থাপিত করা হয়। এই দোলবাস, প্রকৃতই, কড়ার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কণ্ডোভজা ও তমতাবলম্বী লোকে ইহা বিশেষ অবগত। কিন্তু সাধারণে বাধাক্ষেপের দোল ও রাস দেখিয়া থাকেন।

২য়, বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় রথযাত্রা। রথে অন্য কোন ঠাকুর সংস্থাপিত হয় না। বালিশের আকারে উক্ত আশা বাড়ি ও কড়া স্থাপিত হইয়া থাকে।

৩য়, রামশরণ পালের মহোৎসব।—আষাঢ় মাসের রথ যাত্রার পর চতুর্থী তিথি এই উৎসবের দিন। এই উৎসব তিনদিনে সম্পন্ন হয়। অধিবাস, মহোৎসব ও পূর্ণমহোৎসব।

৪র্থ, সতীমার মহোৎসব।—আগ্নিৰ মাসের দেবী পঙ্কজের প্রতিপদের দিন অমুষ্ঠিত হয়। ইহা রামশরণ পালের মহোৎসবের ন্যায় তিনিদিনে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৫ম, কোজাগর লক্ষী পূজার দিন। পূৰ্ণিমার রাত্রি জাগরণে ও গীতাদিতে উৎসব সম্পন্ন হয়।

এই পাঁচটা পৰ্ব্বের মধ্যে দোলরাস, পৰ্ণ সন্ধ্যার প্রধান। এ সময় ঘোষ পাড়ায় এত লোকের সমাগম হয় যে, ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কয়েকখানি বিশেষ ট্রেন কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত এক ভারায় যাতায়াত করিবার জন্য দিয়া থাকেন। আবার হোরমিলার কোম্পানি গঙ্গাবক্ষে কয়েকখানি “টিমার কলিকাতা হইতে যাতায়াতের বন্দোবস্ত করেন। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর দোকান পসারি গিয়ানানা জব্যের ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে।

কি কারণে ঘোষপাড়ার মেলায় এত লোকের সমাগম হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ত্রিবিধ কারণে সহস্র সহস্র লোকের সংঘট হইয়া থাকে। ১ম, কুংসিত চরিত্রের নরনারী ধর্ম্মের আবরণে নিজ স্বার্থসিদ্ধি মানসে, ২য় কতকগুলি সরল চরিত্র ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসী উৎকট রোগাদি হইতে মুক্ত হইবার বা অপার কোন সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভন, ৩য়, কতকগুলি নিকর্মা ব্যক্তি হুজুর দেখিতে ও কৰ্ত্তাভজ্ঞার কীরূপ ভাবে ধর্ম্মযাজন করে তাহাদের ব্যাপার দেখিতে। এই ত্রিবিধ লোক সমাগমের মধ্যে অনিশ্চিত ও দ্বীজাতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রেভারেন্ড লাল বিহারী দে নামক একজন দেশীয় যুগীয়ান, তাহার গোবিন্দ সোমাস্ত নামক ইংরাজী পুস্তকে ঘোষপাড়ার কুব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে ঘোষপাড়ার মেলায় ভদ্রলোকের বা প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসীর আদৌ সমাগম হয় না। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

রামশরণ পালের বংশধরগণের বর্ত্তমান ব্যক্তি ঘোষপাড়ার কৰ্ত্তাভজ্ঞা-দিগেশ পদীর কৰ্ত্তা। ঘোষপাড়া কৰ্ত্তাভজ্ঞাদিগের মতে তাহাদের সকলকার “বাড়ী” নিজ নিজ বাস স্থান “বাল্যবাড়ী” একথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই ‘বাড়ীর’ মাসিক অর্থাৎ ঘোষপাড়া পদীর কৰ্ত্তা, ইহাদের সর্ব্বময় হৰ্ত্তা কৰ্ত্তা বিধাতা। এই সকল মেলায় যে টাকা আদায় হয় তাহা রামশরণ পালের

বংশ ধরেনরাই পাইয়া থাকেন । লোকের সময় তাঁহাদিগের যেরূপ আয় হইয়া থাকে এরূপ আয় অন্য কোন পক্ষে হয় না । তাঁহাদের আয়ের পথ তিনটী ১ম শ্রমজী, ২য় ভোগ, ৩য় মানসিক । কর্তৃত্বজাদিগের মতে, প্রত্যেক লোকের শরীর সেই কর্তার, অতএব তাহাতে তুমি বাস কর তাহারি বাজনা অর্থাৎ কর্তারই অবশ্য দেয় । ভোগ—সতীমার সমাজ ধরে কিংবা ঠাকুর ধরে অর্থাৎ রামশরণ পাল প্রতিষ্ঠিত নাম কীর্তনের ধরে যাঁহা কিছু ভোগ দেওয়া হয় তাহাই । আর মানসিক, কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য কিংবা কোন দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যাহা মানসিক পুষ্টি দিবার বাসনা করিয়াছে তাহাই । এই তিন প্রকার ।

রামশরণ পালের বংশধররা এইকণে যে অর্থ সংগ্রহ করেন তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ধনীর ন্যায় বসবাস করিয়া থাকেন । বাৎসরিক এই আয়ের টাকা একটী জমিদারীর আয়ের ন্যায় ।

ক্রমশঃ ।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

—:—

১। জলচল ও বাত্যাধাতু বিচার।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিগন্ত নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত । মিরাজগল্প আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকৃষ্টির হইতে শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র সান্যাল, এম, এ, বি, এল, কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ৮- আনা । গ্রন্থকার পুস্তকের নিবেদনে সমাজের শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া ব্যথিত অস্থঃকরণে সকলকে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । আমরাও গ্রন্থকারের হৃদে হৃদে মিলটিয়া একবার সকলকে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বলি । ইহাতে জানিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে । “চাতুর্কণ্ঠঃ সত্যাহ্বন্তঃ গুণকর্ম বিভাগসঃ” জগদানের এই উক্তিই মতো করিয়া গ্রন্থকার নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিজমত সংস্থাপন করিয়াছেন । যদিও সকল স্থানের সহিত আমরা গ্রন্থকারের মতে মত দিতে পারি না, তথাপি গ্রন্থকারের অদম্য উৎসাহ দেখিয়া

বাং, কানুন, ১০২০।] প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। ১৫৯

তাহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। অধঃশক্তি সমাজের উন্নতী
বিধান কল্পে গ্রন্থকারের ধারণা উৎসাহ তাহা যথার্থই প্রশংসার্হ। আমরা এ
গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

২। শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার। এখানেও উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত
জাতিভেদ গ্রন্থপ্রণয়ন দ্বারাই গ্রন্থকার জনসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া
ছেন। তার পর ক্রমে ক্রমে তিনি যেভাবে সমাজের উন্নতীর জন্য উঠিয়া
পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শীঘ্রই গ্রন্থকারের মনোবাসনা পূর্ণ
হইবে। তবে তিনি যে ভাবে শূদ্রাদিকে সপ্রণব মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার
দিতে প্রয়াস, সমাজ তাহা লইতে চাহে কিনা সন্দেহ। এসম্বন্ধে গ্রন্থকার
অনেক বিচার, অনেক প্রমাণ প্রয়োগ গ্রন্থ মধ্যে সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।
আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

৩। গীতা মধুকরী। অর্থাৎ শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণের মতানু-
যায়ী অম্বয়মুখে সরল টীকা এবং মর্মার্থ সংযুক্ত পর্যালোচনায় অনুবাদ সম্বলিত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক অভিনব সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীআনন্দভোব দাস।
প্রাপ্তিস্থান ২৫নং রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধান
১।০ চারি আনা। আজকাল বাজারে গীতার ছড়াছড়ি, মুদ্রাবস্তুর হুলস্থল
এবং গীতা-গ্রাহীর অভাবে নানা ভাবে নানা আকারে গীতা বাহির হইয়াছে।
কিন্তু আমরা এই গীতা মধুকরী খানি পাঠে যথার্থই প্রীত হইয়াছি। সর্বোপ-
নিষদের সার গীতারূপে অনেক অনধিকারীর হাতে পড়িয়া অতি অল্প
প্রচারিত হইতেছে এ সময় একপ হৃদয়ত ও হৃদয়ত্বপূর্ণ নিভুল সংস্করণ
বিশেষ প্রয়োজন। দামও খুব অল্প সর্বসাধারণের মধ্যে এক্ষণে ইহার
আদর দেখিলেই আমরা সুখী হইব। আমরা সর্বাত্মকরূপে ইহার বহুল প্রচার
প্রার্থনা করি।

মন্তব্য।—ভক্তির সঙ্গিত পৃথক পত্রাঙ্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বাহির হইতেছিল
কিন্তু কয়েক মাস যাবৎ বহু প্রবন্ধ মজুত রহিয়াছে বলিয়া স্থানান্তরে উহা প্রকাশ
হইতেছেন। শীঘ্রই পূর্বের স্থায় প্রকাশ আরম্ভ হইবে। (ভঃ গঃ)

“সম্পাদকীয় বক্তব্য ।”

—:—

ভক্তি সর্বসাধারণের কাগজ। ইহা কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি শৈব, কি দৌষ, কি গাণপত্য সকল সম্প্রদায়েরই পাঠোপযোগী। ইহাতে কোনও সম্প্রদায়ের নিন্দাবাদ প্রকাশ হয় না। আর সেই জন্যই আজ ১৫ পনের বৎসরকাল নির্বিকল্পে চলিয়া আসিতেছে। সর্বসাধারণে যাচাতে এই কাগজ পাঠ করিতে পারে তাহার জন্য মূল্যও এতাবৎকাল বার্ষিক ডাক মাণ্ডল সহ এক টাকা মাত্র ছিল। আমরা এতদিন বিশেষ কৃতি বোধ করিয়াই একটাকাতে কাগজ দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ-বিভ্রাটে কাগজ ও মুদ্রণ সরঞ্জামাদির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ার এমন কি কোন কোন দ্রব্য পূর্ণাপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক মূল্য হইয়াছে তাই আর কোন প্রকারেই একটাকাতে কাগজ দেওয়া যাইতেছেন। বিশেষতঃ ভক্তির পূর্ণ আকার কমাইয়া দিয়া ভাল ভাল লেখকগণের লেখা প্রকাশ করিতে না পারিলে এবং তাহাতে গ্রাহকগণ সন্তুষ্ট থাকিবেননা, এইকণ ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং অনেক গ্রাহকেব দ্বারা অনুরোধ হইয়া আমরা ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি করাই প্রায় মনে করিয়া গত মাঘমাস হইতে ভক্তির মূল্য বার্ষিক সডাক ২।০ দেড় টাকা ধার্য করিয়াছি। যাহারা বর্তমান বর্ষে ১। টাকা দিয়া গ্রাহক হইয়াছেন তাঁহার ঐ এক টাকাতো বর্তমান বৎসরের কাগজ পাইবেন, তাৎপরে ১।০ দেড় টাকা লাগিবে। আর যাহাদিগের নিকট এ বৎসরের মূল্য বাকী আছে তাঁহারা যদি ১৫ই চৈত্রের মধ্যে টাকা না পাঠান তাহা হইলে আমরা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের নিকট ১।০ দেড় টাকা ধার্য করিব। আশা করি আমাদের অবস্থা বুঝিয়া সুদী পাঠকমণ্ডলী বৎসরিক ১।০ দেড় টাকা মাত্র ভিক্ষা দিয়া ভক্তিদেবীর সেবা করিতে কেহই কুন্তিত হইবেননা। আশা করি সকলেই আপনাপন বন্ধুগণের মধ্যে ভক্তির প্রচার করিয়া আমাদের কাণ্ডের সহায়তা করিবেন। অনামিত।

(ভাঙ্গা পঞ্চদশবর্ষ চমৎকার চৈত্র মাস, ১৯৩৩।)

নববর্ষ আবাহন ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকানন্দ স্বতন্ত্র স্মৃতিভূষণ।)

এসময় আকর্ষণের দেবতা। আকর্ষণ প্রত্যবেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও
প্রলয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক পদার্থই পরমাণু সমষ্টি মাত্র। এই স্বাঃ জগৎ
পরমাণু পুঞ্জ ভিন্ন তার কিছুই নহে। প্রত্যেক পদার্থ পরমাণু সমষ্টি হইলেও
উহার এক পরমাণু অপর পরমাণুকে স্পর্শ করে না অথচ অত্যন্ত দ্রুতগতি
অবস্থান করিতে থাকে। এক পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে।
আবার পার্শ্বস্থিত অপর পরমাণু কর্তৃক স্বয়ং আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অগণিত
পরমাণু-পুঞ্জ এইরূপে আকর্ষণ করিয়া এবং আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যেক পদার্থ উৎপন্ন
করিতেছে। এই আকর্ষণের ভারতম্যানুসারে পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয়
আকার ধারণ করিয়া থাকে। আণবিক আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক হইলে অল্প
স্থানে অধিক পরমাণু সম্মিলিত হওয়াতে পদার্থ কঠিন হইয় থাকে।

পরমাণু-পুঞ্জ আকৃষ্ট হইয়া যতই সন্নিবিষ্ট হউক না কেন তাহার পরস্পরকে
স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না ; তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকেই থাকে।
সুতরাং প্রত্যেক পরমাণু স্থির নহে। তাহারা নিজ নিজ আণবিক ব্যবধানের
মধ্যে ঘটিকা যন্ত্রের পরিদোলকের ন্যায় ইতস্ততঃ চলিতেছে। তাপাণিক্যে
এই পরিদোলন অধিক হয় সুতরাং পরমাণু-সম্মিলিত ব্যবধান দীর্ঘতর হওয়াতে
বস্তুটা ক্ষীণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

একটা পরমাণু যখন আকৃষ্ট হইয়া অপর একটীর দিকে যাত্রা করিলে সেই
পরমাণুটী আকর্ষণকারী পরমাণুর বিপরীত দিকের পরমাণু হইতে দূরে ফাইতেছে
বিপ্লবিত হইতেছে বা বিকৃত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, ইহাই বিকর্ষণ। বিকর্ষণ
আকর্ষণেরই একান্তরূপ, উহা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

এহ আকর্ষণ বিকর্ষণ যদি না থাকিত তাহা হইলে কোন পদার্থ হইতে পারিত কি? একটী পরমাণু যদি অপর পরমাণুকে আকর্ষণ না করে, তাহা হইলে এই বিশ্ব তৎক্ষণাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।^১ সুতরাং প্রত্যেক পদার্থের অস্তিত্বের জন্য, লব্ধির জন্য আকর্ষণের আবশ্যক। এই জন্যই বোধ হয় পুজনীর ঋষিপাদ বলিয়াছেন “কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দঃ।”

পরমাণুর এই স্বাভাবিকী আকর্ষণী শক্তি কোথা হইতে আসিল? আপাততঃ দৃষ্টিতে যাহা আপনা আপনিই হইতেছে বলিয়া বোধ হয় আমরা তাহাকেই স্বাভাবিক বলি। যেমন তৃণাদি পত্রের হৃদয়বর্ণজী স্বাভাবিক। নবহৃদয়ালয়ের শ্যামলতা আপনা আপনিই চইযাচে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটী শ্যামল-হৃদয়াল-বোধির উপর তাপালোক প্রতিফলক কোনও পাত্র বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিলে কিয়দ্দিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে উহা রসাতাবে খসি গুত না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার বর্ণ অপেক্ষাকৃত শেত হইয়াছে। ফলতঃ তাপালোকই জগতে বর্ণ বৈচিত্র্যের কারণ। আপনা আপনি কিছুই হয় না বা হইতে পারে না।

দূর্য্য যেমন বহু দূরে অবস্থিত হইয়াও কিরণ রূপে তাপালোক দ্বারা সমস্ত সৌর জগতের অন্তঃ প্রবিষ্ট, তদ্বৎ আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ গোলকধামে নিত্য বিরাজমান থাকিয়া আকর্ষণ রূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সম্ভাব্য বিধান করিতেছেন। দূর্য্য যেমন সৌর জগতের কেন্দ্র স্বরূপ, গোলকধামও সেইরূপ নিখিল বিবেক কেন্দ্র স্বরূপ, আকাশের এই সৌর জগতের ন্যায় কত কোটী কোটী সৌর জগৎ অনন্ত আকাশের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। গোলকধাম সেই সমস্ত সৌর জগতের কেন্দ্র স্থানীয়। সমুদ্র বেকপ আকাশের নীলাভ প্রতিভাত হইয়া নীল বর্ণ ধারণ করিয়াছে, আকাশও সেইরূপ তামাল-শ্যামল-শ্যামহৃদয়ের নিত্য-লিক্তন সেই গোলকধামের অবয়ব বিতীর্ণিত গ্রহ-লক্ষ্যাদি পরিবোধিত জ্যোতিতে নীলাভ হইয়াছে।

দূর্য্য সৌর জগতস্থিত সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ পরিবেষ্টিত হইয়া স্থলিতে স্থলিতে নিজ গন্তব্য পথে যাইতেছে। আবার প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু সমূহ নিজ নিজ আণবিক অবকাশের মধ্যে ইতস্ততঃ স্থলিতেছে।^২ আপনা আপনি কিছুই হয় না। ইহার কোনটী ঐতল্যবাদের দোদলীলার ন্যায় আশ্রয় কোন্টী বা

তাহার তিৎকালনলীলার শক্তি। ত্রিভুবান্ শক্তি সঞ্চার করিলে সকলেই সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন।

স্থায়ী বহুদূরে অবস্থিত থাকিলেও তাপালোক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ বলিয়া আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আকর্ষণ প্রত্যুত অপ্রত্যক্ষ পদার্থ হইলেও জড়বাদীগণ সর্বাধিক ঐক্য-ভূমি গোলকাগত এই আকর্ষণ স্থির চিত্তে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

সর্বাধিক আকর্ষণের অধিষ্ঠাতা সর্বাধা নিজধামে বিরাজিত থাকিলেও যখন যে ব্রহ্মাণ্ডে যে প্রকার জীব তত্ত্বজ্ঞান চারা হয় তখন সেই ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রকার জীব মুক্তি ধারণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে শিক্ষাচ্ছলে নিজ লীলা প্রকট করেন। এক প্রকারের জীব সমশ্রেণী জীবের নিকটে হইতে যত সহজে শিক্ষা লাভ করিতে পারে অন্য শ্রেণীর জীব হইতে সেকণ পারে না বলিয়াই তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবাকারে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

একবার এই ব্রহ্মাণ্ডে নরাকৃতি জীবগণ তত্ত্বজ্ঞান হারা হইরাছিল বলিয়া তিনি নরাকৃতি ধারণ করতঃ তাহাদের জ্ঞানাবস্থগ উন্মোচন করিয়াছিলেন। যে মাসের যে তিথিতে তিনি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন সেই মাসের সেই তিথি কতবার আদিরাছেন কিন্তু ইনি নিত্যই নূতন ভাবের নূতন আশার সঞ্চার করিয়া থাকেন।

তাই বলিতেছি এসহে আকর্ষণের দেবতা, তুমি আকর্ষণী শক্তি প্রদান করিয়া এই জগৎ সৃজন ও পালন করিতেছ, কত পাপী ভাপীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছ। বংশীধ্বনিতে গোপীগণকে আকর্ষণ করিয়া মধুর লীলার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ। সর্বাধিক, তুমি একবার এই জড়-চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া তোমার ঐশ্বর্য পদে লীন করতঃ তোমার ঐক্যকাম সার্থক কর, জগৎবাসী দেখিয়া ধস্ত হউক।

তুমি সকলকে আকর্ষণ করিয়া থাক, কিন্তু তোমাকে আকর্ষণ করিবার একটা পদার্থ আছে, তোমার ভক্তগণ তাহাকে বলিয়াছেন—ঐক্যকামিনী চ সা—“ভক্তি দেবী।” এই “ভক্তি” পত্রিকা সেই ভক্তিদেবীর অনুবাদ বরূপিনী হউন ইহাই প্রার্থনা।

জ্ঞান ও ভক্তির একতা খণ্ডন ।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য্য ।)

(পূর্বসংস্কৃতি ।)

—:—

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত দুইটিই হতাশ আশ্বিনের হৃদয়োচ্ছ্বাস মাত্র! অর্থাৎ “ভক্তবত্ত্ব” আদান না পাইয়া হতাশাস হইয়া একেপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । প্রথম সিদ্ধান্ত অনুসারে “ভক্তবত্ত্ব” বহুরূপীর (জন্ত বিশেষের) ন্যায় হইলে, সাধক-হৃদয়ে কখনই তিনি শাস্তি স্থাপন করিতে পারেন না । এবং বিভিন্ন ঘটাইয়া সাধকে “উল্লাসিত” পথে আনয়ন করিবেন । শাস্ত্র যে অর্থে তাঁহাকে “বহুরূপ” বলিয়াছেন । উক্ত সিদ্ধান্ত উদ্ভূত নহে । শাস্ত্রের নির্দিষ্ট “বহুরূপের” অর্থ এই যে “তিনি বস্তুতঃ একরূপ হইয়াও সাধকের হৃদয়ের ভাব অনুসারে ‘বহুরূপে’ প্রতিভাত হইতে পারেন । এতকণে প্রতিভাত হওয়া তাঁহার স্বভাব । অর্থাৎ নানারূপে প্রতিভাত হওয়ার শক্তি একমাত্র তাঁহারই আছে, কিন্তু প্রথমতঃ একরূপ বলিয়া মনে হইলেও কাচাদি সহযোগে যেমন নানারূপে প্রতিফলিত হয় । তদ্রূপ শ্রীভগবান নানাবিধ সাধনার নানারূপে নিয়াজমান করেন । দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি যে বাক্য মনের অগোচর তাহা স্বীকার্য্য । কিন্তু “ভক্তবত্ত্ব”তে এমন শক্তি অস্বীকার করা যায় না, যে শক্তির সাহায্যে তিনি ইচ্ছা করিলে মনো বুদ্ধির গোচর না হইতে পারেন । প্রাকৃত মনো বুদ্ধির দ্বারা তিনি সর্বাধিক সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত না হইলেও রূপা পূর্বক বাহ্যকে আভাসেও জ্ঞাত করাইয়া থাকেন । বাহ্যের তাঁহার আভাস পাইয়াছেন, তাহাদের নিকট আমার কথা নিতান্ত প্রলাপ বলিয়া অনুমিত হইবে না ।

বস্তুদ্বয় আলোচিত হইল, তাহাতে সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত স্থির হইল যে,— “ভক্তবত্ত্ব” বস্তুতঃ সূচ্য-কিরণবৎ একরূপ । সাধকের হৃদয় অনুসারে তিনি যতই তিম্র তিম্র রূপে প্রতিভাত হন । সেইকারণ সাধকগণ হৃদয়কে নির্মল

করিবার নিমিত্ত জ্ঞানাদির চর্চা রূপ এক একটি পন্থা অবলম্বন করেন। সকল জ্ঞান পন্থা দ্বারাই যে হৃদয় সম্পূর্ণ নির্মল হয়, তাহা নহে। যে পন্থাদ্বারা যতটুকু নির্মলতাব সেই হৃদয়ে প্রতিফলিত হন। উক প্রতিফলন জ্ঞান সেই একমাত্র নির্মল তত্ত্বসত্ত্বই প্রতিফলন। কিন্তু হৃদয়ের অখচ্ছতা বশতঃ সাধকগণ সেই নির্মল “স্বরূপকেই” আপন আপন হৃদয় অনুসারে বিকৃতভাবে দর্শন করেন মাত্র। ঐভাগবত এই কথাই হৃদয়জন্ম করাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, একমাত্র “অবয়বজ্ঞানতত্ত্ব” নির্মল ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন। জ্ঞানীর “হৃদয়ে তদপেক্ষা রঞ্জিত, যোগীহৃদয়ে পরমাত্মরূপে এবং তদপেক্ষাও অধিক অজুরাগী ভক্-হৃদয়ে ভগবান রূপে প্রতিভাত হইলেন। স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছেন,— আমি ভক্তি দ্বারা স্বচ্ছীকৃত হৃদয়ে যতটুকু সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া থাকি অশ্রান্ত পদাবলম্বন স্বচ্ছীকৃত হৃদয়ে ততটুকু প্রকাশ হই না।

একণে অনুসন্ধান করা বাউক, সাধকগণের হৃদয়কে নির্মল করিবার নিমিত্ত কতকগুলি পন্থা শাস্ত্র নির্দেশ করেন; এবং তৎ তৎ পদাবলম্বনে স্বচ্ছীকৃত হৃদয়ে তিনি কি কি স্বরূপে প্রতিফলিত হন। পন্থাও অসংখ্য, তাঁহার প্রতিফলনও অসংখ্য। তবে মূলতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি পন্থা শাস্ত্র অঙ্গীকার করেন।

১। কর্ম। ২। জ্ঞান। ৩। যোগ। ৪। ভক্তি। ৫। তত্ত্ববোধীগণের অবলম্বনীয় পন্থা। উপরোক্ত পদাবলম্বীগণের হৃদয়ে তাঁহার প্রতিফলন যথাক্রমে নিম্নলিখিত মতে হইয়া থাকে।

১। ইন্দ্রাদি দেবতা। ২। ব্রহ্ম। ৩। পরমাত্মা। ৪। ঐন্যায়গণ। ৫। তত্ত্ব (গোপীবল্লভ-ঐক্য)।

দেবতা হইতে গোপীবল্লভ পর্যন্ত বাবতীয় রূপকেই ভগবানেররূপ বলা বাইতে পারে। ঐগোপীবল্লভই ঐভাগবত নির্দিষ্ট “তত্ত্ব” এবং পরব্যোম-বিত “ঐন্যায়গণ” ঐমভাগবত নির্দিষ্ট গোপীজনবল্লভ। ভগবানের বিলাস মূর্তি অবলম্বনে হৃদয় অনির্মল হইলে তত্ত্বসামক নিয়ন্ত্রিত করণে “তত্ত্ববল্লভ” গোপীবল্লভকেই ধারণ করিয়া থাকেন। গোপীবল্লভই যে স্বার্থ তত্ত্ব তাহার প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতা দিতেছেন বলা—

“দেবতঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।

অন্যদিকরাপি গোবিন্দঃ সর্বকাম্য কামণম্ ॥

আর সেই গোপীবল্লভই যে ঐশ্বর্য জ্ঞানমিশ্রিত রতিলংঘুত বৈবী ভক্তি-
মিষ্ট সাধক রূপে ঐশ্বর্যরূপে প্রতিভাত হন তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবত
দিতেছেন—

“এতেচাংকলাঃ পুংসঃ কৃকৃত্ত ভগবান স্বয়ং ।”

এই ঐশ্বর্যরূপ যে “প্রতিভাত স্বরূপ” মাত্র “বর্ষার্থ স্বরূপ” নহেন তাহার
প্রমাণ শ্রীভাগবতে স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকুরাণী দিতেছেন—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
শ্রীনারায়ণের সঙ্গলাভে সম্পূর্ণ সুখাখ্যান না পাইয়া গোপীবল্লভকে পতিক্রমে
আকাজ্ঞা করিয়া ষোড়শ তপস্যা করিয়াছিলেন ।

“কস্যাংস্তাবোহস্য ন দেষ বিজ্ঞহে,

ভবাজিৎসেগু স্পর্শাধিকারঃ ।

যদ্বাদ্যে ঐশলনাচরতপো,

বিহার কামান্ হৃতিরং যুতব্রতা ॥”

তপস্যা কর্তব্যমর্গীয় সাধন । কেবলারতি সংযুক্তা রাগাজুগা ভক্তি ভিন্ন
“বর্ষার্থ ভক্ত” গোপীবল্লভকে পাওয়া যায় না । সেই কারণে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
তপস্যা করিয়াও ঐশ্বর্যস্বরূপকে পাইলেন না ।

“নায়েং ঈশোহক উনিভাতুরভেঃ প্রসাদঃ

স্বধৌষিতাং নলিনি গন্ধকচাং কুতেহন্যাঃ ।

রাসোংসবেহস্য ভুজত গৃহীত কঠ

লক্ষ্মণিবাং য উদ্গাদ্ভুজমুদ্রীনাম্ ॥

একপে তত্ত্ববাদীগণের যারাগক শূন্য শূন্যলক্ষ্যে লক্ষ্যের বর্ষার্থ স্বরূপে যিনি
উদিত হন, তাহার স্বরূপ নির্দিষ্ট হইল । কিন্তু সেই ব্রহ্মেন্দ্রমন্দনকে পাইবার
পন্থা যে কি তাহার লুপ্তই আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই । “ভক্তিই তাঁহারকে
পাইবার পন্থা ।” ভক্তি হই প্রকার রতি সংযুক্তা হইয়া থাকেন । এক ঐশ্বর্য
জ্ঞান মিশ্রা রতি । আর এক কেবলারতি । উদ্যোগে কেবলারতি সংযুক্তা
ভক্তির দ্বারাই “তত্ত্ববজ্জ” (ঐশ্বর্যগোপীবল্লভ) সাধ্য হন । কেবলারতি সংযুক্তা
ভক্তি আবার দুই প্রকার । বৈবী এবং রাগাজুগা । উদ্যোগে রাগাজুগা ভক্তি
দ্বারাই সাধক ‘ভক্ত’ লাভ করেন । কেবলারতি সংযুক্তা রাগাজুগা ভক্তিই

“তত্ত্বত্ব” নাভের একমাত্র পদ্য, অপর পদ্যগুলি যাত্রা তাহার “প্রতিভাত স্বরূপকে” সাধন করিয়া দেয়।

শ্রীনারায়ণ যে “বর্ধাৎ তত্ত্বের” (শ্রীগোপী বজ্রতের) “প্রতিভাত স্বরূপ” তাহা প্রমাণ হইয়াছে।

একণে দেখা বাড়ক যোগীন্দ্রের প্রকাশিত পরমাত্মা “তত্ত্বত্ব” গোপী-বজ্রতেরই প্রতিভাত স্বরূপ কি না? গোপীবজ্রত স্বয়ং শ্রীমুখে প্রিয়সখা অর্জুনকে বলিয়াছেন।

“সর্কত্বাহিতং যো মাং তজজ্যোতসমাহিতঃ।

সর্কবা বর্তমানোহপি স যোগী ময়িবর্ততে।”

ইহার অর্থ—যোগীগণ সর্কত্বাহিত “পরমাত্মা স্বরূপে” আমাকেই (শ্রীগোপীবজ্রতকেই) ভজনা করিয়া আমার “প্রতিভাত স্বরূপেই” ময় থাকে। যোগীন্দ্রের প্রতিভাত “পরমাত্মা” যে বর্ধাৎ “স্বরূপ তত্ত্ব” নহেন তাহার প্রমাণ শ্রীমুখেই দিতেছেন।

“যোগিনামপি সর্কেষাং মনগভেনাস্তরাশ্রনা।

প্রজ্ঞাবান তজ্জতে যোমাং স মে যুক্ততমো মতঃ।”

ইহার অর্থ—প্রজ্ঞাবান (শ্রীগোপীবজ্রতে একান্ত নিষ্ঠাবান) যিনি আমাপ্রভ অস্তরাত্মা কেবলা রতি সংযুক্তা রাগানুগা ভক্তির দ্বারায় আমার (শ্রীগোপীবজ্রতের) ভজনা করেন তিনি উক্ত “পরমাত্মা” নিষ্ঠ যোগীগণ অপেক্ষা সর্কপ্রকারে শ্রেষ্ঠ।

পূনরায় অবেষণ করা বাউক জ্ঞানী হৃদয়ে প্রতিভাত “ব্রহ্ম” যে “স্বরূপতত্ত্ব”

শ্রীগোপীবজ্রতেরই প্রতিভাত স্বরূপ তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না? শ্রীগোপীবজ্রত নিজমুখে অর্জুনকে বলিতেছেন,—

“যজ্ঞজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং বাস্যসি পাণ্ডব।

যেন ভূতান্যশেষানি ত্র্যাস্যাস্ত্র্যশোমরি।”

ইহার অর্থ—“যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে,—“আমি অন্যান্য জীবগণ হইতে পৃথক এক শ্রেণীর জীবমাত্র, এ যোহ আর থাকিবে না; অধিকন্তু সমগ্র ভূত সকলে “সনাতন ব্রহ্ম” স্বরূপে একমাত্র আমিই রহিয়াছি এইরূপ জ্ঞান হইবে। অনন্তর (অর্থাৎ তার্য ক্রমে আমার কৃপায় কেবলা রতি সংযুক্তা রাগানুগা ভক্তি

অগ্নিগে, সেই “সনাতন ব্রহ্ম” আবার আমাতে লয় প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ “ব্রহ্ম” যে গোপীবল্লভের “প্রতিভাত স্বরূপ তত্ত্ব” বুদ্ধিতে উপস্থিত হইবে। জ্ঞানী হৃদয়ে প্রতিভাত “ব্রহ্ম” যে স্বরূপতত্ত্ব নহেন তাহা নিম্ন মুখেই বলিতেছেন—

“তদ্বিভোহধিকো যোগী জ্ঞানীভোহপি নতোহধিকঃ ।

কম্বিত্যচাধিকো যোগী তস্মাৎ যোগীভবার্জুন ।”

জ্ঞানী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জ্ঞানী হৃদয়ে প্রতিভাত “ব্রহ্ম” অপেক্ষা যোগী হৃদয়ে প্রতিভাত “পরমাত্মা” সুস্পষ্ট। আবার পর শ্লোকেই অভিব্যক্ত করিয়াছেন, যোগী হৃদয়ে প্রতিভাত পরমাত্মা অপেক্ষা তত্ত্ব-জ্ঞানে প্রতিভাত আমি সুস্পষ্টতম।

পুনশ্চ দেখা যাউক নানাবিধ কাম্য কন্ম দ্বারা মাধ্য ইন্দ্রাদি দেবগণ যে “স্বরূপতত্ত্ব” ত্রীপোপীবল্লভেরই “প্রতিভাত স্বরূপ” তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না? ত্রীমুখেই অর্জুনকে বলিয়াছেন—

“যেহপন্য দেবতাভক্তা যজন্তে প্রজ্ঞাবিতাঃ ।

ভোতপি মানোব কোহুত্ময় যজন্ত্যবিধি পুঙ্গবম ॥

ইহার মর্মার্থ সুস্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যাতেছে। কাম্য হৃদয়ে প্রতিভাত দেবগণ যে স্বরূপ তত্ত্ব নহেন, তাহার প্রমাণ ত্রীমুখেই দিওঁছেন, প্রথম বট অধ্যায়ে “কম্বিত্যচাধিকো যোগী” দ্বিতীয় নবমে—

“বাস্তি দেবব্রতা দেবান পিতৃন বাস্তি পিত্রব্রতাঃ ।

ভূতানি বাস্তি ভূতেজ্যা বাস্তি মদযাজিনেহপি মাং ॥

অর্থাৎ কন্মমার্গ অবলম্বনে দেবযাজীগণ আমাকেই দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করেন। পিতৃযাজীগণ আমাকেই পিতৃপুত্র এবং ভূতযাজীগণ আমাকেই ভূত জানিয়া অর্চনা করেন। আমার যজনকারী ভক্তগণ আমাকেই (ত্রীপোপীবল্লভকেই) যথার্থতত্ত্ব জানিয়া আমারই সেবা করেন। দেবতা হইতে ভূতগণ পর্যন্ত আমারই (পরম ভক্তেরই) “প্রতিভাত স্বরূপ”

ত্রীমুখের আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। চতুর্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

“যে বধা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্মৈধেব তজ্যামহং ।

নম বস্মানুবত্তন্তে মমুখ্যাঃ পার্থ সর্কশঃ ।”

ইহার অর্থ।—ইহা করিতে ভিন্নতা তবু দেখা যাইতেছে; সত্য, সাধক ও সাধনা। ইহাদেরই নামান্তর তপসান, তক্ত, তক্তি। ভিন্নতা তবুই একা একেই তিনু! তিনেই এক। তত্ত্বত (ঐশ্যোপনিষদ) সত্য। কেবলা রতি সংযুক্ত রাগানুগা তক্তি, সাধনা; উক্ত তত্ত্বনিষ্ঠ হৃদয় বিশিষ্ট ভাব (ঐশ্যোপনিষদ) সাধক। লীলাময় গোপীবন্দ্য লীলা বিজ্ঞার জন্য মায়া * আশ্রয় করিয়া ঐশ্যোপনিষদ সাধক হৃদয় হইতে কেবলা রতি এবং রাগকে অপহরণ করিয়া লইলেন। তখন জীবের (সাধক) হৃদয় রাগ শূন্য কেবলা রতি বিহীন হইয়া ঐশ্যোপনিষদ ভিত্তি বৈধি তত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া পড়ে। তখন ঐশ্যোপনিষদ সেই হৃদয়ে ঐশ্যোপনিষদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সাধি তখন লক্ষ্যের অনুগা সাধি হন। ক্রমে লীলাভিপ্রায় প্রবল হইলে, লীলাময়, সাধক হৃদয় হইতে তত্ত্বকে অপহরণ করিলে, যোগী, জ্ঞানী হন। লীলাময় জ্ঞানী-হৃদয়ে "ব্রহ্মরূপে" প্রতিষ্ঠিত হন। পরে জ্ঞান অপহরণ করিলে, জ্ঞানী তখন অর্থকামী মনুষ্য হয়। লীলাময় সেই কামী মনুষ্য হৃদয়ে দেবতা পিতৃপুরুষ ভূতাদিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

আর তিনিও অর্থকামনা করিয়া তাহাদের পূজা করেন; লীলাময় ও তৎ ও তৎ রূপে তাহাদের স্বাসনা গ্রহণ করেন।

"স তয়া প্রজ্ঞায়ুক্তস্য স্যারামমীহতে।

লভতে চ ততঃ কামান্ যদৈব বিহিতান হি তান ॥"

প্রজ্ঞা ও তাঁহা হইতে প্রজ্ঞার পাত্র দেবতাদি ও তিনি এবং কামনা বাহা তাঁহাদের দ্বারা প্রাপ্ত হন, সেগুলি ও তাঁহাদেরই বিহিত।

দৃশ্যমান প্রাপ্তকে অসংখ্য মনুষ্যগণ যে কেবল সাধকে পরিণত হইতেছেন, তদ্বধ্যে মার্গভলি গোপীবন্দ্যের "প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মরূপের" সাধন মার্গ সাধ্য বস্তুভলি গোপীবন্দ্যের "প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মরূপ" এবং সাধকের হৃদয়ভলি প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মরূপের প্রতিফলন স্থান। সেই অসংখ্য মনুষ্যগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সৌভাগ্য ক্রমে কেবলা রতি সংযুক্ত রাগানুগা তক্তির অনুসরণ করিয়া রাগানুগ্য হৃদয়ভলি ব্রহ্ম হৃদয়ে বসিবার "ব্রহ্ম তত্ত্ব" ঐশ্যোপনিষদ সাধিত ঐশ্যোপনিষদকে এবং ক্রমে

* এই মায়া পরম কোমলিতে কোমলতা এবং ব্রহ্মাণ্ডবিহিত প্রকৃতিরূপ। (লেঃ)

তাহাকেই প্রথম পরিপাক একেই দুই ঐগৌরাজদেবকে ধারণ করিয়া পরমানন্দে মিশ্রণ হন ।

“মহুয়াং সংজ্ঞেযু কশ্চিৎ বভতি সিদ্ধয়ে ।

বভতামপি সিদ্ধানাং কশ্চিৎ বভতি তত্ত্বতঃ ॥”

সমালোচনা ।

(পাগল রাধামাধব ১ম খণ্ড)

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহার বসু ভক্তিসাগর ।)

(পূর্বানুবৃত্তি, শেষাংশ ।)

—:—:—

নব ছিন্ন বিশিষ্ট মহুয়াদেহ যখন নিগুণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ দেহ দ্বারা পরব্যোম হইতে যে শব্দ বাহির হয়, তাহাই বংশীধ্বনি।—বংশীধ্বনির এই সংজ্ঞা পাঠে কে না মুগ্ধ হইবেন ? সংজ্ঞা চিত্ত চমৎকারিনী তত্ত্বের একশেষ ! ব্রহ্মরজ্জু দিয়া উঠিতে না পারিলে জীব বংশীধ্বনি শুনিতে পারে না। ভূক্ত-ভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতেও পারে না, কহিতেও পারেনা। “শব্দ ব্রহ্মের পারদাম্বী” জন এ সমাচার রাখেন। আমাদের রাধামাধব এ সমাচার আনিয়াছেন। তাই তিনি বৈষ্ণব সমাজে কলঙ্কিনী ।

রসিকের “পাগল মাধব, খাঁচার পাখী ।” কবিতাটি অতি সুন্দর। তাহকের ভাবমধুর্য্য উহাতে বেশ ভাসিয়াছে। এমন একটি কবিতা বিরল ।

রাধামাধব সকল স্থলি প্রচলিত ত্রীপত্রিকা আগ্রহেব সহিত পড়েন বা শুনে। তিনি অতি ভাবগ্রাহী ও সারগ্রাহী। এই গ্রন্থে প্রবৃত্ত রাধামাধবের সকল স্থলি কথাই তাঁহার নিজস্ব নয়। ভক্তগণের পত্র পঠিত প্রবন্ধাদির অনেক সারাংশও উহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। যেগুলি তাঁহার নিজস্ব-রত্ন, সেগুলি যেন অগ্নি গন্তীর সমুদ্র হইতে উৎখলাইয়া উঠিয়াছে। প্রতিপক্ষের মুখোত্তম ইমাতাইয়া দিয়াছে, গৌণবাগীতে বক্ত না সুধাবর্ষণের আশা। এই গ্রন্থবাদি

পাশল স্বাভাবিক আকাশের একচন্দ্রকলা, পঞ্চদশকলা এখনও শুণ্ড, পূর্বকালটান
কভই প্রভা হুলিবে, হৃদা চাচিবে। অর্থাৎ এই কবজয়া মহাত্মার ভিতর কত
নামট্রী আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ?

“করং ঐক্যের নাই মোচারণ লীলা।

স্বরং শ্রীমতীর নাই বিরহের জালা।”

এই পয়ার উল্লেখ করিয়া রসিক যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার
সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। “স্বরং” অর্থ এখানে নিত্য ধরিতে হইবে। তবে আমার
এখানে সন্দেহ যে রাধা ভূবন্দারবনের ঐরাবসেনারী তিনি কি স্বরং রাধা মহেন ?
প্রেমরাধা কি স্বরং রাধা মহেন ? পদ্মীরার বিরহজালা কি স্বরং রাধার নয় ?
নচিলে ঐগৌরান্ন নিষ্ঠা পয়মেখর থাকেন কি ? যেমন লঙ্কার অপকৃত
মায়ামীতা, তেমন অভিমত গৃহের ছায়া রাধা তিম রাধা রাধাই। সোজা
সোজা আমরা এই বুঝি। আমি অধম প্রমোক্তরমালার মিলনবিরহের কথা-
গুলির মত লুপ্তকর করিতে পারি নাই।

বিরহ সংক্ষেপে মানুষ জীবনমের প্রাণে প্রভু এই আত্মান দিয়াছেন আমি
যখন নন্দ্রনেহ পরিধি ছাড়িয়া টুপ করিয়া কেন্দ্রস্থ পঞ্চদশ বা নিকর হই, তখন
আমি আমার কোন প্রিয়জনের ভাবে বাসিয়া দেই। ইহা পূর্বরূপে বিরহ।
আমাদের রাধামাধবও তাহাই বলিয়াছেন, অথচ বিরহটি নন্দ্র দেহোপকৃত
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ বিরহটি ঠিক নিষ্ঠা বলিয়াই স্বীকার্য।
বিদেহাবয়ব বিরহোপলব্ধি হয়, অর্থাৎ নন্দ্র দেহে থাকিতে বিরহ জাগেনা।
নন্দ্রগণ্ডী ছাড়াইলে, উত্তার উপলব্ধি হয়। “জড় নন্দ্র দেহ বতকণ থাকিবে
ততকণ বিরহ বাতনা অমৃতব করিতে হইবে”—একথা কেমনে মানি; বিরহ
কি জড় বৈদিক ? বিরহকে প্রেম একান্ত লুপ্ত আমি। তবে বিরহ সত্ত্ব
প্রেম নিষ্ঠা কেমনে বলি ? বঙ্গদেশী বেকবকে ঐরূপগোবিন্দী উপদেশ
করিয়াছেন বধা :—

দেহ বেহি তেজ স্রবরে কৈলে অপরাধ।

স্বরূপ দেহ চিহ্নানন্দ নাহিক বিবেদ,।

“বেহদেহী বিভাগোহরং দেহেরে বিদ্যাতে কচিং।

সীমার-কড়কের-চিদানন্দ। জীবের দেহ আশ্রয়ে আত্মা আশ্রয়-বসতি
করেন। কিন্তু কক্ষ বা গোপ গোপীগণের মেরুণ দেহ-ও আত্মা দৃষ্টি ভিন্ন নাই।
তাহাদের জীবিত্র অস্তরূপি: এক অশুভ চিদানন্দ বস্তু। এমন কি-কেশ
দ্বয় পর্যন্তও চিদানন্দ। স্নোপার হাড়ির বেদন সবই সোণা, রাধাকৃষ্ণের
সবই চিদানন্দ—চিদানন্দ স্বরূপ ব্যতীত অন্য ঋদ নাই। এহেন চিদানন্দময়ী
শ্রীরাধা প্রকৃটে বিরহের পূর্ণবিগ্রহ। তুরন্দাবনের রাসেশ্বরী শ্রীরাধার জড়নেহ
কোথায়? অথচ তিনি সাক্ষাৎবিহোমাদিনী। প্রেমের প্রাপ, প্রেমের তুষণ
বিরহটি শ্রীমতীতে না থাকিলে এই তপ্তমধুর বিরহ প্রবাহ ধরাধামে বহিত কি?
গভীর! লীলা সম্ভাবের এত গভীরতা থাকিত কি?

পাগলমানুষ এ পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গের প্রকট লীলার বিশেষ ভবন
নাই। তিনি যেন আধ্যাত্মিকালোক দর্শনের সূত্র বলিয়া বাইতেছেন। না
হয়, কেবল নিত্যলীলা তাৎপর্যেরই সুর ভাঙাইতেছেন। এ আলোতে
রাধামাধবকে শ্রীনোড়ীর বৈকুণ্ঠ বলিয়া ঠাওরাণ হুহুহ। কিন্তু পক্ষান্তরে
“আলোচনার” পাগল রাধামাধব আর এক পাগলের উপদেশ জ্বলির সমালোচনা
করিয়াছেন, যেমন—

“নয়নে নয়নে রাধিবে পিরিতি।

রাগের উদয় এই সে রীতি।

একত্র থাকিব

নাহি পরশিব

ভাবিনী ভাবের দেহা।”

এ সব পাঠে পাগল মানুষকে একজন রসিক ভক্ত বলিয়া সিদ্ধ হয়, আমরাও
তাহাই আনি।

বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে এক মন্তব্য বলিতেছেন,—“পাখী ঘ’রে খাঁচার ভিতর
দেখা অপেক্ষা অজলা পাখী দেখে সুখী হও।” এতদ্ব্যতীত রাধামাধব
বলিয়াছেন,—“না, সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।

“শ্যাম শুক পাখী, হৃদয় নিরখি, ধরিল নরান ক’দে

হৃদয় শিঞ্জরে, রাখিল সাদরে, মনোহি শিকলে বেঁধে।” (চণ্ডীদাস।)

ঈদৃশ রসভবের ভূমি ভূমি উপদেশ পাঠ করিয়া, রাধামাধবকে শ্রীনোড়ীর
বৈকুণ্ঠ সমাজ সমুদ্রের দিব্যোত্তমরস বলিয়াই সিদ্ধান্ত আসে।

‘অকথ্য রামায়ণ’ মতের পাগল রামায়ণের বলিরাহেন, মিলন ও বিরহ একবাহাই অকথ্যব্যবহার হইবে। এহুটি সুগম্য বটে, অন্তরে আনন্দ, বাহিরে বিকলা।” আমরা বলি বিরহ বিকলায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে এক আনন্দামৃত বহে, কিন্তু তাহা যে মিলন সুখ এমন কল্য ঝাইতে পারেনা—উহা বিরহেই অধুরতা; তবে কিনা বিরহের অন্তরাল হইতে মিলনটী চুপি বেশ আর হাসে। তদবস্থাকেই রামায়ণে অভিন্নভাবে গ্রহণ করিরাহেন এবং সর্বজীবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিরাহেন। এ যে বুঝাইবার জিনিষ নয়। সূচ কথা, রামায়ণে বড়খামি আশ্বাস করিরাহেন, তাহার একজানাও বুঝাইতে পারেন না। গ্রন্থের আরম্ভ সুখ। অম কথার আর এত চেষ্টা আশা করা যায় না। ভাবতবস্তুরি বুঝ জবাট বন, যেখা চর্কণ না করিলে আশ্বাস করা যায় না। এই লম্বাচল চর্কণ বৈ প্রেমিকের বসন নয়। মিলনের দাক্ষিণ্য পিপাসা জন্মিত বা মিলনের বিরহ জন্মিত জালাই বিরহ। প্রিয়জন সদলাভের যে মোহ ও আগ্রহ, তাহা এক পরমানন্দের অবস্থা! অকৃত বলিয়া কোন সাহসী থাকিলে ইহাই। “বৈকুণ্ঠ চিসিতে নারে দেবের শক্তি।”—ইহার সন্ন্যাস এই যে দেবগণ, ভগবানের প্রতিবেশী শুভ সত্ত্ব। বৈকুণ্ঠ মহিমা এমনি গোপ্য, সূক্ষ্ম যে, তাহা দেবগণও অসুখ্য করিতে পারেনা। দেবতা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই তাঁহার অসামর্থ্য স্থাপন দ্বারা বৈকুণ্ঠের গৌরব বর্জন পূর্বক দেবতার ঐশ্বর্য-দৃষ্টতা-বিস্তৃত হীনতা স্থাপন করিরাহেন, ইহা সন্দেহ নাই হইলেও, পতিভের মহিমা ও ভাগ্য বৈকুণ্ঠ-বাদ সেই ভিসি প্রতিভকে দেবতারও উপরে বসাইরাহেন। বস্তুতঃ জাহা না করিলে দৈনিকভ্যান্ধ্যাতারের দ্বারা, মহিমা ও ভাগ্য বৈকুণ্ঠ এবং জন্ম জীবের ভাব্য প্রকটিত হয় না। দেবতার স্রষ্টা যেব লেন আছে, কিন্তু পতিভে সে সব দেখি নাই, এযুক্তিও গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নাই।

হলভ্য রোহিতি রোহিতি গল্পভ্যাববর্ত্যতি লোক বাহ্যঃ।

এই ভদ্র সিদ্ধ পুরুষের অক্ষণ হয়, তদে রামায়ণে একজন সিদ্ধ বৈকুণ্ঠ সত্ত্বের নহি।

আদিতে সুগম্য হুতি সেবার পদ্ধতি ছিলনা। তৎপ্রায়সজ্জনে রামায়ণে কয়েক—“ঐশ্বর্যবাক্যে গোপ্যবিলম্ব কখনও সুগম্য সেবা প্রকাশ করেন নাই।”—অমর্য ইহা স্বীকার না করিয়া পারি না; কারণ, রামায়ণে বুঝিতে

গোপাল সাক্ষ্য দিতে বিদ্যানগরে আসিলেন, তিনি একাকী আশ্রয়লাভ এবং পূর্বদেশেই থাকিলেন। তিনি ঐমতীমূর্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন কি ? অগ্রদেশে ঐরাবতেশ্বরী ঐগোবিন্দজীকে গহনকানন মধ্যে মুক্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া তৎসেবা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পুরীতেও ঐরামদাস যুগল নহেন। যুগল মূর্তির প্রতিষ্ঠা আধুনিক সম্প্রদায় নাই। ঐগোবিন্দমণি বোধিস্বত্ব ভাষিয়াই একল মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে পদ্ধতি লজ্জন দ্বারা অপরূপ সৃষ্টি হয় মানিতে হইবে। রাধাধাম এটি ভাল বিষয় ধরিয়াছেন। জীবের কল্যাণ চিন্তাপর রাধাধাম এসব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইয়াছেন। ঐঐগোবিন্দদেব ভারতীয় সর্বভৌত দেবালয় ধ্বংস করিয়াছেন, কিন্তু কুত্রাপি যুগল মূর্তি নহন করিয়াছেন এমন আভাস প্লাওরা দায় ন। যুগলমূর্তির কেবল গোপ্য বিলাস, উহার প্রকাশ নাই। রাধাকৃষ্ণ বিলাস অতি গোপনীয় লীলা; যোগদ্বারা বৃন্দা ও সখীগণ ভিন্ন আর কাহারও গোচর হয় নাই। কলিতে তাহাও আচ্ছাদিত হইয়াছে রাধাকৃষ্ণ সখী সম্বন্ধেই পুত্রবদেহে এবারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হুতরাং যুগল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। এ লীলার কেবল রায় রামানন্দের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলেন। সখী সমাজে যুগল প্রকাশ সাজে, কিন্তু যেখানে বহু পুরুষের হাটবাজার সেখানে ঐমতীকে বাহির করিতে নাই। যুগল লীলা অঙ্গর মহলের, বাহির মণ্ডপের নয়। বলদেব নিজেদেহ দ্বারা যুগলাধারন করেন নাই। যুগলমূর্তি প্রকাশতো নিষিদ্ধই, এমন কি তিনি বলেন, ভক্ত হইলে তত্ত্ববানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। “ভক্ত তার অধিষ্ঠান।” ভক্তের পূজাই ভগবৎ পূজা। একদিকে ভক্তের আহ্বার জুটে না, তিনি উপবাসী, অথচ তুমি ১০ টাকা ব্যয় করিয়া দেবালয়ে ভোগসমবেদ্য দিয়া ঐবিগ্রহ পূজা করিলে, বহুবাক্য নিরাশ্রয় পাইলে বা উদয়মূর্তি করিলে এ কেমন ? পাঠক মহোদয়গণ গৌড়ামী ত্যাগ করিয়া সত্য গ্রহণ করিবেন আশা করি।

“সকাল মায়িক জগতে ফ্লাহিনী শক্তির প্রকাশ কিছুতেই হইবে না।” পাপল যাহুরের এই কথাবলম্বনে লিখিত রসিক লালের কবিতাটি অতি সারগর্ভ হুতরাং অবশ্য পাঠ্য।

“জীবকে অন্তরদান ও প্রেমদান—জীবের দয়া” ইহা যেমন সহজ বুঝিলাম, “আন্তরিকা জীবের দয়া” এর হৃদয়তৎপরতা ভুল বুঝি নাই। বক্তব্য: আন্তরিকতা

না হইলে, নিজে প্রেমিক না হইলে, পরকে প্রেমকান করিতে পারে না ইহা নিশ্চয় সত্য ।

সহজ ভজন বিষয়ক দুই এক কথা উল্লেখ নাই । সহজ ভজন কি ভঙ্গিতে বিবহরণে কিছু লিপিবদ্ধ হয় নাই । শাস্ত্রবিধির অতীতাবস্থায় পৌঁছিলে পর যে ভজন অর্থাৎ বিপুলভাগের ভজন, বোধ হয় তাহাই "সহজ ভজন" । তিনি গৃহীর সহজ ভজন বিষয়ে একটু আভাস দিয়াছেন, কথ্য ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির আদেশে ঐশ্বর্যনিষ্ঠানন্দ "সিদ্ধের" পর বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া "সহজ ভজন" পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন "ইহার গৃঢ় ভাংপাঠ সম্যক না বুঝিলেও এ পর্যন্ত বুঝিলাম যে বাউলীয়ার পরকীয়া ধর্মটাকে তিনি অসিদ্ধ করিয়াছেন । পুরুষ নিকাম হইয়া ধর্মপতী লইয়া সহজ ভজনের অধিকারী হইবে ইত্যই উক্তম । রাধামাধবের এসব গুণোক্তি অমুনীশন দ্বারা প্রতিপন্ন হয় তিনিই স্বার্থ বাউল বা ষাটি গৃহস্থ ভানষর বৈকব । ঐতগ্ধানে বাহার বায়ুরোগ হয় তিনিই বাউলবা পাগল ।

"গৌরঙ্গ অবতারের পর যিনি অন্য মন্ত্র দেন, তিনি মহাপ্রভুকে স্বীকার করেন না,"—পাগলের এ উক্তি মানিতে চর, কারণ একপক্ষে রাধাকৃষ্ণ গৌরঙ্গ আভির্ভাব এ যুক্তি বলে যে কোন মন্ত্রই যথেষ্ট, পক্ষান্তরে সাক্ষ্য উপস্থিত দেবতা থাকিতে অনুপস্থিত পরোক দেবতার আহ্বান করিতে গেলে সাক্ষ্য দেবতাকে উপেক্ষা করা হয় এবং ভেদজ্ঞানও সৃষ্টি হয় । আমার যদি এ বিবাস সত্য ও দৃঢ় হয় যে, এই গৌরঙ্গই আমার রাধাকৃষ্ণ তবে আমার পৃথকভাবে রাধাকৃষ্ণাবেশের উদ্দেশ্য কি ? কোন কোন গোপন্যপ্রভু বলেন, আগে গৌর মন্ত্র নিয়া তারপর যুগলমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে । এও ভজন পথের এক জটিল সমস্যা । কিন্তু এই উপদেশেরও সার আছে ; গৌরঙ্গ গুরুরূপ, রাধাকৃষ্ণ ইষ্টরূপ । আগে গুরুমন্ত্রে গুরু বশ করিয়া গুরু রূপার যুগল ভজন পদ্ধতি মূন্দর বটে । "ভাল"র সবই ভাল ইত্যেতে বিচার নাই ।

সেহের তাই ভক্ত কেবল রাধামাধব সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন তাহা অকরে অক্ষরে সত্য এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈকব লেখক প্রেমময় বিজয় দাশ বলেন,—"পাগল, মাহুষ নহেন, দেবতা ; তাহার কথা চতুর্কোণের সার ; চরিত্রাত্মকের শুভমত যদি কেহ বুঝিয়া থাকেন, তবে এই পাগলমাহুষ । বাস্তবিক ঐচ্ছিক গোপাল

গৃহ মর্ষ পাগলমানুষ তির কেহ এখনও বুঝিতে পারেন নাই ; বহিঃকেহ পারিয়া থাকেন, তবে এই পাগল মানুষের রূপায় ।”—আমিও অবিকল এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াছি। “পাগল রাখামাধব” গ্রন্থের ভূমিকা পত্রিতেই চিত্তে প্রেমাকন্দের তত্ত্ব উন্মোচিত হয়। রসিকের লিখিত এই অক্ষমরী ভূমিকা জীব কল্যাণ কল্পে ঐপিত্রিকাতে পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় এক্ষণে এই অমূল্য ঐগ্রন্থের বহুল প্রচার দিতকর দাঁড়াইবে। আমার কল্পিত জীবন ধন্য করিতে এই ঐগ্রন্থের যথানুসারে বিশদ আলোচনা কল্পিলাম। প্রেমকন্দের অভাব, বড় অজ্ঞানাপরাধ আমার গৌরাঙ্গদেব রূপাঙ্গদে চালিয়া দিলাম।

হায় হায় ! ওদিকে যে সর্কমাশ ! বাহার মহিমাগুণ গাহিয়া শেষ পাই না, তৃপ্তি হয় না, আজ তিনি কোথায় এম্বুতি কি ভীষণ ! আমার বড় সাধের প্রীতিচিহ্ন এই সমালোচনা বাহ্যকে উপহার দিব বাহ্য। তিনি আমাদের অকুল নৈরাশ্যের প্রবাহে ডুবায়াছেন। সাধ পূর্ণ হইলনা ! প্রাণের প্রিয়তম দাদা রাখামাধব আর এ সাধারণ উপহারের প্রতীকা করিলেন না। আমি হৃৎকান্দ্য তাঁহাকে অনেক বিষোপহার দিয়াছি, মনে করিয়াছিলাম এম্বর একবিন্দু অমৃতদানে পূজ্যমানের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহা ভাগ্যে ঘটিলনা। রাখামাধবের জন রাখামাধব প্রেমকথা রসিকের কণ্ঠে থুইয়া মায়িক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। আমার গৌরঙ্গ আনন্দ পুতুল নাচাইয়া অচিরে পুতুল ঢাকিলেন। আমার ক্যাল ক্যাল করিয়া চাহিয়া কান্দ। ১১ই পৌষ (১৩২২ বাং) আমাদের পাগল মানুষ বৈকুণ্ঠ কুল-প্রদীপ নিভিয়াছেন। কেবল আশ্রয়—আশ্রয়। চিত্তে আশ্রয়ের প্রলেপ লাগিয়া আছে। এই মেঘ প্রলেপ এক একবার বিদ্যুৎ রঙে রঞ্জিত দেখিতেছি। পাগল অই যে নিত্যবাস হইতে হাত পাতিয়া চাহিয়া আছেন। রাখামাধব যেন কি কহিতে চায়, কহেনা। আগ্রত স্বপ্নের মত রাখামাধব আমার বেড়িয়া আছে। তাই বিরহ মধুর ভাব আমাকে কয়েক দিন অবধি ভাবায়িত করিতেছে। পাগলের কথা মনে উঠিতে নয়ন হুটি গলিতে থাকে, কণ্ঠ গঙ্গগঙ্গ হয়। রাখামাধবকে কহু আমি চন্দ্র চক্রে ঘেঁষি নাই, অশচ তাঁহার একটা ফটো যেন চিত্তে লাগিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আমার মিশবুদ্ধ কম হয় নাই, তবু সহজ প্রীতি। দেহ রাধিবার পূর্বে পাগল মহাত্মা

আমাকে রেহবশে ডাকিবাছিলেন। আমারই হৃদেব ? রসিক সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে ইনি এ অধমকে পত্র দিতেন, কিন্তু অল্প অধম মুণ্ডে তাঁহার লিপির মর্ম না বুঝিয়া এমন অমূল্য নিধির উপেক্ষা করিয়াছি। ইহা অহঙ্কার বৃক্ষের বিবকল। রসিক ভক্তরা প্রথম রসের মানিক ধরিয়া ফেলিলেন বতন করিলেন, সেবা করিলেন। আমাদের এই পাগলের নাম শ্রীমজ্জাধামাধবদাস, নিবাস মানকর, বর্দ্ধমান। ইনি এক শিশুপুত্র ও অমুরূপা ভাষ্যা রাখিয়া এবং শ্রীমান রসিকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আজ ভাবিতেছি আমার ভ্রাতৃজীবন দীনাঙ্কর দয়াময় বৈষ্ণব শ্রীমান রসিকলাল রাধামাধব বিরহে কত না দগ্ধ হইতেছেন এবং পাগলের স্ত্রীপুত্রের তরণপোষাণোগায় চিত্তনে কত না বাস্ত আছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষ্যাবরূপ রাধামাধববৈষ্ণব সমাজের মহামুভূতি না পাইয়া অভিমানে যেন স্বধামে চলিয়া গেলেন। তিনি কত না দুঃখের জালা বুকে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এতেশ ছাড়িলেন। আমরা না চিনিয়া স্বভূহারা হইয়া অমুতাপ করি। দয়াময় বৈষ্ণব তিনি পরের জন্য অশ্রুদান করিলেন, প্রতিদান পাইলেন না। দাদাগো, অবুঝ আমাদের বুঝ না দিয়াই অন্তর্ধান করিলে। বজাহউক্, অই যে তোমার প্রসারিত প্রীতি— এই লও, আমার সাধের প্রীতি উপহার।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।

(লেখক শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার ভক্তিরত্ন।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

—:—

বর্তমান সময় আমরা কোমণ্ড পুস্তক লিখিলে পূর্ববর্তী পুস্তকের উপর দোষারোপ করিয়া, প্রথমতঃ মুখবন্ধ স্বরূপ এক হৃদীয় ‘গৌর চন্দ্রিকা’ পালা গাহিয়া থাকি। কিন্তু চরিতামৃত গ্রন্থ রত্ন স্বরূপ হইলেও, গ্রন্থকর্তা প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়ই নানারূপী হৃত বৃন্দাবনদাসের প্রশংসা করিয়া নিজের বৈকোচিত

দৈনন্দিনতার পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য, অমূল্যবিশ্বাস্য চরম দৃষ্টিভঙ্গ, দার্শনিক তত্ত্বের অটল মীমাংসা রস-তত্ত্বের সুগভীর আলোচনা প্রেমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেকপভাবে করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহাকে স্বতঃই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

অত্যাভাগে মহাপ্রভুর প্রেম-বিহ্বলতা কি হৃদয় তাবে আঁকিয়াছেন দেখুন, তিনি মহাপ্রভুর বিরোধান বর্ণনা করেন নাই, কেননা এই বিরোধান ব্যাপার বর্ণনা করিতে তাঁহার প্রাণ ফাঁটিয়া যাইবে, তাই ভক্ত কবি ভক্তের দেবতার বিরোধানটা গোপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অস্ত্র ধরেও যেমন মহাপ্রভুর জক্তি বিহ্বলতা ক্রমবিকাশ তাবে দেখাইয়া গিয়াছেন,—তাগর ক্রমবৃদ্ধি জনিত দেহ তাক্কল্যের স্বায়াই পরিণামের ভাবী আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

‘অস্থানীয়ার মহাপ্রভুর দিব্যোদ্ভাস ও বিরহোদ্ভাস সাক্ষ্যাকাশের ডুবন্ত তারকা স্তবকের ছায় মিশিয়া গিয়াছিল। আগরণ স্বপ্নে, জ্ঞান ভ্রান্তিতে দেহ চৈতন্ত আত্মবিস্মৃতিতে তখন মিশিয়া গিয়াছে। এই ভাব বিহ্বলতার ক্রম বিকাশ কবিরাজ ঠাকুর অত্যাভাগে আঁকিয়াছেন। তুলিতে আঁকিতে পারিলে এখানে একটি উজ্জ্বল চিত্র প্রকাশের সুযোগ ছিল।

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু কখনও বিরহে সারারাত্রি অগম্ভাষ দেবের মন্দিরের মধ্যে গভীরার পাবাণের উপর মাথাষর্ষণ করিয়া রক্তাক্ত দেহে অচৈতন্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

দেহে প্রাণ আছে কিনা বুঝা যাইত না। সব ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া “তুলানাশি দিল নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিল সোয়াস আছে।” কখনও তিনি যমুনা প্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন। সমুদ্রে সলিল হইতে তিন দিন পরে তাঁহার শিখিল অস্থি বিশিষ্ট প্রেমের শেষ দশায় আকৃতিটা উঠাইয়া ভক্তগণ কর্ণে হরিনাম সুনাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করিতেছেন। কখনও প্রভু জয়দেব গান শুনিয়া উন্নতবৎ ছুটিয়াছেন। গাধকা রমণীর পদ ধরিয়া আঁহুল হইয়া কাহিড়েছেন। দ্বীপুত্রবতেদ তখন বিলুপ্ত হইয়াছে। রাত্রিকালে বহুবিধ লোক তখন তাঁহাকে পাহারা দিতে হইত। মতুবা ঈশ্বর ওম্মায়েশে পাগলের ন্যায় জললে ছুটিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছেন। শরীর বিনোদ, অস্থি চর্ম সার। আগরণ ও স্বপ্ন একই রূপ। এই সময়ে আত্মবেগের প্রবল অমুরাধে দেহ

স্মৃতি পণ্ডিত বিস্মৃত হইয়া ছিলেন। এক্ষণ আত্মবিস্মৃত প্রেম জগতে দেখা যায় না। “বন দেখি ভ্রম কার এই বৃন্দাবন”

ভমালের বৃক্ষ এক সমুখে দেখিয়া।

কৃষ্ণ বলি ধেরে গিয়ে ধরে জড়াইয়া ॥

চঠক পক্ষত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।

বেগে চলে আত্মনাশ করিয়া ক্রন্দনে ॥

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন “এই বিরহ কবি কল্পনা নহে। স্বয়ং আত্মদেহে যোগ্য ও আত্মদেহ হইয়াছে। প্রেমের আশ্রয় ক্ষুণ্ণিত্তে শ্রীগৌরের দেহ কদম্ব প্রায় হইয়াছে। সমুদ্র ডেউ যমুনা লহরী, চটক পক্ষত গোবর্দ্ধন ও পৃথিবী কৃষ্ণময় হইয়াছে।” অক্ষুট কদম্ব পুষ্পের ন্যায় প্রেম-রোমাঞ্চিত দেহ, শিশির-ভুল শতদলের ন্যায় প্রেমাক্রম পূর্ণ চক্ষু, বাত-তাড়িত লতার ন্যায় তাঁহার দেহ লতাব আছাড়ি বিছাড়ি পাষাণের ন্যায় শাস কঙ্করচল দেহ—শ্রীচৈতন্য দেবের এই ছবি খানি কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় অস্ত্র ধরে কিকপ আঁকিয়াছেন, স্থানান্তরে পাঠককে আর বেশী দেখাইতে পারিলাম না। হৃৎকম্পন! কেবল অন্তলীলার নচে। আদিও মধ্য লীলার যে সে স্থানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ভাল করিয়া মহাপ্রভুর লীলা কাতিনী লিখেন নাই, কবিরাজ ঠাকুর সেই সকল স্থানে বিশেষ রুচিতে দেখাইয়াছেন। দ্বিপ্রজয়ী পরাজয় ও রায় রামানন্দ মিলন প্রসঙ্গে বিচার বর্ণনায় চরিতামৃতে পণ্ডিতের ও রস গ্রাহিত্যের চরম নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সময় আসে যখন আরাধ্য ও আরাধক এক হইয়া যায়। কবিরাজ প্রেমধর্ম ও আরাধ্য আরাধকের সম্বন্ধে যে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা জগতের শেষ প্রার্থনীর বস্তু, কবিরাজের হিসাবে কাব্য জগতেও অতুলনীয়।

কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।

লোহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥

আত্মপ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।

“ককেপ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম ॥”

কামের তাৎপর্য নিজ সন্তোষ কেবল।

কৃষ্ণ হৃৎ তাৎপর্য প্রেমেরে কেবল ॥

লোক ধর্ম দেহ ধর্ম বেদ ধর্ম কর্ম ।
 লজ্জা ধৈর্য দেহ স্থখ আশ্রয় স্থখ মর্ম ।
 সর্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন ।
 কৃষ্ণ স্থখ হেতু করে প্রেম সেবন ।
 ইচ্ছাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দূঢ় অনুরাগ ।
 বস্তু ধোত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ ।
 অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর ।
 কাম অকৃতম্, প্রেম নিশ্চল ভাস্কর ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শন বর্ণনার বৃদ্ধ কবি উৎকণ্ঠাধির ন্যায়
 ক্ষুণ্ণি দেখাচ্ছিলেন। তাহার পরিণত ইতিহাসের স্বচ্ছ ছায়ায় সেই দৃশ্যটি
 অতি সুন্দর ভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। প্রেমের দেবতার পদার্পণে স্বভাব
 সুন্দর বৃন্দাবন দেবোদ্যানের ন্যায় সুন্দর শইয়া উঠিল।

“লভ দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা গণ ।
 অক্ষর, পুলক, মধু, অক্ষর বরিষণ ।
 ফুল ফল তারি ডাল পড়ে প্রভু পার ।
 বস্তু দেখি বস্তু যেন ভেট লওয়া যায় ॥”
 “প্রতি কৃষ্ণ লতা প্রভু করে আশ্রয়ন ।
 সুপ্পাদি ধ্যানের করেন কৃষ্ণ সমর্পণ ॥”

তখন প্রেমের উন্মত্ত আবেশে তৎকালে তাঁহার বিরুদ্ধ আবেগের অক্ষবিন্দু
 তরু ফুল পল্লবের শিশির বিন্দুর সঙ্গিত মিলিয়া গেল। কণ্ঠের ব্যাকুল রাধা
 প্যাম ধ্বনি বিহগকুল আকাশে প্রতিধ্বনিত করিল। প্রেমের মহাকর্ষণে আজ
 বৃন্দাবনের পাত পকী পর্যায় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সার্বজনীন প্রেম
 উদ্বোধন করাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জগতে দেখাইলেন যে, প্রত্যেক পদার্থের ভিতর
 সেই বিশ্বপ্রেমের প্রেমকণিকা নিহিত রহিয়াছে।

ভাট—“তব পারিকা প্রভুর হাতে উড়ে পড়ে ।
 প্রভুকে স্তন্য কৃষ্ণের স্তন কথা পড়ে ॥”

যদি তুলিতে আঁকিতে পারিতাম, তবে এখানে একটা উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত
 করিতাম। তাহার দুর্বলতা বশতঃ আর লিখিয়া দেখাইতে পারিলাম না।

চরিতামৃত পরিপক লেখনীর রচনা সম্ভব নাই। কিন্তু কোনও কোনও সমালোচক তাঁহার ভাবার উপর একটু কটাক্ষ পাতি করিয়াছেন। কবিরাজ ঠাকুর সংস্কৃত ও বাঙ্গলার সুদক্ষ থাকিলেও বহুদিন বৃন্দাবনে অবস্থান হেতু ব্রজের কোমল ভাষা বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার গ্রন্থে স্থানে স্থানে ব্রজ বুলির সন্নিবেশ দেখা যায়। আরও এক কারণ হইতে পারে, বৃন্দাবন প্রবাসীগণ যেমন ব্রজের ধ্বনি, ব্রজের কল, পুষ্প প্রভৃতিকে পবিত্র মনে করিতেন, তেমনি ভাষাটিকেও পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই ব্রজ ভাষা পবিত্রতর জ্ঞান করিয়া কবিরাজ ঠাকুর ব্যবহার করিয়াছেন। ৮৫ বৎসর বয়সে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক রচনা করিয়া কবিরাজ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“আমি লিখি ইহা করি মিথ্যা অনুমান।

আমার শরীর কাঠ পুতলী সমান।

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।

হস্ত হালে মন ওরী নহে আর স্থির।

নানারোগ গ্রস্ত চনিতে বসিতে নারি।

পক্ষ রোগে ব্যাকুল দিন রাত্রি মরি।

কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস প্রভৃতি কবিগণ তাঁহাদের পুস্তক ভবসিদ্ধি পার হইবার একমাত্র তেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়া আস্ত্র প্রশংসার চরম নৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। • বধা—

“মহাতারতের কথা অমৃত সন্ধান।

কাশীরামদাস কহে শুন পুণ্যবান।”

ইত্যাদি পাঠে অভ্যস্ত বাঙ্গালী পাঠক। বৈকুণ্ঠগ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভবিতার—বিনয়ের কি চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত চটরাঙ্গে দেখুন,—

“চৈতন্য চরিতামৃত যেই জনে শুনে।

তাঁহার চরণ ধূঞা কঁরো মুই পানে।

ঠাকুর কৃষ্ণদাস বৈকুণ্ঠ ধর্ম্ম বুঝিয়া ছিলেন জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া গিয়া ছিলেন, সংসারেরু নানাবিধ বাধা বিপত্তি অগ্নান বদনে সহ করিয়া বে দূত চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন—তাহার শেষ কল এই যে চরিতামৃত রাখিয়া

গিয়াছেন তাহা ভবধামের অমৃত বলিয়া এখনও অনেকে গ্রহণ করেন। পণ্ডিত হার্মাথন দত্ত ভক্তি নিধি মহাশয় লিখিয়াছেন “যে দিন এই পুস্তক পাঠ না হয়, সেই দিন বিফল * আরি বলি, ‘যে দিন এই পুস্তক পাঠ না করি সেইদিন অন্নাহারই বিফলে যায়।’

এই গ্রন্থ সমাধার পর কবিরাজের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত সাধিত হইয়াছিল। এখন নিশ্চিন্ত মনে দেহ রাখিতে প্রস্তুত ছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্থামীগণ কর্তৃক অসুসোদিত হইলে এই গ্রন্থ জীনিবাস নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দেয় দ্বারা—গোড়ে প্রেরিত হইল। পথে বন বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাসিয়েয় নিযুক্ত লক্ষ্যগণ এই মহামূল্য গ্রন্থ অমূল্য মণি মণিক্য পাইবার আশায় অপহরণ করে।

সহসা বন বিষ্ণুপুর হইতে লোক বাইরা বৃন্দাবনে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। যে কবিরাজ হৃৎকের দাবদাহে কোনও দিন ব্যথিত হন নাই,—আজ তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত মহাপ্রভুর সেবায় উৎসর্গ মহা পরিশ্রমের ফল অপহৃত হইয়াছে জানিয়া, তিনি আর জীবন বহন করিতে সমর্থ হইলেন না।

“বৃন্দাব, কবিরাজ তনুলা হু’জনে।

আছাড় খাইয়া কানে লোটাইয়া ভূমে।

বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে।

অন্তর্ধান করিলেন হৃৎকের সহিতে ॥ (প্রথম বিদ্যাসী)

এই উপলক্ষে পণ্ডিত কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন “কবিরাজের অন্তর্ধানের কথা লিখা উচিত নহে, এবং আমাদের তাহা লিখিতে নাই। লিখিলে বুক কাটিয়া যায়।”

কবিরাজ উপযুক্ত বয়সেই দেহ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রাত্মকের ভাবী যশের বিষয় বলি তিনি জানিয়া বাইতে পারিতেন, তবে আমাদের কোনও দুঃখ হইত না। পারিশেষে দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই পুস্তকের সংস্কৃত টিপ্পনী প্রদান করেন। বৈকুণ্ঠ সমাজে এখনও এই গ্রন্থ স্নানোত্তম পূজিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্বিত্ত তিনি গোবিন্দ লীলামৃত, কৃষ্ণ-

কণ্ঠ্যমূর্তের চারনী, অঐষত হুত্র করচা স্বরূপ বর্ণন, রত তত্ত্ব লহরী প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । তদ্ব্যতীত তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য “কৃষ্ণ-কণ্ঠ্যমূর্তের চাকর” ও কবিত্ব শক্তিও পরিচয় “গোবিন্দলীলা মূর্তে” যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে । কবিরাজ গোস্বামী ১৫৮২ খ্রঃ তিরোহিত হন । অনন্মিত ।

কর্তা ভজ্ঞা সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া ভ্রম ।

(লেখক ।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী ।)

(পুষ্কাসুহৃতি ।)

—:~:—

“কর্তা আউলে চান মহাপ্রভু” সম্বন্ধে উদাহরণের মধ্যে যেকোন বিবরণ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অন্তলীলার শেষভাগে টোট গোপীনাথের মন্দিরে অপ্রকট হন, পরে অলঙ্ক্য সন্ন্যাসীর বেশে আনোরপুর পরগণার ছোলা দুবলী নামক স্থানে আসিয়া প্রজ্ঞানভাবে কিছুদিন কাল যাপন করেন । অনন্তর তথা হইতে উলাগ্রামে মহাদেব বাকুইয়ের পানের বস্ত্রে এক পরম সুন্দর বালক মূর্তিতে দেখা দেন । বাকুইয়ের কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় এই অজ্ঞাত কুলশীল বালকটিকে পাঠে । পরম অহ্লাদিত হন এবং উহাকে পুত্র নিকিশেষে ষাদশ বৎসর কাল প্রতিগালন করেন । মহাদেব যথাকালে এই বালকের বিবাহের আয়োজন করিতেছে জানিতে পারিয়া, আউলে চান ছল ক্রমে বাকুইয়ের গৃহত্যাগ করেন । পরে এক গন্ধবর্ণকের গৃহে দেড় বৎসর কাল অবস্থতি করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন । নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া যেজড়া নামক গ্রামে আসিয়া কাকিরের বেশে দেখা দেন । ইন্দি শক্তির প্রভাবে অন্ধের নয়ন, অশুভ্রকের পুত্র, দরিদ্রের ধন মুক্তের জীবন দান ইত্যাদি অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য দেখাইয়া খ্যাত্তা বলস্বী লোকদিগকে বিমোহিত করিয়া ছিলেন এবং তৎকালীন বহুতর লোককে আপনার মতে

আনিয়াছিলেন । ইহার ২২জন প্রধান শিষ্য ছিল এই শিষ্যগণের মধ্যে রামশরণ পাল তাঁহার প্রিয়শিষ্য ছিল । ইনিই কর্তাভজাদিগের “কর্তা আউলে চাঁদ মহাপ্রভু ।” ইত্যাদি এইকণ কথা প্রচার করিয়া ইঁহারা নিরঙ্কর কমলপ্রভু ব্যক্তিগণের মধ্যে ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন ।

এই ভ্রান্তি দূরীকরণ কর্তব্য জ্ঞানে প্রথমে, আউলে চাঁদ গো শচীনন্দন মহাপ্রভু নহেন এবং তিনি অশ্রুত অমঙ্গল পর ফকিরের বেশে ছোলা ছবলী গ্রামে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করেন নাই এবং পরে প্রকাশ পাইয়া কর্তাভজা মত প্রচার করেন নাই । তাহা আমরা ইতিহাসাদি হইতে দেখাইব ।

আউলিয়া চাঁদ যখন কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, আর তাঁহার প্রিয় শিষ্য রামশরণ পালের সময় যখন এই মতের প্রচার আরম্ভ, তখন ইহার ঐতিহাসিক কাল কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর । কিন্তু শ্রীমদ্রমহাপ্রভুর অশ্রুতের কাল চারিশত বৎসর । সে কারণ কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না যে মহাপ্রভু একশত বৎসর পূর্বে পুরায় টোটা গোপীনাথের মন্দির হইতে “আসিয়া ছোলা ছবলী গ্রামে উপস্থিত হন এবং “আউলিয়া চাঁদ” নামে প্রকাশিত হইয়া সম্পূর্ণ বৈষ্ণব শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্তাভজাদিগের মত প্রচার করেন ।

বিষয়কোষে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বিবরণ মধ্যে লিখিত আছে যে, আউলে চাঁদ ১৭১০ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে মানবলীলা সংবরণ করেন । একশত শক ১৮৩৪ । তাহা হইলে বেশ বুঝা গেল যে, বিষয়কোষ প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যা-মহানব মহাশয়ের মতে আউলে চাঁদ, ১২৪ বৎসর হইল অন্তহিত হইয়াছেন ।

আউলিয়া চাঁদ সত্যনাথ । এই সত্যনাথ আবার কে বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি ।

সে প্রায় দেড় শত বৎসর হইতে চলিল, বর্জমানের জাল প্রতাপ চাঁদের মকদ্দমায় নিষ্পত্তি হয়, ইহার কয়েক বৎসর পরে এই আউলিয়া চাঁদের মত প্রকাশিত হইতে দেখা যায় ।

জাল প্রতাপ চাঁদ সত্যনাথ নাম ধারণ করেন । সত্যনাথই আউলিয়া চাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ।

সমাপ্ত ।

মালা ও তিলক।

ভূবন-পাবন বৈষ্ণবগণ মালা ও তিলক ধারণের বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু আজকাল শিকার দোষেই চটক অথবা অন্য যে কোন কারণেই চটক, মালা তিলকের উপর কেহ কেহ বিশেষ কটাক্ষ করিয়া থাকেন, অবশ্য আমরা একথা স্বীকার করি যে, অনেক ভক্ত, হারাচাঁদী ব্যক্তি মালা তিলক ধারণ করিয়া বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ পূর্বক অনেক গতিত ক'বা করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া মালা তিলকধারী ব্যক্তি মাত্রকেই দোষী বলি কি প্রকারে?

নিষ্ঠানান ভ্রাস্কণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি বেচ সমুদয়ে কদাচারী লোক ভাঙা হইলে কি আমরা ভ্রাস্কণ মাত্রকেই দোষী বলিতে পারি? তুমিও লোক, আমিও লোক, আব রাম, শ্যাম, যতুও লোক কিন্তু ইত্যদি মধ্যে যদি কেহ একজন চোর বা বদুয়াইস হয় তাহা হ'লে কি আমরা সকলেই দোষী হইব? বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া যদি কোনও অপরিমিতাঙ্গী অসংযত-চিত্ত ব্যক্তি কোনও রূপ প্রদান করে তাহা বলিয়া মালা তিলকধারী বৈষ্ণব মাত্রকেই আমরা উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারি না, বা তাহা দেখা উচিতও নয়।

প্রকৃত বাহারা। বৈষ্ণব, প্রকৃত বাহারা শুদ্ধ, প্রকৃত যোগী সাধক আর ভগবৎপাসনা দ্বারা বাঁহারা জীবন ধন্য করিতে যথার্থই প্রায়শী তীতার বাহারা। যে, মালা তিলকধারী শত্রু সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে ২৪ জন শুদ্ধ ধর্ম্মধরী থাকিলেও ইহাতে স্থগারী কিছু নাই অধিকন্তু তাহা শুদ্ধ নয় সেবকদের চিহ্ন নয় বাহারা বিশেষ সম্মানের সহিত বৈষ্ণবগণ তাহা করিয়া থাকেন। কোনও শুদ্ধ লোক বাহাডীতে দাসত্ব করিতে হইলে তীতার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণ করা যেমন অসম্ভব তদ্রূপ এবং তাহা যেমন স্থগারী নয় ইহাও তদ্রূপ।

সাধারণতঃ দেখা যায় তুমি আমি হয়তো আদালতে প্রবেশ করিয়া চাক্ষুশের নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করিবে হয়তো শ্রমিত না কিছু একটা চাপরাশ লইয়া হয়তো তোমার আবার অপেক্ষা অস্তি নীচ জাতি ও অন্ধ শিকিত একজন

সামান্য ব্যক্তি অনায়াসে হাকিমের নিকট গমনাগমন করিবে । দে যেমন প্রভুর প্রদত্ত চাপরাশের বলে নিঃসঙ্কোচে আপন প্রভুর নিকট ষায় বৈষ্ণবগণও মালা তিলককে প্রভুর নিকট যাইবার এবং তাঁহার নিজজন বলিয়া পরিচয় দিবার একটা প্রধান চাপরাশ বলিয়া মনে করেন । তবে দেশ কাল পাত্র ও সম্প্রদায় ভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইতে পারে, এইমাত্র প্রভেদ, কিন্তু কোননা কোন চিহ্ন ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই মনে হয় ।

যাহার দাসত্ব স্বীকার করিলাম তাঁহার প্রদত্ত চিহ্ন ধারণে যদি সঙ্কুচিত হই তাহা হইলে যে প্রভুর অপমাননা করা হয় তাহা অনেকে বুঝেন না, তাই বর্তমান সময় কেন জানিনা কেহ কেহ বৈষ্ণবদিগের মালা তিলক দেখিয়া হাসিকা তুচ্ছন করিয়া থাকেন । এবং এই মালা তিলক ধারী বৈষ্ণব ধর্মকে অসত্য-অনোচিত-ধর্ম বলিয়া ব্যঙ্গ্য বরিয়া আপন আপন বিদ্যা-বুদ্ধির প্রধনতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন । এই মালা তিলক ধারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে আমরা বর্তমানপ্রবন্ধে কেবল মাত্র তাহার ২৪টি বেবাইয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব । তিলক ধারণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ সাধাঃ পিতৃতর্পণম্ ।

ব্যর্থং ভবতি তং সর্কর্মূর্ধপুণ্ড্রং শিনা দৃতম্ ॥

অর্থ্যং উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া * যজ্ঞ, দান, তপঃ হোম, বেদাধ্যয়ন, পিতৃতর্পণাদি যে কোন কার্য্য ধর্মার্থে করা হয়, তং সমুদায়ই ব্যর্থ হইয়া থাকে । পশুপুরাণে পরম ভক্ত নারদকষি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, বহাদর কপালে উর্ধ্বপুণ্ড্র নাই তাহাকে দর্শন করিবে না, কারণ উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ কিহীন লোকটী আশানলয় পরিত্যজ্য । যথা,—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্ধপুণ্ড্রং শিনা দৃতম্ ।

উভব্যং নৈব তং আবং শাশানমদৃশং ভবেৎ ॥

আবার স্বল্প পুরাণে কাস্তিক-পত্রের লিপিত আছে;—

উর্ধ্ব পুণ্ড্রো মুদা লভ্যো লগ্নাটে যমা-সম্যক্ত ।

চণ্ডালেহপি বিশুদ্ধঃ স্যাদতি বক্ষসনাতনম্ ॥

* নামবার অগ্রভাগ হইতে কপাল পর্ষ্য উৎসবে যে তিলক তৈলকে উর্ধ্ব পুণ্ড্র বলে

অর্থাৎ বাহ্যিক কপালে মৃদয় খেত উর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্টি গোচর হয় তিনি চণ্ডাল
হইলেনও পবিত্র এবং সনাতন ব্রহ্মলান্ধে সমর্থ । আশাব বলিয়াছেন ;—

উর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীবর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতঃ যশঃ ।

উর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা মুক্তিকর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতোহরিঃ ॥

অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্রে লক্ষ্মী অবস্থান করেন, উর্দ্ধপুণ্ড্রে যশের অবস্থান উর্দ্ধ-
পুণ্ড্রে মুক্তি এবং উর্দ্ধ পুণ্ড্রেই শ্রীহরির বাসস্থান ।

এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে,
উর্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক) কখনই নিম্ননীয় নহে । ইহা নিশ্চয়ই পরম মতনের কারণ
হুতরাং ধর্ম্মার্থী, যশার্থী, মুক্তিকামী এক কথায় মঙ্গল প্রার্থী ব্যক্তি যাত্রেরই
তিলক ধারণ অবশ্য কর্তব্য ।

উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যে স্থানে যে ভাবেই দেহভ্যাগ করুননা কেন, আর
তিনি যে কোন জাতিই হউন না কেন, তিনি অন্তে বিমান যোগে শ্রীভগবদ্ধায়ে
ধাইয়া পরম হুখে কাল বাপন কবেন, ইহা ব্রহ্মাও পুরাণে স্বয়ং ভগবান নিজ
মুখেই বলিয়াছেন যথা, —

উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্যো য্নয়তে যত্র কুত্রচিৎ ।

ঋণাকোহপি বিমানেষ্টা মমলোকে মর্হীষতে ॥

অন্যত্র ;—

উর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্যো গৃহে যস্যামমুতে ।

তদা বিংশত্ব কুলং তস্য নরকাস্ত্রদ্যরামাহম্ ॥

অর্থাৎ উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি বাহার গৃহে আহার করেন আমি (শ্রীভগবান)
তাঁহর বিংশতি পুত্রকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি । পাঠকগণ,
তিলক সম্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি
করিতে চাহিনা । যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়, যদি মহাজনগণের বাক্য,
ঋতাদিগের আচরণে বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তিলক ধারণ যে কখনই
উপেক্ষণীয় নহে বরং পরম আদরণীয়—পরম মঙ্গল পরিপূর্ণ, তাহা আমাদিগকে
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ।* অতঃপর মালা ধারণ সম্বন্ধে ২১টা প্রমাণ

*কোন সম্প্রদায়ের কি ভাবের তিলক করিতে হইবে তাহা নিজ নিজ
ভক্তর নিকট জ্ঞাতব্য ।

দেখাইয়াই আবার আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের উপলব্ধি করিব। গুরুড পুরাণে উল্লেখ আছে ;—

বারম্বন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবৃক্ষাঃ ।

নরকান্নিধর্তন্তে দক্ষাঃ কোপাশ্বিনা চরেতঃ ॥

অর্থঃ—যে সকল পাপমতি তাকিকগণ মালা ধারণ করেনা বা মালা ধারণ করার প্রতি বিদ্বেষ জ্ঞান পোষণ করে তাহারা নিশ্চয়ই চরিত্র-কোপানলে নষ্ট হইয়া অনন্ত কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। বিমূৰ্খমোহিতের শ্রীভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন,—

ভুলমীকটমালাক কর্ণস্থং বহতে তৃণাঃ ।

অশ্যশৌচোহপ্যনাচারো মামেবেতি ন সংশয়ঃ ॥

অর্থঃ—যে ব্যক্তি পবিত্র ভুলমী-কাঠ-নির্মিত মালা গলদেশে ধারণ করেন তিনি আচারদণ্ড অপবিত্র হইলেও আমাকে (শ্রীভগবানকে) লাভ করিয়া ধন্য হন। এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

পাঠিকগণ। আমাদের শাস্ত্র যখন মালা ও তিলক ধারণের অমুমোদন করিতেছেন এবং তাহার অন্যথা নরক ভোগ প্রভৃতির ভয় পর্যন্ত দেখাইতেছেন আর আমরা যখন আমাদের নিম্ন নিম্ন পণ্য শাস্ত্রের আদেশানুসারেই পরিচালিত চেষ্টা থাকি তখন মালা তিলক ধারণ কখনই উপেক্ষণীয় নহে। এত প্রমাণ প্রয়োগ সত্ত্বেও যদি আমার ইচ্ছা না হয় তবে আমি না হয় মালা ধারণ নাই করিলাম কিন্তু সাবধান মালা তিলকধারীকে দেখিয়া কখনও ঘেন ঘৃণা বা বিদ্বেষ জ্ঞান মনে না আসে। আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ‘চ’চরটী যাঁহা প্রমাণ নিবদ্ধ হইল তাহা হইতেই মালা তিলকধারীরা প্রতি ঘৃণা করা বা তাঁহাদের দেখিয়া নাসিকা কুণ্ডিত করিয়া পাগের বাক্য বাকি করা রোগ সন্ধান হ্রস্ব হইবে। আর এই সংকামক ব্যাধি যাঁহাতে একেবারে সমাজ হইতে দূর হয় তাহা যেরূপে সুযোগ সচেত হউন ইহাই বঞ্জনীয়।

শ্রী:—

রাধা ও গোপীকার আত্মসমর্পণ-তত্ত্ব।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ।)

—:—

ধর্ম সংস্থাপন ও ভক্ত-কামনা পূরণের জন্ত শ্রীভগবানের লীলা মেঘ-ধারণ যেমন আবশ্যিক, আবার সেই লীলা রস-সন্তোগের জন্ত সপিতৃপিতৃনীর তদাভ-প্রাণ উপাসিকা বা একনিষ্ঠ ভক্তেরও তদ্রূপ প্রয়োজন। অবতারবাদের উদ্দেশ্যই জীব যাতাতে অধর্মের উপর ঘৃণা, ধর্মের উপর শ্রদ্ধাবান হইয়া সৃষ্টি সার্থক করে, উদ্ধারের সরল সচজ উপায় লাভ করিয়া কলকলতা হয়। অবতার-বাদের উদ্দেশ্যই ভগবানে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেওয়া, সপঞ্চা পরিচয় করিয়া অভ্যেচন শরণ লওয়া উপায় করা, ভক্তগণকে অনিপচনীর লীলারস-সন্তোগ করাইয়া কৃতার্থ করা। জীবকে শিক্ষা দেওয়াই বল, রস সংস্থাপন করানই বল, আর আত্মসমর্পণের আদর্শ দেখানই বল, অবতারবাদেই সচজ তাহা সিদ্ধ হইতে পারে। অবতারবাদ আমাদের মনোভাব ধর্মের একদিক্ মাত্র বটে কিন্তু সেইদিকটিকেই শুদ্ধজ্ঞান সচেতন আত্মাণেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবতারবাদ সকল ধর্মে মানিয়াছে কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মে তাহার যথাযোগ্য অঙ্গর যেমন হইয়াছে যেমন রস-সন্তোগ উপলব্ধি হইয়া থাকে, অতঃপর মেরুপ ছন্দ 'ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সঙ্গ ধর্ম বিমজ্জন দিয়া, আপনাব ব্যক্তিগত পার্থক্য ভুলিয়া গিয়া কি ভাবে তাঁহাতে মিশিতে হয়, তাহার আদর্শ ভগবৎকে শিক্ষা দিবার জন্তই শ্রীরাধা ও গোপীকার গোপীকরণের জন্ম। রাধা ও গোপীকারা অথবা লীলা-রস-সন্তোগ করিবার জন্তই ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্ত ব্যস্ত হন নাই, তথাপি উহা আপন্য হইতেই সিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। জীবহিত সিদ্ধ না হইলে তাহার প্রকৃত সার্থকতা কি প্রকারে তরবে।

ভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সত্তা মিশাইয়া দেওয়া সাধারণ জীবের পক্ষে হুসাহা। কিন্তু লক্ষ্মীকর্ণী ব্রহ্মশক্তি ঐক্যপ্রাণা সোলোকাধিবরী শ্রীরাধার পক্ষেই তাহা সম্ভব, তাই গোপীকুলে ইহার আধিভাব। সে প্রদরে কেবল

করুই ছিল। ধর্ম লজ্জা, ভয়, প্রণমাবসার থাকিলেও শেষে আর তাহা ছিল না। লাজনা গল্পনা ভিবঙ্কার এমন কি প্রহারাশঙ্কা পর্য্যন্ত অল্প ভূষণ করিতে হইয়াছিল ভগবানে প্রেম ও প্রবৃত্ত আত্ম-বিস্মৃতিকারী তন্ময়তা জন্মিয়াছে কি না, আর জন্মিলেও তাহা চিরস্থায়ী ও দৃঢ় কি না তাহার পরীক্ষা আবশ্যিক। এই পরীক্ষায় টিকিলেই বোঝা যাইবে, প্রেম বাস্তবিকই গাঢ়, ভগবানে দিব্য উপযুক্ত, তাঁহাকে আশ্রিত করার যোগ্য কি না। বিরহই প্রেমের পরিপূষ্টি করে, প্রগাঢ়তা আনয়ন করে, মালিন্য কাটাইয়া বিশুদ্ধ করিয়া তুলে, তাই স্ত্রীরাধা বিরহিনী। বিরহে রাধার যে আকুলতা, উহা পরমাত্ম লাভের জন্য জীবেরই আকুলতা। অন্ততঃ ঐকপ আকুলতা, ঐকপ তন্ময়তা, ঐকপ বিরহোন্মাদ, ঐকপ সর্বস্বাধা উপেক্ষা জীবের হইলেই যে সেই প্রেম সার্থক, সেই জীব কৃতার্থ।

গোলোকেশ্বরী, ব্রহ্মশক্তিকপিনী, শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়িনী বলিয়া সুখোষ্ট একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের আদর্শ, শ্রীকৃষ্ণের জন্য সন্তোষাগিনী, শ্রীকৃষ্ণে আপনার অভিক্ষেপ বিসর্জন কারিণী হইতে পারেন। কিন্তু তাহা বলিয়া অগ্নরে হঠবে কিরূপে ? ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মপ্রতিভা, গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণা। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই, কিন্তু সে আদর্শ জীব লইতেই পারেনা, সে আদর্শ লইবার ভরসা পর্য্যন্ত কাবও পারেনা—এই আশঙ্কা এই নির্ভরসা প্রত্যেক জীবেরই বন্ধি হয়, তবে পরে জীব ভগবানে প্রেম দিবে কেমনে। আপনাকে ভগবানে মিশাইবে কেমনে ? তাই গোপিকারা জন্ম গ্রহণ করিলেন, অগংস্বামী দেখিল, সাধারণ জীবরূপা গোপনারায়ণ পর্য্যন্ত এই প্রেমের অধিকারিণী হইল এই আনন্দাসাদে কৃতার্থ হইল। জগৎ বিস্তৃত চক্ষে চাহিয়া দেখিল তাহাদের এই বিস্ময়কর এক অপূর্ণ ভগবানে সর্বধর্ম ত্যাগ! গোপনারায়ী বাহা পারিল, স্বামী প্রভৃতির শাসনে বাহা পারিল, কুলনিন্দা প্রভৃতি প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া বাহা পারিল, তাহা সকলেই পারিবেন না কেন ?

শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্ব অর্পণ করা বড় সহজ কথা নহে। রাধা ও গোপিকারা ঐ অর্পণ করিয়াছিল। নদীর বেগ বাধা পাইলেই তার গুরুত্ব বোঝা যায়। সাধুতার পরীক্ষা বিপদের মুখেই স্বাধীন হইয়া থাকে। গোপীকাদের অষ্টভুজী প্রেমও সকল বাধা বিধ অতিক্রম করিয়া প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। মিলন

অপেক্ষা বিরহই ভগবৎ প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ ভক্তি জন্মাইয়া দেয়, প্রেমের পরিপূষ্টি করিয়া ক্রমে তাহাকে প্রবল গাঢ় উদ্যম পবিশেষে অহৈতুকী প্রেমে পরিণত করে। “বিরহে তন্ময়ং জগৎ” বিরহে তন্ময়াবহাব প্রায়জন সম্মুখে মূর্তিমান হইয়া উঠে, অপার্থিব অনির্বচনীয় এক অনন্ত সুখের প্রবাহ ছুটে। মিলনে বাহু জগতের অস্তিত্ব, অনেকটা বিদ্যমান থাকে কিন্তু প্রকৃত বিরহে ঐ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাহু জগতের বাহুভাব লোপ ব্যতীত অন্যত তন্ময়তা হয় না। বিরহে অন্তর্জগতের এক অপূর্ণ চিত্রই মনসপটে ছুটিয়া উঠে।

“সর্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেবং শরণং ব্রজ” সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ লও ইহা ভগবানের উক্তি। সর্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ স্ত্রীলোকের পক্ষেও উপদিষ্ট। অহুধর্ম্ম অপেক্ষা স্ত্রী সম্বন্ধ-ধর্ম্ম লজ্জার ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন, তাই বিশেষরূপে লজ্জা ধর্ম্ম ত্যাগও ব্যাবস্থাপিত হইয়াছে। স্ত্রীজ্ঞান, সহজ লজ্জা বোধ থাকিলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা হয় না, সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন লিখা একান্ত মিলনের অপূর্ণ আনন্দলাভ করা যায় না, প্রকৃত অহৈতুকী প্রেমের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করার মৌলভাগ্য জন্মে না। রূপ, যৌবন, স্ত্রীজ্ঞান, লজ্জা সম্বন্ধ যদি থাকিল, তবে ভগবানে মৌলভাগ্য কে চতুল?

জীবমুক্ত * ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ অবিদ্যা নাশ করিলেও দেহপাত পর্ষ্যন্ত ঐ অবিদ্যার সংস্কার বর্তমান থাকে। অর্থাৎ সংস্কাররূপ অবিদ্যাই বর্তমান থাকে। অবিদ্যা কার্য্য দেহ থাকিলে চলে না। কেন না দেহ ধরণই তাহা হইলে আর সম্ভব হয় না। সংস্কাররূপ অবিদ্যার বিদ্যমানতায় কোন ক্রটি নাই। এতদ্ব্যতীতে গোপীকাকার লজ্জা ত্যাগের মধ্য সম্বন্ধে বা সংস্কার-রূপে যদি লজ্জা ছিল মানিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কাররূপ লজ্জা থাকিলেও কোন ক্রটি নাই অর্থাৎ সর্বধর্ম্ম ত্যাগের কোন ত্রুটি হয় না, ত্রীশোক এই জ্ঞান তাই হইবে না। দেহপাত পর্ষ্যন্ত স্ত্রীজ্ঞান লোপ পরিত্যক্ত সম্ভাবনা নাই, তবেই স্ত্রী সহজ ধর্ম্ম লজ্জা সম্পূর্ণ সংস্কাররূপেও যে লোপ পাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। দেহ থাকিলেই দেহ ধর্ম্ম কোন না কোন আকারে লক্ষিত হয়। স্ত্রী

* এই স্থান এইতে বাহ্য বলিষ্ঠাম হারা দিষ্ট হইলে বা পূর্ণসংস্কারে পার্শ্ববর্গ গ্রহণ করিতে পারেন লেখক, ৭

জ্ঞানের সঙ্গে কোন না কোন রূপে লজ্জা না থাকিয়া পারে নাই । আর একত
 ত্রীকণের সহিত রসলীলা সন্তোগ কালে গোপীকাদের ক্রৌঞ্চজ্ঞান অর্থাৎ তাহারা
 ক্রীলোক যুবতী কুলবধ ইত্যাকার বোধ সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হইয়াছিল, সমাধি
 অবস্থার মত ভেদ বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিদ্বস্ত হইয়াছিল বলিয়া যদি মানাও যায় তবেই
 রস-সন্তোগ বিচ্ছেদ অবস্থায় ঐ ক্রৌঞ্চজ্ঞান যে সমাধি ভঙ্গের পর ভেদ বুদ্ধির
 মত আবার ফিরিয়া আসিবে, ইহাও মানিতেই হইবে । তাহা হইলেই একত
 প্রস্তাবে ঐ ক্রৌঞ্চজ্ঞান হৃদয় আকারে বা সংস্কার রূপে এরূপ সন্তোগ কালেও
 বিদ্যমান ছিল । গোপীকাদের সে বিষয়ে কোন বোধ ছিল না বটে কিন্তু
 অজ্ঞাতভাবে তাহা যে ছিল, তাহাও সন্দেহ নাই । কারণ যদি ঐ সময়ে
 সংস্কাররূপে না থাকিবে, তবে তাহারা আসিল কোথা হইতে ? লজ্জা
 ব্যাধিচারী ভাব কখন জন্মে কখন নাশ পায়, ইহা মত কিন্তু ক্রৌঞ্চ জ্ঞানত
 লেগে নহে । রসসন্তোগ কালে প্রাণের অবস্থাই হৃদয়াকারে সংস্কাররূপে
 বিদ্যমান থাকিবে তবে সহজ লজ্জা ও হৃদয়াকারে বা সংস্কার রূপে হইবে বা থাকিবে
 না কেন ? সমাধি অবস্থায় ভেদজ্ঞান থাকে না কিন্তু ঐ সময়েও হৃদয়াকারে
 সংস্কাররূপে ভেদ বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, নচেৎ ভঙ্গের উপর পুনরায় আসে কোথা
 হইতে ? ভেদ বুদ্ধির কারণ অবিদ্যা দেহপাত পঞ্চাত্ত সংস্কাররূপে থাকে বলিয়াই
 ভেদ বুদ্ধিও সংস্কাররূপে না থাকিয়া যায় না । অনুভূত অজ্ঞাত অদৃষ্ট
 থাকিলেই যে তাহা থাকে না এমন নহে ।

ক্রীরাধা ও গোপীকাদের ঐ ক্রৌঞ্চজ্ঞান এবং ঐ সহজ ক্রী ধর্ম লজ্জা, সম্পূর্ণ
 নষ্ট হইয়াছিল কিনা ? সংস্কাররূপে বিদ্যমান ছিল কিনা ? রসসন্তোগকালে
 সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে তাহার পুনরুৎপত্তি সম্ভব কি প্রকারে ? জীবমুক্তের সংস্কার
 রূপে অবিন্যাস স্থিতির মত এই সংস্কাররূপে ক্রৌঞ্চজ্ঞান ও তৎ সহজ ধর্ম লজ্জার
 অবস্থিতি সকল বৈধব্য মতের অনুরূপ, কিম্বা প্রতিকূল এইরূপ কতকগুল
 সন্দেহ আমার মনোমধ্যে অনেকদিন হইতে জাগরুক আছে । বাকীপুর
 সাহিত্য সম্মেলনের দর্শন শাখার একজন প্রবন্ধ পঠকের প্রবন্ধ সমালোচনা
 উপলক্ষে সন্দেহগুলি আমি উত্থাপন করিয়াছিলাম । ব্রহ্মবিদ্যার অন্যতম
 সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও টাকীর বদান্য জমীদার
 শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়দ্বয় এই সন্দেহ গুলির সমাধানের বন্ধ

করেন। তদুপলক্ষে কতকটা বাদ প্রতিবাদও হয়। পূর্ণেশ্বর বাবু ও যতীন্দ্র বাবু উভয়ে একমত হইলেন না। এক্ষণে আমি প্রবন্ধেও সন্দেহ স্থান প্রকাশ করিলাম। বৈষ্ণবগণে সম্যকভিত্তি কোন মহাজন যদি যুক্তি সাধ্যাঘ্যে তাঁহাদের ধাঁটী বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে বড়ই সুখী চই, আর দেশের লোকও পড়িয়া জানিবা তত্ত্ব হইতে পারেন। আমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহার অনুবল বা প্রতিকূল বাহা হউক না কেন, আমি তাহাই যুক্তি যুক্ত হইলে লইতে প্রস্তুত আছি। আমার সিদ্ধান্ত আমি পুনঃপক্ষ যাত্র বলিয়া বুঝিয়া লইতে কিছুমাত্র কুন্তিত হইব না। ভাবের দিক দিয়া এবং বৈষ্ণব দার্শনিক গণের যুক্তির দিক দিয়া ইহার আলোচনা হউক, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা, বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রে স্যাক্ অভিজ্ঞ কেহ এই কাণ্ডে তত্ত্বক্ষেপ করিলে বড়ই কৃতার্থ হইব। আশা করি ভক্তি সম্পাদক মহাশয়ও আশা অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার সাধ্যমত কিছু যত্ন লইবেন।*

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া ভ্রম।

(লেখক।—পণ্ডিত দ্বৈত বাধাবাস্তব গোস্বামীজী।)

(অবশিষ্টাংশ।)

—:—

শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট কাল ও আউলে চাঁদের প্রকাশ কাল আর তিনশত বৎসর ব্যাপন। সে কারণ কোন বৈষ্ণব, বৈষ্ণবই আ বলি কেন, কোন সুধাব্যক্তিই আউলে ট দ যে শচীনন্দন মহাপ্রভু একথা কর্ণে শুনিতেও পারেন না। অমরাও বলি যে সকল কমলপ্রভ ব্যক্তি এমন প রচিত মিথ্যা কথার কর্ণপাত করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব অপরাধী হইলেন। তাঁহারা একরূপ কথার ভুল ক্রমেও যেন কখন আস্তা স্থাপন না করেন।

* এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যিক বলিয়াই আমার মনে হয়। বৈষ্ণব সমাজের পণ্ডিত মণ্ডলী এ বিষয়ে সাধ্যমত যত্ন লয়েন ইহাই বাহুল্যের পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিমত জানিতে পারিলে আমাদের বক্তব্য শেষে প্রকাশ করিব। (ভ:সঃ)

আউলে চাঁদ মহাপুরুষ হইতে পারেন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত উত্তম মত হইতে পারে, তাই বলিয়া আউলে চাঁদকে আমরা মহাপ্রভু গৌরানন্দেবের প্রকাশ বলিতে পারি না এবং তাঁহার মতের সহিত যে কোন অংশে ও বাক্য মতের মিল আছে তাহা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না। একারণ পুনঃ পুনঃ আমাদের অসুযোগ কেহ যেন “কর্তৃত্বজ্ঞা সম্প্রদায়কে চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া মনে না করেন বা কাহারও কথা শুনিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

একণে আমরা পূর্নজন্মিত জাল প্রতাপ চাঁদ সম্বন্ধে বিকিং বিবৃত কর সম্বৃত বোধে ৩৯শ্রীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত “জাল প্রতাপচাঁদ” নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ সাধারণের গোচরণে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ বিচার করিয়া লইবেন।

“প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে কোন একজন সম্যাসী বদ্ধমানের মহারাজ প্রতাপ চাঁদের মৃত্যুর ষাটশ বৎসর পরে বদ্ধমানে আসিয়া নিজে প্রতাপ চাঁদ বলিয়া প্রকাশ করেন। সে সময় রাজস্বামত পরাগবাবু অধিকপে বদ্ধমানের রাজকাৰ্য্য পর্যালোচনা করিতেছিলেন। তিনি সম্যাসীর এই দৃষ্টতা দেখিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে তাহাকে বদ্ধমান হইতে বাহ্যত করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু এই সম্যাসীর পক্ষে অনেক ধনী ও অগ্রাহ্য স্থানের রাজা জমিদার গণ সহায় হওয়ায় পরাগবাবুর সহিত রীতিমত মোকদ্দমা চলিতে থাকে। সম্যাসী নিজকে রাজা প্রতাপ চাঁদ বলিয়া প্রমাণ করার পক্ষে এই কথা প্রকাশ করে যে কোন হুজিয়ার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ত পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার ষাটশ বৎসর অন্ত্যস্তবাস প্রয়োজন হয়। তিনি কোন সম্যাসীর নিকট পৌড়িতের ভান ও মৃতপ্রায় হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন একণে তিনি পৌড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইলে বদ্ধমান রাজবাটীর প্রধামতে তাঁহাকে কালনার রাখা করা হয় এবং গঙ্গায় অন্তর্জলি করিবার সময় তিনি শববাহকদিগের হস্ত হইতে অপসৃত হইয়া গঙ্গায় ডুবিয়া বান্। এই সময়ে তাঁহারই নির্দেশমত পূর্ন হইতেই তাঁহার বতিপন্ন বহু গঙ্গা বকে নৌকা লইয়া তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, একণে তাঁহাকে লইয়া তাহার প্রস্থান করেন। সে অবধি তিনি সম্যাসীর বেশে ষাটশ বৎসর কাল নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন। পরে

আৱশ্চিক্তেৰ নিদিষ্ট কাল অন্তে বৰ্দ্ধমান ৰাজধানীতে কৱিয়া আশিয়াছেন ইত্যাদি।

এ সকল কথা অসম্ভৱ ৰূপে গৃহীত হয় নাই। সম্ভাসী মোকৰ্দ্দমা কৱিয়া হাৱিয়া বান; তাহাৰ বিৰুদ্ধে সুশ্ৰীম কোৰ্টেৰ অজ বাহাদুৰগণ এই আদেশ প্ৰদান করেন যে সম্ভাসী প্ৰতাপ চাঁদ নহেন, তিনি প্ৰতাপ চাঁদ নাম ধারণ কৰিতে পাৰিবেন না এবং বৰ্দ্ধমান ডিভিজনৰ মध्ये কোথায়ও থাকিতে পাইবেন না।—

এই কঠোৰ দণ্ডজ্ঞা প্ৰচাৰিত হইলে সম্ভাসী বৰ্দ্ধমানৰ মহাৰাজ যুত প্ৰতাপ চাঁদ নহেন, তিনি জাল, এই কথা বৰ্দ্ধমান প্ৰদেশে ঘোষিত হইলে, তিনি গঙ্গা নদী পাৰ হইয়া নদীয়া জেলাৰ কাঁচড়া পাড়ায় সম্বন্ধে কুদ্ৰ কুদ্ৰ এয়ে আসিয়া আশ্ৰয় লহেন। এবং নিজকে 'সত্য নাথ' বলিয়া প্ৰচাৰিত করেন।

এই সত্যনাথ পাগলপ্ৰায় হইয়াছিল। তাহাৰ ক্ৰিয়া ও আচৰণাদি দেখিলে তিনি হিন্দু কি মুসলমান ককিৰ তাহা সকলে বুঝিতে পাৰিত না। ইহাকে লোকে আউলে চাঁদ বলিয়া ডাকিত। আউলে শব্দেৰ অর্থ পাৰসিক ভাষায় বুজুৱাক অৰ্থাৎ কোন দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি।

এই ককিৰেৰ অলৌকিকী শক্তিৰ কথা কৰ্ত্তাভজাদিগেৰ মধ্যে প্ৰচলিত আছে। অন্ধেৰ নয়ন, অপুত্ৰকে পুত্ৰ, দৰিদ্ৰেৰ ধন যুতৰ জীৱন লান ইত্যাদি অনেক প্ৰকাৰ অলৌকিক কাৰ্য্য দেখাইয়া তিনি স্বীয় মতাবলম্বীদিগকে বিমোহিত কৰিয়াছিল। এবং তৎকালীন বহুতৰ ব্যক্তিকে আপন মতে আনিয়াছিল। জাল প্ৰতাপ চাঁদ বলিয়া যিনি ইংৰাজ সরকার বাহাদুৰ কৰ্ত্তৃক বৰ্দ্ধমান বিভাগ হইতে নিৰ্বাসিত হইয়াছিল তাহাৰ যে কতকগুলি অলৌকিক শক্তি ছিল মোকৰ্দ্দমা কালে তিনি নিজে সে সকল কথাৰ উল্লেখ কৰিয়াছিল। মোকৰ্দ্দমাৰ সময় বড় বড় লোকে তাহাৰ সাহায্য কৰায় মোকৰ্দ্দমা অন্তে তাহাৰ হাতে কিছু অৰ্ঘও ছিল। ইনি দেখিতে অতি সুন্দৰ ৰূপবান পুৰুষ ছিলেন। লোক ৰঞ্জন কৰিবায় বিশেষ শক্তি ছিল। 'সত্যনাথ' নাম ধারণ কৰিয়া ধৰ্ম্মমত প্ৰচাৰ করেন। ইহাৰ মতে কোন শাস্ত্ৰ এখেতৰ আদেশানুযায়ী বলিবায় প্ৰয়োজন নাই। দেব দেৱীৰ পূজাৰ বা আৱাধনাৰ আবশ্যক নাই। জগতে কেবল ঈশ্বৰই সৰ্ব্বময় কৰ্ত্তা সেই কৰ্ত্তাৰই তত্ত্বনা কৰ। কাৰকৰ্ম্ম, মনকৰ্ম্ম ও বাহকৰ্ম্ম

রূপ কুজ করিও না । সদা সত্য বলো । সত্যই সার ধর্ম । ইহার সম্বন্ধে কর্ত্তাভজ্ঞানিগের মধ্যে যে গীত প্রচলিত আছে তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম ।

‘এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো ।

এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ মুখে বলে সত্য বলো ॥

এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একটা মন,

বাহু তুলি করে প্রেমে ঢলাঢল ॥

এ যে হারা দেওয়ায়, মর বাঁচ'র, এর হকুমে গঙ্গা জপালো ॥’

‘সত্য’ শব্দ কর্ত্তাভজ্ঞা দিগেব ‘মন্ত্র’ । ইহাদের অনেক গানে সত্য শব্দ সংযোজিত । এমন কি হরিনামিগের পু- কন্যাগণের নামে সত্য শব্দ যুক্ত হইয়া থাকে । যথাঃ—সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যকিশর সত্যবাণী প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয় ।

পূর্বে যে আউলে চাঁদের ২০ জন শিষ্য কথা উল্লেখ করা গিয়াছে । কর্ত্তাহারা প্রধান অচর ছিলেন । ইহাদের নাম ১ নন্দ, ২ লক্ষ্মীকান্ত, ৩ হট-
ঘোষ, ৪ বেচুঘোষ, ৫ রামশরণ পাল, ৬ নিত্যানন্দ দাস, ৭ খেলারাম উদাসীন,
৮ কুমদাস, ৯ হারি ঘোষ ১০ কানাই ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই ঘোষ,
১৩ আনন্দ লাল গোসাঁই, ১৪ মানোদর দাস, ১৫ বিষ্ণুদাস, ১৬ কিশু ১৭
গোবিন্দ, ১৮ শ্যাম কঁাসারি, ১৯ ভোমরায় রত্নপুত্র, ২০ পাঁচুকাঁদাস, ২১ নিধি-
রাম ঘোষ, ও ২২ শিশুরাম । এই বাইশজন শিষ্যের নাম কর্ত্তাভজ্ঞানিগের
মধ্যে পুরুষ পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিতেছে কিন্তু এক্ষণে এক রামশরণ পালের
বংশ ও প্রচারিত মত ভিন্ন অত্র কাহারও বংশের নাম ধাম ও পরিচয় সন্নিবে
পাওয়া যায় না ।

আউলে চাঁদের ২২জন শিষ্য সম্বন্ধে কর্ত্তাভজ্ঞানিগের মধ্যে একটি ঘটন
প্রচলিত আছে ।

‘আউলে চাঁদ দোহা গক

সঙ্গে বাইশ কাকির, বাছুর তার ।’

রামশরণ পাল আউলিয়া চাঁদের প্রিয় শিষ্য ছিলেন ইনি জাতিতে লক্ষ্যোপ
ইহার পিতার নাম নন্দ ঘোষ কখন ঘোষ তনয় পাল উপাধি প্রাপ্ত হইয়ন
তিব্বয়ে কিছু প্রকাশ নাই চাকমকের নিকট জগদীশ পুরাত্নে ইহার বাস ছিল
জগপুরের শিউ ঘোষের কন্তার সহিত প্রথম রাম শরণের বিবাহ হয় । এই

ত্ৰীয় গৰ্ভে রাম শরণের হই কন্যা হয়। কিছুদিন পরে স্ত্রী ও দুই কন্যার মৃত্যু হইলে রামশরণ কিছু উদাসীন ভাবাপন্ন হয় পরে পুনরায় গোবিন্দচোষের কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেন। এই সরস্বতীর সহিত আশ্রয়ের বড়ই মিল হয় উভয়ে অনেক সময় ভগবদালোচনার কাটাটেনেন। বিবাহের অল্পদিন পরেই রামশরণ বিবর কার্যেব প্রার্থনার সুবর্ত্তিপূর গ্রামে আসিয়া নিজ কুটুম্ব দিগের বাটিতে বাসা করেন। এই মুরতিপূর গ্রামই ষোষ পাড়া নাম পরে প্রসিদ্ধ লাভ করে। এক্ষণে জমীদার রায়রাঞান দেওয়ান পদ্বলোচন রায় বাহাদুরের বাটিতে আতিথ্য সেবার এক চাকরী প্রাপ্ত হন। এই কক্ষে প্রভুর সন্তোষ ও বিশ্বাস জনক কাব্য করায় “বিশ্বাস” উপাধি প্রাপ্ত হন। এবং জমিদার বাহাদুর উষড়া পরগণার একটি মহালে রামশরণকে নায়েব নিযুক্ত করিয়া পাঠান। এই স্থানে কিছুকাল নায়েবী করার পর একদিন কাছারী বাটিতে ইহার সহিত ঐ আউলিয়া চান্দ ফকীরের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়। রামশরণ পূৰ্ব হতে আতিথ্য ভক্ত, সাংঘিক ও পরমার্থ প্রিয় ছিলেন। ফকীরকে পাত্ৰ্য্য তিনি অতি ভক্তির সহিত তাহার সহিত আলাপ করেন এবং তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করেন। ফকীর স্নান করিতে গেলে রামশরণের পূৰ্ব সন্নিভ শূল বেদনা উত্থিত হইয়া যন্ত্রণার মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। এই ফকীর স্নানান্তে তথায় উপস্থিত হইয়া রামশরণের এই দুর্দশা দেখিতে পান। পরিচারক গণের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া সম্রাসী নিজ কমণ্ডলু হইতে যংকিকিং জল লইয়া নায়েবের মুখে ও চক্ষে দিবাশ্নাৎ রাম শরণ চৈতন্য প্রাপ্ত ও যন্ত্রণা মুক্ত হইয়া উঠিলেন। কিরূপে তিনি এইরূপ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন পরে অবগত হইয়া ঐ সাধুর প্রতি তাঁহার ঐক্যিকারী প্রজ্ঞা ও অচলা ভক্তি হইয়া উঠিল, তিনি সাধুকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু এদিকে ফকীর স্নানান্তে কাছারী বাটির নির্দিষ্ট ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইয়াছেন। সে ধ্যানের আর ভঙ্গ নাই, সমস্ত দিবা অবসান হইল রাত্রি হইতে চলিল তথাপি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। রামশরণ স্নানাহার ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার পর গৃহের বহির্ভাগে একটা প্রদীপ আলিয়া ফকীরের ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে নায়েব ব্যতীত বাসায় সমস্ত লোক নিদ্রিত হইলে ফকীর গৃহের

যার মুক্ত করিয়া বহির্গত হইলেন এবং কমণ্ডলু হস্তে লইয়া কাছারী বাটী ত্যাগ করিয়া চলিলেন । রামশরণ তাঁহার পশ্চাদমুসবণ করিতে লাগিলেন । সাধু পশ্চাতে নিরীক্ষণ করিবামাত্র রামশরণ সাধুর চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া “ঠাকুর আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গী করুন আমি আপনার সেবার নিযুক্ত থাকিব” ইত্যাদি কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন । ঠাকুর কহিলেন “আমি উদাসীন সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী, বিশেষতঃ তুমি যার পরিগ্রহ করিয়াছে কিঞ্চি সন্তানাদি হয় নাই, এক্ষণে তোমার সময় হয় নাই । তুমি আমার অনুগমন করিওনা । যথা সময়ে পুনরায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে । এক্ষণে আমি যে উপদেশ দিই তাহাই পালন কর এবং বজন বাজন পূর্বক আপনার ও অন্যের সঙ্গল বন্ধন কর ।” এই বলিয়া সাধু চলিয়া গেলেন ।

শুনা যার তদবধি রামশরণ বিষয় কাৰ্য্য ত্যাগ করিয়া মুরতিপুর প্রায়েয় সন্নিগোপ পন্নীতে আসিয়া বাস করিলেন এবং উক্ত সাধুর আদেশানুযায়ী স্বীয় মত বিস্তার করিতে লাগিলেন তাহার স্ত্রী এই মত প্রচারের বিশেষ সহায় ছিলেন বলিয়া শুনা যায় ।

ইহাব গর্ভে “রাম হুলাল” নামে পুত্র ‘অন্নদা’ ও ‘ভবানী’ নামে দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে । সরস্বতী অনেক দিন জীবিত ছিলেন । রামশরণের গদির মালিক হইয়া ইনি ‘কস্তা মা’ ‘সুতীমা’ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ইহার অনেক প্রভাবের কথা শুনা যায় । যদিও ইনি ত্রীলোক ইহারই সম্বন্ধ এই সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । আউলিয়া চাঁদ ফকীর ইহাকে বিশেষ অঙ্গুগ্রহ করিয়াছিলেন । এইরূপ প্রবাদ আছে যে রামশরণ মুরতিপুরে বাস করিলে একদিন একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাহার বাটীর পশ্চাদভাগে দাড়িম তলাব বসিয়াছিলেন । সরস্বতী কলসী করিয়া জল আনিতেছিলেন, ফকির তৃমার্জ লামাইয়া জল প্রার্থনা করিলে, সরস্বতী তাঁহাকে জলপান করিতে দেন । ফকির জলকুলি করিয়া সরস্বতীর কলসীতে প্রদান করিলে সরস্বতী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়েন এবং কাতরভাবে হায় বাবা কি করিলে, হায় বাবা কি করিলে বলিয়া কলসীটী ফেলিয়া দেন । সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া হাসিতে থাকেন । এমন সময় রামশরণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিজ গুরুকে নিজ বাটীতে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন । সরস্বতী জানিত না যে এই মহাপুরুষই

তাহার স্বামীর জল, এক্ষণে অবগত হইয়া বাবা রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া ককোরের পদ প্রান্তে কাঁদিয়া পড়েন। 'মা সতী' উঠা বলিয়া সম্বোধন করিলে স্বরস্বতী সন্ন্যাসীর পদ প্রান্তে অতি কাতরভাবে বসিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী 'মা সতী' তোমার কোন চিন্তা নাই এক্ষণে মন্ত্র গ্রহণ কর বলিয়া 'গুরু সত্য' এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, স্বরস্বতী সেকাল হইতে 'সতী মা' নামে বিখ্যাতা হইলেন। রামশরণ ঐ পরিত্যক্ত কলসীর জল পান করেন এবং তাঁহার স্ত্রীকেও পান করান। পরে কলসীহিত জল অতি বড় পুষ্কর রক্ষা করেন। বাহা ভূমিতে পতিত হইয়াছিল তাহা লোকে পাছে দলিত করে এই আশঙ্কায় কর্দ্দম সহিত তুলিয়া নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া আসেন। এই পুষ্করিণীর জল, এক্ষণে লোকে ব্যাধি মুক্তি নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সন্ন্যাসী ঠাকুর দাড়িম তলায় কিছুদিন বাস করিয়া চলিয়া যান। তিনি মধ্য মধ্য মুরতিপুর গ্রামে রামশরণ পালের বাটীতে আসিতেন। দাড়িম তলায় বাস করিতেন। আউলে চাঁদ ফাঁকর দেহ রক্ষা করিবার পুষ্কর সতীমাকে কদা, কমণ্ডু আশাবাড়ি প্রভৃতি প্রদান করিয়া যান এবং প্রত্যহ দাড়িম তলায় অর্চনা করিবার আদেশ করিয়া যান। এই হইতে ইহাদিগের আর্থিক অবস্থা ফিরিয়া যায়। রামশরণ পুত্র রাম হুলালকে তৎকালিক শিক্ষা প্রদান করেন। রাম হুলাল অতি বুদ্ধিমান বালক ছিল এবং রীতিমত পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গীত রচনায় শক্তি ছিল এবং অনেক রচনা করেন। ইনি সকল প্রকার লোকের বোধ হুলত, সামান্য সামান্য ভাষায় নূন্যাদিক আট দশ গীত রচনা করিয়া যান। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে এই সমস্ত গীতের নাম 'ভাবের গীত'। এই সকল গীতের কোন কোনটা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রানুযায়িত কোন কোনটা মুসলমান সম্প্রদায় সিদ্ধ কোন কোনটা তাহার নিজ অভিপ্রেত। সহজ ভাষায় গীত রচিত হইলেও অনেক গীতের ভাব বোধগম্য নহে। ইহা দিগের অর্থ এমন কি অনেক কর্তৃত্বজ্ঞও বুঝিতে বা বুঝিতে পারেন না।

রামশরণ বুদ্ধাবস্থায় হরি সংকীর্ণনের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণকে সংগ্রহ করেন এবং একটা গৃহ নির্মাণ করাইয়া সেই গৃহে নাম কীর্তন করিতেন, ঐ গৃহ এক্ষণে ঠাকুর ঘর নামে পরিচিত। আউলে চাঁদ মুসলমান ককোর নহেন, তিনি স্বয়ং মহাপ্রহু শচীনন্দন ঐক্য চৈতন্যদেব রামশরণই এই বলিয়া প্রকাশ

করেন এবং বৈষ্ণবগণকে বুঝাইয়াছেন যে, মহাপ্রভু অন্তলীলার শেষ ভাগে গোপীনাথের মন্দিরে অপ্রকট হইয়া অসঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশে ষোনাহু বলীগ্রামে আসিয়াছিলেন এই বিবরণ পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

রামশরণের মৃত্যুর পর সতীমা ষোষণাডায় গঙ্গির মানিক হলেন। রাম হুলালের সাহায্যে মাতা পুত্রে কর্তৃত্বভা মত্তের বহুল প্রচার করেন। ইহাদিগের সময় এই সম্প্রদায়ের বহুল শ্রীর্দ্ধি হয়। অশিক্ষিত ভ্রাতৃ বৈষ্ণবগণ আউলিয়া চাঁদকে মহাপ্রভু বিধানসে এবং রামশরণের প্রাজ্ঞে ও বৈষ্ণব রীত্যানুসারে মহোৎসবের প্রচলনে দলে দলে ষোষণাডায় গিয়া থাকে এবং তথায় গিয়া কীর্তন ও মহোৎসবাদি করিয়া থাকে।

রামশরণ পালের সময় কত্তাভজ্ঞাদিগের প্রভাব বৈচড়াপাড়ার চতুর্দিকস্থ গ্রাম সকলে প্রচারিত হয়। আউলে চাঁদ অর্থাৎ সত্যনাথ এই অবধিরে প্রবর্তক হইলেও রামশরণই এর সম্প্রদায়ের প্রথম প্রচার কত্তা।

একপে আউলিয়া চাঁদের প্রকৃত বিবরণ আপনারা পাঠ করিলেন। দেখিলেন যে কত্তাভজ্ঞা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মহাপ্রভু নহেন এবং তথা চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা নহে। নৌড়ায় যেমন মাত্রেরই কণ্ঠব্য যেন তাহাদের সম্প্রদায়ের কোন লোক কোন ক্রমে এ সকল দলে না মিশেন। বৈষ্ণবগণ মধ্যে এই অবৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে কোন কপে প্রশংসা না দেওয়া বৈষ্ণব মাত্রেরই কত্তব্য। আউলে চাঁদের ২০জন শিষ্য মধ্যে, অন্নন্দ লাল গোসাঁই নামে একজন শিষ্য ছিল, যদিও ইহাব সম্প্রদে কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না, তথাপি জানা গেছে ইনি একজন বঙ্গা বংশীর গোপালমী সন্তান। বলাপড় বানী গোপালমী প্রভুরা একজন আচার্য্য সন্তানকে এইরূপে অবৈষ্ণব মত গ্রহণ করিতে দেখিয়া এবং রামশরণ পালের সময় ষোষণাডায় প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিতে দেখিয়া বলাপড়ের ৮ জগদানন্দ গোপালমীর পিতামহ এই অবৈষ্ণব মত প্রচারে বাধা দিবার জন্য ষোষণাডায় সন্নিবর্তিত কোন বৈষ্ণব পঠ উদ্ধারের সঙ্কল্প করেন। পরে ৮ জগদানন্দ গোপালমীর পিতা দেবানন্দেরপাঠ উদ্ধার করেন। এই পাঠ অপরাধ ভক্তনের পাঠ নামে খ্যাত। ইহার বিবরণ আমাদিগের পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল একপে আপনাদের নিকট বিদায় লইলাম। ইতি।

তত্ত্ব কথাস্মৃত ।

(লেখক ।—ঐযুক্ত রসিক লাল দে, দাস ।)

—:—

প্রশ্ন । “শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা কোন শাস্ত্রে নাই”—এ কিরূপ কথা ?

উত্তর । সাধু সঙ্গ ব্যতীত ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা হইতে পারে না । মিডা দীলা অদ্যাপি বর্তমান । সাধু সঙ্গ করিলে, এ সেবার কথা বুঝিতে পারা যায় ; অন্যথায় লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার তাব আশিরা লুপ্ত অধিকার করে ।

প্রশ্ন । পাপ ও পুণ্য উভয়ই ত্যাগ না করিলে মহাপ্রভুর সেবার অধিকার হয় না ; আপনি কিন্তু বলিতেছেন—“পুণ্যবানের সেবাধিকার নাই ; তবে কি পাপীরই সেবাধিকার আছে ? পুণ্যবান হওয়া অপেক্ষা কি পাপী হওয়া ভাল ?

উত্তর । হাঁ, পাপীর—মহাপাপীরই সেবা করিবার অধিকার, যে সকল পাপীকে, ব্রাহ্মণগণ, কোন আয়শ্চিত্ত দ্বারা উদ্ধার করিতে পারেন নাই, মহাপ্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং করিতেছেন । কলিযুগের পুণ্যবাণ অপেক্ষা পাপী, কোটা গুণে ভাল ; কলিযুগে, পুণ্যবান হওয়া, মহাপ্রভুর আদেশ নহে । তা’ বলিয়া আমি পাপ কার্যের অমুমোদন করিতেছি না । তন্মধ্যে অম্মে পাপ করিচ্ছাছি, ইহা স্বীকার করিয়া অমৃতপ্ত জনয়ে প্রভুর শরণ গ্রহণ করিতে হইবে ; তাহা হইলেহ পতিত পাবন গৌর হবি কোল দিবেন ।

প্রশ্ন । হরিনাম যার মুখেই শুনি, তিনিই আমার পরম বন্ধু এ তাহা কি সর্বোত্তম মহে ? পাত্ত ভাল কি মন্দ, বিচার করিবার প্রয়োজন কি ?

উত্তর । সদসং বিচার অন্য ভগবান, জীবের প্রতি রূপা পূর্বক বেন-পুণ্যবাণি শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন । শাস্ত্রের বিচার দ্বারা জীবকে সম্পদ দেবাইয়া দেওয়া, বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য নতুবা মূর্খ ও পণ্ডিতে ভেদ থাকে না, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাসরিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া পূজা অপেক্ষা মহাপাপ আর কিছুই হইতে পারে না ।

প্রশ্ন। পুণ্যবান লোক কি ক্রমে প্রভু স্বেবার অধিকার পাইতে পারে না ?
সকাম উপাসনা কি শেষে নিকাম উপাসনায় পরিণত হয় না ?

উত্তর। পুণ্যবান সন্তান ; কাম কৈতব, প্রেম অকৈতব ; “কাম প্রেম দৌহার
বিত্ত্ব লক্ষণ ।” লৌহ আর হেম , প্রেমের গতি কুটীল ; সাধু সঙ্গ ব্যতীত
নিকাম উপাসনা হয় না ।

প্রশ্ন। বিধি হইতে অনুরাগের উদ্ভব ঘটে, তাহা না হইলে অনুরাগ জন্মে
না, এ বিষয়ে আপনার মত কি ।

উত্তর। সাধুসঙ্গ বিনা অনুরাগ জন্মে না , কেহ কেহ জন্ম দুরীত কর্তৃ
কলে জাত অনুরাগ হইতে পারেন , যথা - শ্রদ্ধাদ, মাতৃ গর্ভেই হইয়াছিলেন ।

প্রশ্ন। এ সংঘারে পাপ স্রষ্টার উদ্দেশ্য কি ? সংসার কি সুখের ধাম
নহে ? যদি না হয়, তাহা হইলে, মানুষ কিরূপে সুখের ধামে যাইতে পারে ?

উত্তর। পাপের দণ্ড দ্বারা জীবনের শিক্ষা হয় , এ সংসার, সুখের ধাম
নহে ; সত্তত ত্রিতাপ যাতনা নরক ভোগের ধাম , শূন্যের যেকণ বিষ্ঠা ভোগেই
পরিতৃপ্ত হয়, মানুষ যাদ সেইকণ জিহ্বা উপস্থ মুখেই পরিতৃপ্ত লাভ করে তাহা
হইলে সে আর কখন ত উদ্ধার ধাম বা সুখের ধামে যাইতে পারে না ,
ভগবানের প্রধান তিনটি শক্তি—“বিশ্ব শক্তি পরামোক্ষাক্রোডাজ্ঞা তথা পরাঃ ।
অবিদ্যা কাণ্ড সংজ্ঞা তৃতিয়া শক্তিরিষ্যতে, (সাধুসঙ্গ না হইলে অবিদ্যা শক্তি)
কোন কালে স্বরূপ জানিতে পারে না ।

প্রশ্ন। মহাপ্রভু নিত্য, নিগুণ পতিত পাবন , কিন্তু পরমেশ্বর বলিলে
ভুল হয় না কি ? ইহাতে ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইতেছে। পুঙ্ক কথার সহিত
মিল থাকিতেছে না । বুঝাইয়া দিবেন কি ?

উত্তর। উহা বাক্য মনের অগোচর, কেবল ভাবের গতি । যাগাতাত না
হইলে কেহ কোন রূপে বুঝিতে পারিবেন না । তিনিই অনাদি, আদি কারণ ।
তাহার অনন্ত গুণ অনন্ত ঐশ্বর্য । ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য একাধারে পূর্ণরূপে
তাহার ভিতরে বাহিরে । তাহাকে পরমেশ্বর না বলিলে যোর অপরাধ হয় ।

শ্রীল বজু সাধু ।

(লেখক ।—শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য ।)

—:—

বহুদিন পর 'ভক্তি'তে একটা 'হৃদয়ের সংকীর্ণ জীবন' চরিত্র নিধিতে বসিলাম, ভরসা করি "ভক্তি"র কৃপাময় পাঠক পাঠিকাগণ এই অকিঞ্চন জনের প্রতি ক্রিকিং কৃপাদৃষ্টি করিবেন ।

মানব রাজ্যে কোন ব্যক্তি যে কৃষ্ণ-কৃপা লাভের অধিকারী, আর কোন ব্যক্তি যে অনধিকারী, কার্য দ্বারা তাহা অনুমান করা হুঃসাধ্য । কারণ, চকল চিত্ত মানবের মতি গতি সর্বদা একরূপ থাকেনা । আরম্ভেই মানব চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষিত হইতে পারে । দেখা যায়, যে ব্যক্তি সারা জীবন ধর্ম কন্ঠের অনুষ্ঠান করিয়া,—সাধু সঙ্জ্ঞার মত বিখ্যাত নিয়মের বশবর্তী থাকিয়া, বাহ্য আচারচরণের দ্বারা মানব সমাজে নিষ্ঠাবান সাধু বলিয়া পরিচিত হইল, হঠাৎ তাহার মনের গতি পরিবর্তিত হইয়া সেই সাধুই এক মহা অপাধু হইয়া দাঁড়াইল । পুণ্যের প্রদীপ্ত পথ ছাড়িয়া, পাপ পঙ্কিল অন্ধকারময় নরকের পথে প্রধাবিত হইল ॥ পাপের প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পশুর ব্যবহার করিতে লাগিল ॥

আর যে ব্যক্তি ধর্ম বিগর্হিত কথ্য দ্বারা পাপানুষ্ঠান করিয়া নরকের পথে ছুটিয়াছিল, লোক সমাজে পল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, দৈবাত্ত তাহার জীবনের গতি বিপর্যয় ঘটিল, তিনি এক পরম সাধু বলিয়া বসিলেন । সাধক সম্প্রদায়ের সম্মুখে আদেশ মহাপুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন । দেখিতে দেখিতে মানুষ দেবতা হইয়া পড়িলেন । স্বর্গের সোপানে পদ-বিক্ষেপ পুরুষ কৃষ্ণ কৃপার বিজয় ভেরী বাজাইয়া সারাটা মানব রাজ্যকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ।

উপযুক্ত উক্ত ব্যক্তির পূর্ণানুষ্ঠিত কার্য দ্বারা, সাধু কি অপাধু বাহ্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা যে হুল, পশুদলুষ্ঠিত কার্যাবলী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিল । মানব রাজ্যে এই প্রকার বিবেচনার ভুল অনেক হলে ধরা পড়িয়াছে । জীব-জীবনের এই প্রকার গতি বিপর্যয় বৃন্তাত বা বৃষ্টাত আদ্যের

প্রাচীন ইতিহাসে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন্ সূত্রে কাহার প্রতি, কোন্ সময় কৃষ্ণ কৃপার অমৃত এবাহ ছুটিয়া আসিবে, তাহা কে জ্ঞানে? আমাদের আলোচ্য বজু সাধুর জীবন চরিত্র ঠিক বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকারের।

“বজু সাধু” ময়মনসিংহ জেলার সিংহের বাদ্রাণা গ্রামে, জগন্নাথ মাঝির গুরসে ৬ গোলাক মণী দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। বজু শিশুকাল হইতেই একটুকু চকল প্রকৃতির ছিলেন। লেখা পড়া ঘোটেই জানিতেন না। গীত বাণ্যে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। সারা দিন-রাত্তি কেবল গান গাইয়া বেড়াইতে ভাল বাসিতেন।

বাণ্য বৈশ্যের এইরূপে কাটিয়া গেলে, যৌবনে বজু তপ্তবস্ত্র চরিতার্থ সাধনে প্ররুত হইলেন। পর গীড়ন, মন্য পান তাঁহার নিত্য কর্মে পরিগণিত হইয়া দাঁড়াইল। বজু বলিষ্ঠ বলিরা, তাঁহার স শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাকে একজন মঙ্গ বলিকর * ঠাণ্ডরাইয়া লইল বজু অতি তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট খজা কাখে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে মন্দির পাঠা কাটিয়া লোকের নিকট হইতে বাহবা, ও ধন্যবাদ আদায় করিতে লাগিলেন। গুপ্তর প্রাণ নাশে তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। আসন্ন মৃত্যুর কবলে পতিত দুর্বল জীবের কাতর ক্রন্দনে বজুর কিছু মাত্রও ক্রেশ জন্মিত না। বরং রক্ত দর্শনে তাঁহার প্রাণে অত্যধিক প্রফুল্লতা আসিত।

এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, চঠাং একদিন বজুর হৃদয় আসিখা উপস্থিত। একজন সংসার বিরক্ত সাধুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বজু সাধুকে প্রণাম করিলেন, সাধু “দুঃখগলে ভক্তি হউক” বলিয়া বজু মাঝির মাঝায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

ক্রোধ, বজুকে লইয়া এক নির্জন প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া জীবের মৃত্যু সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। আর যতদূর পারেন, বজুকে সংসারের অনিত্যতা বুকাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে বজুর সঙ্গে সাধুর বিবেকোদীপক অনেক কথার প্রসিদ্ধ হইল। প্রসঙ্গাধীন কৃষ্ণ ভজনই যে জীব জীবনের একমাত্র কণ্ডব্য, লম্বাই যে পরম ধর্ম, আর নির্দ্বন্দ্ব লোক যে শতর সমান,

* বাহারা পাঠা ও মন্দির বলিদান করে, (লেখক)।

তাহাও সবিশেষ আলোচিত হইল। অহিংসা, পরোপকার যে মানব জাতির শতম ধর্ম, সাধু, বজুকে তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

সংসারের রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মুর্থ সকলকেই যে একদিন মরিতে হইবে, সংসারের ধন জন ফেলিয়া নিশ্চয়ই চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে,—এই আধি ব্যাধি পূর্ণ জড় জগত কেবল চুঃখেরই লীলাস্থলী, বজু, সঙ্গে সাধুর এই সকল পরমার্থ তত্ত্ব কথা অনেককণ পর্য্যন্ত হইতে লাগিল।

বজুর দিন ফিরিয়াছে। সাধু-সঙ্গের প্রভাবে বজু আর সে বজু নাই। তিনি আর একজন হইয়া বাসিয়াছেন, তাঁহার আত্মার দেব ভাষণে সজ্ঞার হইয়াছে। জানিনা কোন জন্মের কোন স্মৃতির ফলে আজ বজু বিবেক তত্ত্বের পূর্ণ মুক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পাপাসক্ত অন্ধতামির জগতের পরতে পরতে কে যেন দিব্য বৈরাগ্যের উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিয়া দিল। জটিল মধ্যাকিনীর পবিত্র ধারায় পাপ পবিল জন্মর খানা খুটয়া লইল। পরিতাপের ভাঙনায় অনেক দিনের সঞ্চিত পাপ রাশি আজ বজুর নয়ন পথে দ্রব হইয়া নয়ন দর দারে বরিয়া পড়িতে লাগিল।

বজু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মূল্য পরিত্যাগ করিয়া বালকের বড় কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সাধুর চরণ ধরিতা বলিতে লাগিলেন,—‘বাবা। আমাকে উদ্ধার কর,—আমি মহা পাতকী আমার পারের উপার করিয়া দাও। তুমি আমাকে উদ্ধার না করিলে, আমি আর তোমার চরণ ছাড়িব না, এই তোমার চরণ তলে পড়িয়া বস হউন।’

এইকণ আত্মনাশ করিতে—করিতে বজু সাধু, সাধুর চরণ যুগল জড়াইয়া ধরিলেন। সাধু কহিলেন,—‘বাবা স্থির হও,—কোন চিন্তা নাট ঠাট্ট তোমার প্রতি প্রসঙ্গ হইয়াছেন। অহতাপানশে তোমার সকল পাপ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যাও, এখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া অচিরে চক্ষু মল্ল গ্রহণ করগে।’

সাধুর বাক্য শ্রবণে বজুর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সাধু বজুকে ছাড়িয়া স্থানে চলিয়া গেলেন। বজু অশ্রু নিধোত বদনে গৃহান্তিমুখে দৌড়াইয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন বাড়ীতে তাঁহার গুরু-পত্নী আসিয়া তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। আজ বজুর বড় সুদিন উপস্থিত। বজু দেবীকৃপিনী মা ঠাহরাণীকে দর্শন মাত্র পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। আর

নয়ন জলে চরণ দু'খানি দুটরা দিয়া বলিলেন,—“মা। আমাকে মন্ত্র দিয়া উদ্ধার কর। আমি মহাপাতকী আমার প্রতি তোমার অসীম করুণা। নতুবা আজ তুমি এ পাণ্ডুর পর্ণ কুটীরে আগিবে কেন মা। মা। আমাকে শীঘ্র শীঘ্র মহামন্ত্র হরিনাম দানে নিষ্কার কর।

অরুণতী বিধবা। বাধিকাদির জন্ত তিনি আরো অনেকবার বজু বাড়ীতে পদার্থপণ করিয়াছেন। কিন্তু বজুর এমন তাব আর কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই। অত্র দ্রষ্ট্য প্রতি বজুর দেব দুর্জয় তরু তাব অবলোকনে তিনি বিন্মিতা হইলেন। এবং নয়ন জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন। “বাবা বজু। তুমি উঠ, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। তোমার মত শিষ্যলাভে আমি ধন্য হলাম। বাবা আর বিলম্ব করিও না। সবার স্নান করিয়া আইস, এখন আমি তোমার ভব পাণ্ডুর সেতু বাধিয়া দিতেছি।”

বজু তড়াগাড়ি স্নান করিয়া দুগ চন্দন-হুলসী সহ ঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কৃপাময়ী দেবী কৃপা করিয়া বজুকে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। গ্রাম শুক, লাড়া শুদ্ধ এক বিষয় হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে,—“বজুমন্ত্র লইয়া আজ হইতে এক সাধু বনিয়াছে।” তৎপরে হইতে বজু সাধু কেবল সাধু সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্তন করিয়া বেড়াইতেন। যার সংসার জাউয়া আর এক অভিনব আনন্দ ধমে বসতি করিতে লাগিলেন। সংসারের কাজ কন্ড কিছুই করিতেন না।

অগ্র, কশা, পুলকাদি তাহার অসাত্তরণ ছিল। গৌর লীলা,—কৃষ্ণ লীলার প্রত্যাশি দেখানে পাঠ হইত বজু দেখানে নৈশুম ভাবে বসিয়া থাকিতেন। পরমার্থ কথা ব্যতীত গ্রাম্য বৈষয়িক কথা মাত্রই কহিতেন না। অতি নীন বেলে দিবা-যামিনী রি নামামৃত পানে বিস্তার থাকিতেন। আহাৰ মিয়ার চিন্তা মাত্রও ছিল না। সর্বাস্ত ভরিয়া হরি নামের তেলক ছাপা পড়িতেন। কাসালের মত পথে যাটে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

বজু সাধু প্রতিদিন এক লক্ষ হরি নাম করিতেন। নামের মালা সর্ব্বনাই তাঁহার হাতে ও কণ্ঠে—বিলম্বিত থাকিত। তিনি সংকীর্তনে এমন আত্মহারা হইয়া নাচিতেন যে তদর্শনে ভেমন পাবণের চিত্তও গলিয়া বাইত। বজু সর্ব্বদাই সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল থাকিতেন। সাধুর কৃপা

এভাবে তাঁহার হৃদয়ের মোহ মেঘ কোথায় যে উড়িয়া গেল কে জানে ?
বজ্র সাধু বলিতেন,—“যদি একদিন না একজন সকলকেই মরিতে হইবে,
তবে কেন যে মানুষ পরস্পর কটাকাটি মারামারি করিতেছে—বার
ভজন না করিয়া অহঙ্কারভিমানের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে,—পগোণাকার
না করিয়া পর পীড়নে ব্রতী হইতেছে, আমি হুঁহাই ভাবিয়া স্থির করিতে
পারিতেছি না।”

বজ্র সাধু পরলোক প্রাপ্তির—অমকাল পূর্বে নিজ বাটিতে একখান
সাধারণ কুড়ে বসি নিশ্চাপ করিয়া তাহাতে মুগ্ধ আবিগ্রহ (গৌর নিত্যানন্দ)
ছাপন পূর্বক রীতিমত সেবা পূজা করিতে ছিলেন। সারাদিন ঠাকুর বরের
দরজার বসিয়া দৈনিক একলক্ষ বরিনাম জপ সমাধা করিতেন।

বজ্র সাধুর স্থাপিত আবিগ্রহ (গৌর নিত্যানন্দ) এখনও বর্তমান আছেন।
বজ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গারাম মাঝি ও তৎপত্নী অশিষ্ট ভক্তি সহকারে বজ্র
প্রাণ গৌর-নিত্যানন্দের সেবা করিতেছেন। তাঁহারাও খামো র্ত্রী হুহজন
পরম সাধু ও সাধনী। বজ্র সাধুর ঠাকুর বাড়ীতে গেলে বোধ হয় যেন,—বজ্র
এখানেই কোথায় প্রচ্ছন্ন ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি যেমন গৌর নিত্যানন্দ
ঠাকুরবরের পার্শ্বেই উপবিষ্ট। জগৎভক্ত, জগৎভক্ত বংশল ভগবান।

পতিতের প্রাণোচ্ছ্বাস।

(লেখক—শ্রীযুক্ত রাসিক লাল দে, দাস।)

(গীতিকা)

—:~:—

আমার সাধন ভজন, হ'ল না জীবনে,—

হুযোগ, সময় হ'ল না হরি।

তুমি, নিজ গুণে, দয়া করি' মোরে,—

চরণ তরী দিলে, তরি ॥

তুমি নাথ ওহে পতিত পাবন,

তুমি ওহে নাথ, অধম ভাবন,

পতিত অধমে দাও হে শরণ,

আমি, তোমারি তরঙ্গাধরি ॥

সত্য বটে ঘের পাপের আধার,

ছাইয়া ফেলেছে হৃদয় আমার,

করুণার পূর্ণ আলোক আধার—

(তুমি) লাও পাপ ভয় নাশ করি' ॥

কার্য্য-চক্রে মোর বড়ই অংশ,

শিষ্ট হ'রে লেহ হইল চুর্কল,

চিত্তব্যথাধি হরে, মানসের বল,

ত্রিভূপে জ্বলিয়া মরি ॥

বিষয় সেবার হ'য়েছি হৃৎপ্রতি,

কেবল চিনেছি সংসারের নীতি,

বিষয়ের প্রতি বাড়ে শুধু রতি

শেষের সে দিন না মরি ॥

নিজ জুমে মোর ঘোহের বিকার,

কাটাইয়া দাও, ওহে শুশাধার,—

অগুণে, এ দীনে বর হে উদ্ধার,—

নহিলে, উপায় না হেয়ি ॥

(ভক্তি পঞ্চদশবর্ষ ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩২৪।)

শ্রীগৌরাক্ষের নিকট প্রার্থনা ।

প্রাণের দেবতা হে গৌরহৃদয় ।

পরানের মাঝে এস ।

(আমার) আঁধার হৃদয় ক'রে আলোকিত

দীপ্ত আকাশে ব'স ॥

(ওগো দীপ্ত আকাশে ব'স ।)

বড় আশা ক'রে বহুদিন হ'তে

আছি ত্রিভুত, শুধু তোমারি তরে ।

লশী-সুখা লাগি চকোর যেমতি

অথবা চাতক মেঘ-বারি তরে ॥

পাণিতাপি জন ব্যথিত হৃদয়ে

ডাকিয়া ও যদি তোমায়ে না পায় ।

পতিত পাবন, হে দীনতারণ ।

বলনা কি হ'বে তাদের উপায় ॥

(যদি) শুদ্ধ চিতে শুধু (হয়) তব আবির্ভাব

অশুদ্ধ কি তবে পাবে না ।

(তবে) অবশ্য তারণ নামটী তোমার

কেনগো হ'য়েছে বলনা ।

ডাকিলে তোমায়ে ব্যাকুল পরানে

তুমি ও থাকিতে পারনা ।

তাই নিবেদন হে প্রাণরমণ ।

ব্যাকুলতা প্রাণে দাওনা ।

আগিলে পরানে তোমার ভাবনা

বাহিরেও তুমি জানিবে ।

অন্তরে বাহিরে শুধু গৌরব

তখন এ দীন চোরবে ॥

প্রাণে আশা দিয়ে প্রাণের দেবতা

(আর) বেঁধে না নিরাশ ক'রে ।

প্রকাশি করুণা এ অদম জনে

লও হে আগুন ক'রে ॥

ভক্ত ও ভগবান ।

(লেখক ।—শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ডাবসাগর ।)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তুং করুণাবৎ ।

কলাবপাতি গুণেরঃ ভক্তিধেন প্রকাশিতা ॥

যিনি এই ঘোর কলিযুগে অতি নিগূঢ় প্রেম ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন সেই অপর কারুণ্য-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ।

নবদ্বীপ লীলার কিকণ নিগূঢ় ভাবে প্রহর-ভগবান প্রেম ভক্তি আশ্বাদন করিয়াছেন শ্রীচৈতন্য লীলার বেনব্যাগ শ্রীলবন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁহার নমুনা দেখাইতেছেন ।

শতগ্রন্থি, ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত শ্রৌত বনস্ত্র একটা অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত কণককান্তি পরম হৃদয়ের একটা ব্রাহ্মণ বালকের বিষম কলহ দেখা গেল। চপল বালক, কখন বেচারির ছেঁড়া কাপড় খানি আরো ছিড়িয়া দিতেছেন, কখনও তাঁহার ঘোড়, কলা, মূলা ছড়াইয়া ফেলিতেছেন, কখনও বা তাঁহার সুদীর্ঘ শিখা গুলি ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন,—নদীয়ায় বাজার শুদ্ধ লোক দূরে থাকিয়া ভক্ত ভগবানের এই অদ্ভুত রঙ্গ দেখিতেছে। বেচারি ব্রাহ্মণও একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, ব্যতিব্যস্ত হইয়া যত দূর পারিতেছেন সাহায্যহেতেছেন, আর হৃদয় আক্রমণকারীর সহিত একটা আগোষ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ছিন্ন চাদর খানি পাতিয়া দিয়া দিষ্ট

কথার বলিতেছেন, "ঠাকুর বৈদ্য, ঐরূপ হরতপসা করিওনা," কিন্তু "চোরাকি শুনে ধর্মের কাহিনী" মিষ্ট কথার উক্ত বালকের গানগামি বরণ বাড়িয়া যাইতেছে, তিনি সেই ছেঁড়া চাদর খানি জুলিয়া বলিতেছেন, "বলি শ্রীধর। তোমার এদুঃখিত হইল কেন? বিবহরি না তজিখা লক্ষ্মী নারায়ণ সেবা কর্তে তোমার কে লিখাইয়াছে? আই দেখ যারা বিবহরি পূজা করে তারা কেমন রূপে সচ্ছন্দে আছে, আর লক্ষ্মীকান্তের সেবক হইয়া তোমার এই লক্ষ্মীচাড়া দশা। তোমার ঘরের চালে খড় নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, পেটেও অন্ন নাই। হি অমন ঠাকুরকে কি তজিতে হয়।" শ্রীধর নিজকণ নৈষ্টিক ভক্ত, লজ্জা টলিবার পাত্র নহেন, "বিষ্ণুমাধা তাঁর মন নাগে আচ্ছাদিত" ভোগ রূপে শ্রীধরের আদৌ মন নাই, তিনি হাসিয়া বলিলেন, "রাজা রাজ ভোগ ধার আর প্রাসাদে থাকে, কিন্তু পক্ষী খান চাল কুড়াইয়া ধার আর থাকে বৃক্ষ শাখায়, কিন্তু দিন উল্লেরই সমান যাইতেছে বরণ ভোগৈশ্বর্যে বাহারা থাকে তাহারা চর্যাসনার তাড়ণায় সঙ্কটাই অশান্ত, আর বাহারা প্রভুকে জুলিয়া বিবহ রসে মজিয়া থাকে, দুঃখী বলিতে হইলে তাদেরই বলিতে হয়, তাদের মতন অত্যাগিয়া আর কে আছে।" ভক্তের মুখে এই নির্ভব ধানী শুনিয়া ভগবানব আসন্দ আর ধরিতেছে না চোকে মুখে প্রজুলতার ঝলক দিতেছে, চপলতার আচরণে তাহা চাপিবা প্রচ্ছন্ন প্রভু বলিতেছেন "বুঝেছি তুমি খুব চকুর তুমি খুব বড় ধনী * নিশ্চয় তোমার বিস্তর ধন লুকান আছে, তুমি কেবল চং ধ'রে লোকের চোখে ধুলা দিয়া কাঙ্গাল সেজে বেড়াও, আমার কাছে চালাকী চলবেনা আচ্ছা থাক কিছুকাল, আনি যেদিন তোমার আসন বস্ত ধরিয়া দিব সেই দিন তোমার সব চুবুতা মিটিয়া যাইবে,—

প্রভু বলে তোমার বিস্তর আছে ধন।

তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন।

তাহা মুদ্রি বিনতি করিও কত দিনে।

তবে তুমি লোক ভাঙিব কেমনে। চৈঃ কঃ

সহস্র শাস্ত্র শিষ্ট শ্রীধর অত দূর পৌন্ড্র বুঝিলেন না, চপল ব্রাহ্মণ কুমারের হাত থেকে অব্যাহতি পাইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কি

* ঐশ্বর্যের যার আছে সেই বড় ধনী।

জানি যে রূপ পাগ্লা ঠাকুর তাহাতে বেশী বাড়াবাড়িও বিচিত্র নহে, হয়ত শেষে বা কিল চড় আরম্ভ হইবে,—

মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্র বড় ।

শেষে জানি আমারে কিলার পাছে লড় ।

কিন্তু তিনি ছাড়িলে কি হইবে, কন্বলী যে ছাড়িতে চায় না। প্রভুর কৃপা যে আসিতেছেন। ভক্তি প্রিয় মাদব নিমাই পণ্ডিত সাক্ষিয়া থাকিলে কি হইবে, পুরাণ খেঁড়কে পাইখা তাঁহার পূর্ণ সত্যের যে আগিয়া উঠিতেছে। ভক্তের ভক্তি ধর্ম লুণ্ঠন করা ভগবানের সত্যের। 'এমন ভক্তের কাছে কিছু আদায় না হইলে শুধু মুখেই বা বয়ে বাইবেম কিরূপে ? তাই শ্রীধর বত বলিতেছেন "লক্ষী ঠাকুর বাড়ী যাও, আমার মত লোকের সঙ্গে কলহ করা তোমার সাজে না," প্রভু ততই আঁখুটি ধরিয়া বলিতেছেন," "আমি কিছুতেই শুধু মুখে ফিরিব না, আমার কি দিবে তা বল",—

প্রভু বলে তোমায় না ছাড়ি এমন ।

কি আমারে দিবা তাগা বল এইরূপে ॥ চৈঃ ভাঃ ।

শ্রীধর মহাবিপদেই ঠেকিলেন, হাসিয়া বলিলেন ঠাকুর। আমি খাই এই খোলা বেচিয়া, আমার নাম ত খোলা বেচা শ্রীধর। আমি আবার তোমায় কি দিব ? বাস্তবিক কাদাল শ্রীধর মনে মনেও ভাবিতেছেন প্রত্যেক দিন বিনামূল্যেই বা কেমন ক'রে দিতে পারি, বামুণকে যে কলা মূল্যও কিছু হাতে ক'রে দিব এমন সাধ্যও ত আমার নেই। আবার ভাবিতেছেন তদুণ্ড বলেছিলে যাহা কিছু ব্রাহ্মণ সেবার লাগে সেও আমার তাগ্য। আর যে রূপ চরম ঠাকুর দেখছি জোর ক'রে নিলেই বা আমি কি করছি। তাই বলেন "ঠাকুর সম্পত্তি ত আমার এই কলা মূল্য খোড়।

"ইহাতে কি দিব তাহা বলহ গোসাঞি"

নাছাড় প্রভু তখন রফার প্রস্তাবে কতক রাজি হইলেন। "আমি তোমার নিজ শুশ্রূষা এখন থাকুক তাহা পরে বুঝিয়া লইব এখন ভাল চাও যদি তবে ঐ কলা মূল্যই দেও আমি কিন্তু নাম দিতে পারিব না।

প্রভু বলে যে তোমার পোতা ধন আছে।

সে থাকুক এখন পাইব তাহা পাছে ॥

এবে কলা মূল্য খোড় দেহ কড়ি বিনে ।

দিলে আমি কন্দল না করি তোমাসনে ॥ চৈঃ তাঃ ।

ঐধর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন "আচ্ছা গোঁসাই তোমার কড়ি পাতিব
দার সাই, আমি প্রত্যহ তোমাকে এক টুকরা খোড় ও কিছু কলা মূল্য দিব
কিন্তু কথাটা যেন ঠিক থাকে, আর কিন্ত কলহ করিতে পারিবে না। প্রভুও
তখন পুরা সন্ততি দিলেন ;—

প্রভু বলে ভাল ভাল আর বন্দ নাঞি ।

ওবে খোড় কলা মূল্য যেন ভাল পাই ॥ চৈঃ তাঃ ।

একঅধ্যায় হইয়া গেল তবুও কুপা যে আসিতেছেন, তাই আজ আর এক-
অধ্যায় আরম্ভ হইল। অনন্ত লীলাময়ের অনন্ত লীলা ।

পরিহাস রসিক প্রভু পুরাতন ভৃত্যকে পাইয়াছেন সহজে ছাড়িবেন কেন ?
তাই রসাস্বাদন চলিতেই লাগিল, পাগলের হাত থেকে রেহাই পাইবার জন্ত
শ্রী-ব্রাহ্মণ দেবী ঐধর কিছু কলা মূল্য প্রভুর ঐকরে দিয়া বিদায় করিতেছেন
প্রভুর ভগবান ভক্তের দান সাগ্রহে ছুই হাত পাতিয়া লইতেছেন, আর নিজা-
মন্দে অধীর হইতেছেন, বহিহারি রসাস্বাদন। শুণ্ডভাবে নিজ জনের চোখে
ধুলি দিয়া প্রেমবস আস্বাদনে বুকি আরো বেশী আনন্দ তাই একাশ্যে
এঁটোফল খাইয়াও তৃপ্তি হয় নাই আত্মগোপন করিয়া কলা মূল্য কাড়িয়া
খাইতেছেন। প্রানবল্লভ হৃদয়-সর্বস্বদনকে চিনিতে না পারিয়া ভক্ত বিদায়
দিতে চাহিতেছেন কিন্তু রসিক শেখর প্রেমভিখারী প্রভু কিছুতেই বাইতেছেন
না, রস রস আরো বাড়িয়া চলিয়াছে। অন্তর্ধানী প্রভু বুকিয়াছেন সখা আমার
চিনিতে পারে নাই। সেই কোতুকী প্রভু সখার সঙ্গে আরো রঙ্গ করিতে
লাগিলেন "ঐধর, আচ্ছা তুমি বল দেখি আমি কে ? তাই বলিলে ওবে আমি
যরে বাইব। বিষ্ণুমায়-মোহিত ঐধর বাহা মূল চক্ষে দেখিতেছেন তাহাই
বলিলেন "ঐধর বলেন তুমি বিশ্র বিষ্ণু অংশ।" হাসিয়া প্রভু অধীর,
"অইত তুমি আমারে চিন্তে পার নাই ; তোমার চোখে ধূলা দিয়ে দেখো
দেখি আমি কেমন খোড় মূল্য নিয়েছি। চিন্তে না আমি যে মোহালার ছেলে।"

"প্রভুবলে না জানিলা আমি গোপবংশ।" সানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনী
ভাবিয়া থাকিলেও প্রতিবাসী জগদ্বাণ মিশ্রের এই দ্রুত ছেলেটাকে একেবারে

“গোপেন্দ্রনন্দন” বলিয়া স্বীকার করিতে শ্রীধর প্রস্তুত নহেন, ব্রাহ্মণ কুমারের পাগলামি দেখিয়া শ্রীধর হানি সামলাইতে পারিলেন না। কোতুকী প্রভৃ তাহা দেখিয়া আরো মাত্রা চড়াইলেন। “শ্রীধর আমার কথায় বৃকি তোমার বিশ্বাস হইলনা। বলি তুমি যে গঙ্গাদেবীকে ভক্তি কর, কলামুলা বেচিয়া দৈনিক বাছা কিছু রোজগার কর তাহার অঙ্কেক দিয়া প্রত্যহ যে গঙ্গা দেবীর পূজা কর তোমায় সেই গঙ্গা দেবী যে আমরা এই শ্রীচরণ থেকে উদ্ধত হয়েছি।” এই বলিয়া শ্রীচরণ বাড়াইয়া দিলেন। শ্রীধর আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চক্ষু কর্ণে অঙ্গুলি দিলেন সঙ্গিনাশ এই পাগলা ঠাকুর কহে কি? চাপল্যের চূড়ান্ত আরম্ভ হ'লো দেখিয়া বলিলেন “বলি ও নিমাই পণ্ডিত লোকে যত বড় হয় তওই শিষ্টশাস্ত্রের আর তুমি যত বড় হচ্ছে ততই তোমার পাগলামি বাড়ছে দেখছি ঠাকুর দেবতা বলিয়াও কি তোমার ভয় নেই।” আর বেশী বাড়াবাড়ী ভাল নহে বৃকিধা চপলনেত্র গুপ্তচাসি হাসিয়া বিদ্রুপামের মত প্রচ্ছন্ন প্রভু সরিয়া পড়িলেন। সে চপল নয়ন ভঙ্গী দেখিয়া শ্রীধরের মাথা ঘুরিয়া ফেন্দা, সে দিন তাঁর আর বেচা কেনা হইল না বিহ্বল হইয়া রহিলেন, তিনি না চিনাইলে তাঁহাতে কে চিনিবে?

হেন সে উদ্ধত প্রভু করেন বোতুকে।

শেষত উদ্ধত আর নাই নবদীপে ॥

যদ্যপি এতক প্রভু আপনা প্রকাশে।

তথাপিও চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥

এই অপূর্ণ রসাস্বাদনের মাধুর্য্য আমরা ভক্তিবিশীন জীব কি বুঝিব। বৃকিধাছিলেন সেই ধোলা বেচা শ্রীধর। তাই যখন কৃপা করিয়া ভগবান ভক্তের নিকট আত্মকণ প্রকাশ করিলেন, বর দিবার জন্য স্বপ্ন পাড়ী পাড়ি আরম্ভ করিলেন তখনই শ্রীধর এই লীলা মাধুর্য্য বুঝিয়াছিলেন, প্রেম গঙ্গ গঙ্গ কণ্ঠে তাই প্রার্থনা করিলেন—

“যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর ধোলা পাড়।

সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্মে জন্মে নাথি ॥”

দরিদ্র ব্রাহ্মণের এই মহা সোভাগ্যের প্রশংসা করিয়া শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিবেছেন—

খোলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল বাহা।

কোচীলয়ে কোচীলয়ে না পাইবে তাহা ॥ চৈ: ভা:।

গৌরলীলাভিনয়ের গট পরিবর্তিত হইল; শুদ্ধা প্রেম-ভক্তির লোভে প্রচ্ছন্ন প্রভু নদিয়া বাসির দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন আবার কিলোভে আজ অন্য ভক্তের দিকট চলিয়াছেন। আজ কিছু ভাল অন্য রকম। ভক্তের বাসনা-রূপ প্রভুর ভদ্রীও ক্রমে ক্রমে নূতন হয়। কি ভাব হইয়াছে জানি না অই লেখ উদ্ধৃত নিম্নাই পণ্ডিত কৃষ্ণ সাজিয়া রাজ পথ দিয়া চলিয়াছেন।

ব্যবহারে রাজ যোগ্য বস্ত্র পরিধান।

অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান ॥

অধরে তাম্বুল কোচীলয়ে শ্রীবদন।

লোকে বলে মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন?

ললাটে ভিলক উদ্ধ, পুস্তক শ্রীকবে।

দৃষ্টি মাত্রে পদ্ম নেত্রে সৰ্ব্ব পাণ হবে ॥

ভূবন সুন্দর শ্রীগোবিন্দ সুন্দর আজ মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চপল পড়ুয়ার লগ্নে পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথি বগলে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিয়াছেন। সম্মুখেই দেখেন ভক্তাশ্রিত রুদ্ধ শ্রীবাস পণ্ডিত আসিতেছেন। সেই চিরবাহিত ভূবনমোহন রূপ দর্শনে শ্রীবাস মোহিত হইলেন। বিদ্যারসে ভোলা নিম্নাই পণ্ডিতকে কৃষ্ণ সাজিতে দেখিয়া শ্রীবাসের প্রাণ আনন্দে আটখানা হইয়াছে বাস্তবিক ভিতর বাহিরের রূপ যেন মিলিত, নিরীহ নারদ স্বভাব সরলতার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবাস পণ্ডিত এই অপূর্ণ দৃশ্য দেখিয়া হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উদ্ধৃত নিম্নাই পণ্ডিত কিছু কোন দৃষ্টতা করিলেন না বরং সুশীল সুবোধ বালকের ন্যায় ভক্তিতরে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। অত্যাচার শ্রীবাস প্রাণ খুলিয়া বাহু তুলিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন প্রভু অখিল-ভূবন-পটিকে আশীর্বাদ করিলেন “চিরায়ুর্ভব”; বৃষ্টি মনে মনে বলিলেন “কৃষ্ণে মতিবন্ত।” পুনরপি হাসিয়া বলিলেন ওই বেশে কোথায় চলিয়াছ—

“কতি চলিয়াছ উদ্ধতের শিরোমণি।”

প্রভুর কথা নাই কেবল দ্বিটি দ্বিটি হাসিতেছেন আজ সুযোগ পাইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত প্রচ্ছন্ন প্রভুর হাত ধানি ধরিয়া দ্বিষ্ট উপদেশ দিতে লাগিলেন, “দেবে

নিমাই পণ্ডিত আর কতকাল রুখা। বিন্যাসে মজিয়া থাকিবে, পড়া শুনাতোকৃষ্ণ
ভক্তির জন্য, তাহাই যদি না হইলে তবে সে বিন্যাসজ্ঞানে কল কি ? ভীষের
জীবন পদ্যপত্রের জল এই আছে এই নাই, অতএব—

এতেকে সর্পিণা ব্যর্থ না গোড়াও কাল।

পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল ॥

সরল হৃদয়ের কামনা ও আশু দৈখিয়া প্রচ্ছন্ন প্রভুর আনন্দ আর ধরিতেছে
না, হাসিয়া বলিলেন আপনার ন্যায় পরম কৃষ্ণভক্তের আশীর্বাদ হইলে নিশ্চয়ই
আমার কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। কৃষ্ণভক্তের আশীর্বাদ কখনও ব্যর্থ হইবার
নহে। আপনি আশীর্বাদ করুন।

হাপি বলে মহাপ্রভু লনহ পণ্ডিত।

তোমার রূপায় সেই হইব নিশ্চিত ॥ চৈঃ ভাঃ।

আজ শুণ্ড-লীলার শুণ্ড প্রেমাস্বাদনের চূড়ান্ত অভিনয় হইল। নিমাই
পণ্ডিত আর সে উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত নাই শিষ্ট বিনীত সেবক হইসেন।
ভক্তভূপ ভীষাস পণ্ডিতের করঙ্গ ও কাপড় বহিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে
চলিলেন। ভীষাস ভক্তী দৈখিয়া হাসিলেন কিন্তু বেশী আপত্তি করিলেন না
ভাবিলেন “উহার ক্রমে হুমতি হউক, কৃষ্ণ করুন নিমাই পণ্ডিত যেন কৃষ্ণভক্ত
হয়।” এদিকে ভগবানের যুগযুগান্তরের অপূর্ণ মনোসাধ আজ পূর্ণ হইতেছে।
ভক্ত পদধূলি অঙ্গে মাখিয়া ভক্তের হীন সেবা করিতে যে তাঁহার শ্রবণ লোভ,
তাহাতেই যে তাহার অপার আনন্দ। চতুর শেখর ছদ্মবেশে আজ সেই
সাধ মিটাইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। এই সাধ পুরাইতেই বুঝি গোকুলচন্দ্র
ঐনবদীপ চন্দ্র হইয়াছেন। ইহাই ভীষোরাঙ্গ লীলার মাধুর্য।

হেনমতে ভীষোরাঙ্গ হৃন্দর বনমাণী।

আছে গুঢ়কপে নিজানন্দে কুতুহলী ॥ চৈঃ ভাঃ।

সহজ ধর্ম ।

(লেখক ।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী ।)

—:—

আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতি প্রসঙ্গ, যাঁহা লইয়া আমরা সর্বদা ব্যতিব্যস্ত আছি, পক্ষ জীবনেরও উঠাই তাৎপর্য, উঠাই সর্বস্ব । যদি উক্ত পক্ষ-সাধারণ-বিষয়-চতুষ্টয়েই এ জীবন পদ্যাবসিত হইল, তবে মানবে আর পক্ষতে পার্থক্য থাকিল কি ? কিন্তু স্বর্গে নরকে যে পার্থক্য, যে ব্যবধান, মানবের সহিত পক্ষর তুল্যপেক্ষাও অধিক দূর ব্যবধান, পার্থক্য চিরবিদ্যমান, “তুল্যভং মানুষ্য জন্ম” মানব জন্ম লগ্ন হইতেও অতি দূরত । পক্ষ জন্ম হইতে আর স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য আছে । তাহা কি ? উহা আর কিছু নহে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় উহা ধর্ম, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ ।

একমাত্র উক্ত ধর্মই পক্ষ হইতে মানবকে পৃথক করিয়া দিয়াছে, উক্ত ধর্ম না থাকিলে মানুষে আর পক্ষতে পার্থক্য বিরোধিত হইয়া যায় ।

এই ধর্ম শব্দটির তাৎপর্য কি ? পক্ষর মধ্যে যেমন পশুত্ব ধর্ম আছে, মানবের মধ্যেও মনুষ্যত্ব ধর্ম আছে তবে এখানে বিশেষ এক কথার তাৎপর্য কি ?

তগবান্ কবচদেব তাঁহার ভরত নি পুত্রগণকে তাহ উপদেশ করিতেছেন :—

নাথং দেহোদেহভাঙ্গং নৃলোকে

কষ্টান্ কামানহঁতে বিড়্ভুজ্যং যে ।

তপো দিব্যং পুরকা যেন সর্বং

সুক্লোদ্বস্মাৎ ব্রহ্ম দৌধ্যদ্ভনতুম্ । (শ্রীমদ্ভাগবত ৫:৫:১।)

হে আমার পরম হেতুস্পদ পুত্রগণ । যে পরিণাম ভয়াবহ কামাদি বিষয় উপভোগের জন্য বিষ্ঠা ভোজী ভবনা প্রাণীর দেহ ধারণ, মানব দেহ ধারণের সেই উদ্দেশ্য নহে, সেই প্রয়োজন নহে । সুহৃৎ এই মানবদেহ পক্ষ-তুল্যত কেবল আহার নিদ্রা ভয় মেনুনাঁদি জবন্য সুখ-সাধনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই । এ

মানব জন্ম, দ্বিত্য তপস্যার জন্য, যাচা দ্বারা সত্ত্ব বিজুক্ত ও অনন্ত ব্রহ্মানন্দ স্থখ অর্জিত হইয়া থাকে, তাহারই উপলক্ষ্য অন্য ।

ধর্ম্মচীন জীবনের অব্যবহ পরিণাম, দ্বন্দ্বের পরিত্যাগেও অত্যন্ত উপস্থিত হয় । এই যে রোগ শোক পরিভাষা বধ বন্ধনাদি দাক্ষিণ্য দুঃখ, মূলে ধর্ম্মচীনতাই একমাত্র কারণ । ধর্ম্মচীন নরপুত্র, কণিক চৈত্রিয়ের তুচ্ছ সুখাশায় মুগ্ধ চইয়া মানব জীবনের সারসংক্ষেপ, কামনামলে আচ্ছাদিত প্রদান করিয়া 'হলোক হইতে চির অপস্থত হয় ; পরলোকেও তার অনন্ত ঘোনি জন্ম পথে যোব তামসী গতি লাভ হইয়া থাকে । ধর্ম্মপথের সম্মল না করিলে ভবমাগর উত্তীর্ণ চইবার কিছুমাত্র আশা নাই ।

একদিন ভক্তিনার পবিত্র ধর্ম্ম সিংহাসন-মূলে বসিয়া মহারাজ সুধিষ্টির, দেবর্ষি জীনানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'জগবন, মানবের সনাতন ধর্ম্ম কি ? জ্ঞান ভক্তি বৈশাখ্যের মূল্যবান ধর্ম্মের রহস্য, ধর্ম্মের গুণতত্ত্ব আপনার নিকট, তিমি আর কাগজ নিবটে জানিবার ইচ্ছা করিব ? আপনি প্রজাপতি পরমেশ্বর সাক্ষ্যে অজ্ঞান । উৎকট তথ্যযোগ সমাপি বলে তাঁহার অন্য না যোগ্য পুত্রগণও আপনার শ্রীচরণমূলে নিত্য প্রণাম । প্রভো, যদ্যপি ধর্ম্মগণ ধর্ম্মতত্ত্ব বিস্তৃত বিশেষণ করিয়াছেন সত্য, তথাপি আপনার ন্যায় শাস্ত কথন সাধুর মুখে, নারায়ণের বিস্তার মুখে এই ধর্ম্মের প্রকাশিত ওহ রহস্য শুনিবার জন্য আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে । প্রভো, আপনার বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের তুলনা হয় না ।'

সেই ধর্ম্ম প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, মহারাজ সুধিষ্টির, তুমি অশ্রয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ । প্রকৃত জ্ঞান ভক্তি লাভ করিতে হইলে ধর্ম্ম রহস্যই সর্বাগ্রে জানা প্রয়োজন, কারণ ধর্ম্ম না বুঝিলে অন্য কোন বিষয়েই জ্ঞাত হওয়া যায় না । তোমার সনাতন ধর্ম্ম প্রসঙ্গে, যিনি দুঃস্থমান ধর্ম্মের দাক্ষিণ্য পত্রীতে নিজ অংশে আবির্ভূত চইয়া লোকমঙ্গল বিধান ইচ্ছার বদয়িকাক্রমে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, আমি সেই ধর্ম্ম-সেতু ভগবান্ নারায়ণকে প্রশংসা করিয়া তুমুখ নিলিভ ধর্ম্ম বহস্য ব্যাখ্যা করিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর—

‘ধর্মমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো হরিঃ’

স্মৃতক ভবিদ্যাং রাজনু যেন চান্মা প্রসীদতি।” (শ্রীমদ্ভাগবতী)

সর্ববেদময় বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীহরিই ধর্মের মূল, ধর্মের অমায় ধর্মের সাক্ষী, এবং সেই বৈদ্য ঐষ্ট্য ভগবান্ কৃষ্ণগণের বাক্য স্মৃতিই ধর্মের শাস্তি মুক্তি আর যাগাতে চিত্ত নিখিল হয় প্রসন্ন হয় তাহাই ধর্মের সাক্ষ্য স্বরূপ।”

জীবের কর্তব্যবশে যখন জীবনতরী সংসার সাগরে ডুবু ডুবু হয়, তখন অনেক সময় এই ধর্মমূল ভগবানকে সাক্ষ্য প্রত্যক্ষভাবে না পাওয়া গেলেও অন্তরে অত্যাশ্রয়মীকণে ও বাহিরে গুরু মূর্তিবশে আবিভূত ও অমৃতব গোচর হইতে দেখা যায়।

অঙ্গদর্শন সহজে লাভ হয় না, সুতরাং সেই নিখিল বৈদ্য-কল্যাণের অমিত্যন সান্দানন্দ বসবিগ্রহ ভগবানকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল মনোনির্ভর ধর্মমূলই ধর্ম, আর তাহাদের পবিত্র বাক্য যাহাকে ক্রান্ত—

‘যং বিলিখ্যতু সনৎ ত্ত্বেষতম্।’

ভব-রোগের মহৌষধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যাগাতে সেই পূর্ণানন্দের অপূর্ণ প্রভাব সহস্রদ্বারে দৃষ্টি অনন্তকাল পাপদগ্ধ সংসারের উর্ধ্বতর বিধান করিতেছে সংসার-ময়-দেব পিপাসিতের শুশীতল মন্দাকিনী, আলিতের অবলম্বন দৃষ্টি পতিতের আশ্রয়ভূমি সেই স্মৃতিভেদ ধর্মমূল বলিয়া জানিতে হইবে। যাহাদি ধর্মগণ সর্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরির পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ধর্মের সত্য রহস্য ভগবানের দ্বারা সত্য করিয়া বিচার করিয়াছেন উভয়ই নাম স্মৃতি ব্রহ্মের দুই প্রকার ভাব প্রাপ্তিতে আশ্রয় প্রদত্ত সেই ভিত্তি স্মৃতির যতনর কাবণ হইলেও তাগাতে যথেষ্ট শাস্তি আছে, অত্যা আছে। নৌষধ তাই বলিলেন “যেন চান্মা প্রসীদতি।” জীবের বাহিরের বৈদ্যিক আনন্দ শ্রীহরি অবলম্বন আনিয়া দেয়। আশ্রয় ভূমি, আশ্রয় আনন্দই প্রকৃত আনন্দ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধর্ম লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া ভগবান্ সনৎ ধর্ম বাহ্য বলিয়াছেন যাহাদি ভবিদ্য বাক্যেও তাহারই প্রতিধ্বনি সাক্ষ্য ধর্ম মনোনির্ভর—

বেদোছবিধো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং

আচারশ্চৈব সাধুনামাশ্রয়নশ্চঠিরেব চ ।

ভগবদ্ভূতি বেদ সকল, বেদভাষ্যিগণের বাক্য স্মৃতি, সাধুগণের সদাচার ও আচার তুষ্টি তৃপ্তি, ইহাই ধর্ম্মের মূল। মহর্ষি বাজবল্যও ঐ কথাই বলিয়াছেন :—

ঋতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ সম্যচ প্রায়শ্চান্নম্

সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃত্যম্ ।

ঋতি স্মৃতি সদাচার আচারতৃপ্তিই ধর্ম্মের মূল। বাহাতে আচার তৃপ্তি শাস্তি হয় না, তাহা কখনই সাধুগণের আচরণীয় হয় না। হুতরাং কাল প্রভাবে উক্ত ধর্ম্ম লক্ষণ ঋতি স্মৃতি সদাচার লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

কালের প্রভাবে উন্নয়ন প্রধাবিত উন্নত জীবের আশ্রয়-স্মৃতি-জ্ঞান নষ্ট হইতে বসিয়াছে বলিয়া, ঐ পরমধর্ম্মের সজীবন রসায়ন পানে তাহার একান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছে; যাহাতে আত্মা প্রসন্ন নিমগ্ন হন আচার তৃপ্তি আনন্দ হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও পরম কল্যাণ হয়, জীব অনাদি আত্মা বহিমুখ বলিয়া আর কিছুতেই তাহা বরণ করিয়া লইতে চায় না; তাই তাব এত দ্বিতাপ হুঃখ সর্পির্দেহে তুটিয়া উঠিয়াছে। হুতরাং দেখা যাইতেছে, ঋতি স্মৃতি সদাচার বাদ দিলে আর ধর্ম্ম বলিয়া কিছু থাকে না কারণ উহাই ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ উহাই ধর্ম্মের শ্রমাণ এবং উহাই ভগবানের সর্পির্দেহ। পরমাত্মার উহাই একমাত্র শাস্তনা।

আজ জগতের কি বিশরিষণ। ধর্ম্মভ্রষ্ট মানব কামধর্ম্মের বহু মান করিয়াছে, আপাত মধুব নৈময়িক সুখে মুগ্ধ হইয়াছে, লুকু হইয়াছে, প্রকৃত সুখের পথে ধর্ম্মের পথে তাহার মতি নাই গতি নাই রতি নাই, ফলে হুঃখ দারিদ্র্য হাতাকার বধ বধনে পশুর ন্যায় নিপ্পোড়িত। বেদ স্মৃতি সদাচার ভুলিয়া দিল দিল মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে তবু জীবের চৈতন্য নাই। এইত বর্তমানে ধর্ম্মের অবস্থা।

আজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আচার্য্য আশ্রমের এই যে শোচনীয় অবপতন ইহারও মূল একমাত্র এই আচার ত্যাগরূপ ধর্ম্মহীনতা:—

এয়ত্যাং যেন দোষেণ মৃত্যুবিপ্রান জিহংসতি

অন্যত্যাগেণ বেনানামাকারস্য চ ব্লেদনাম্ মৃত্যুঃ ।

বেদাধ্যায়ন বিষয়িত হইয়া, স্মৃতি সঙ্গীতার পরিচয় করিয়া, যে দিন বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ, কল্যাণের রত হইরাছেন সেইদিন হইতেই তাঁহার অধঃগতন আরম্ভ হইয়াছে আর তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্মও ধ্বংস হইতে বসিয়াছে । ধর্মবল বড় বল ।

দেবর্ষি নারদ, ধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন “মহারাজ, পুণ্যোক্ত স্মৃতি সঙ্গীতার মূলে মানবগণের সাধারণ ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে এইবার বিশেষ রূপে বলিতেছি শ্রবণ কর :—

সত্য বাক্য, দয়া, একাদশী ত্র্যম্বক উপাস্য, শৌচ, তিথিক, যজ্ঞযুক্ত বিবেক, মনঃ সংযম বাহ্যেপ্রিয় সংযম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, দান বোধোচিত জপ, সরলতা, দৈবলব্ধ বিষয়ে সন্তোষ, সমদর্শী মহৎসেবা, সংসার প্রবর্তক কর্ম নিরুত্তি, ভোগ্যোগ, মনুষ্যকৃত কর্মের নিষ্ফলতা জ্ঞান, যথা বাক্যযোগ, আত্ম বিকার না বোধোচিতরূপে ভোগ্যে অন্নাদি বিভাগ, লক্ষ্যভূতে আত্ম দেবতা যুক্তি, বিশেষবশে মানবে আত্মার বিশিষ্ট প্রকাশ জ্ঞান, ভগবানের নাম লীলা গুণ ভবন কীর্তন স্মরণ, তাঁহার সেবা পূজা প্রণাম দাস্য মধ্য এবং তত্বরূপে আত্মনিবেশন, এই ত্রিংশলক্ষণ পরম ধর্ম সকল মানবগণের নিঃশ্রেয়ো জন্য কথিত হইয়াছে । যথাসাধ্য এই সকলের অমুষ্ঠানে সক্ষমতা ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া থাকেন ।” কিন্তু উপরোক্ত ব্যাপক লক্ষণ ধর্মের অমুষ্ঠান সহজ সাধ্য নহে । তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রণে সার্কজনীন ধর্মের সংক্ষেপ লক্ষণ নির্দেশক উত্তর দিয়াছেন যথা—

অহিংসা সত্য মন্ত্ৰেয়মকাম ক্রোধ লোভতা ।

ভূত প্রিয় হিতোহা চ ধর্মোহয়ং সার্কিবাক্যকঃ । (শ্রীমদ্ভাগবত ।)

অহিংসা, সত্যবাক্য, অচৌর্য্য, কাম ক্রোধ লোভ পরিচ্যাগ এবং প্রাণি-গণের হিতকর প্রিয় সাধনে চেষ্টা, ইত্যাহি সকল বর্ণের ধর্ম ।

কিন্তু হায়, আমরা নম্র জীবনে উহার একটা ভাবও ধারণ করিতে পারিলাম না । একমাত্র হিংসা লক্ষণ অধর্ম পরিচ্যাগ করিতে পারিলেও এ জীবনে মনুষ্যাত্মের বিকাশ হইত, কিন্তু তাহা পারিলাম কি ? মনের দ্বারা বাক্যের দ্বারা শরীরের দ্বারা কত পাপ করিতেছি তাহার সংখ্যা হয় না । অতকথা ছাড়িয়া দিয়া যদি উক্ত একটা অহিংসা ধর্ম পালন করিতাম তাহা হইলেও পরম

ধর্ম অমুষ্ঠিত হইত, কিন্তু তাহা পারিলাম না। উক্ত হিংসা লক্ষণ অধর্মেই জীবন পত্তনে পরিণত হইল কিন্তু তবু আমাদের গর্বের অবশিষ্ট নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন—মানব, যদি পরম ধর্ম লাভ করিতে চাও; কারমনোবাক্যে সর্বভূতে হিংসা পরিত্যাগ কর, উহাতেই তোমার সব পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে।

নৈতাদৃশ্যঃ পরোধর্মো নৃণাং সদ্ধর্মমিচ্ছতাং

ম্যাসো দণ্ডস্য ভূতেষু মনোবাক্যবজস্য তু । (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

হিংসার মত আর পাপ নাই। কিন্তু হিংসা ত্যাগ কবিতে পারিলাম কি ? মুক্তিমান কলি উক্ত দ্বার দিয়া এ দেহ রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আমাদের কি আর উদ্ধার আছে ? আগার এই জীবন ভগবৎ শ্রীতি লাভের জন্য আমাদের এত সাধ, কি দুরাশা।

আমরা জার উন্ন্যাস ধাবিত চাইনা ধরজানে যতকিছু অস্ত্রাশয় করিতেছি তাহাতে আমাদের দিন দিন অধর্মই বিস্তার হইতেছে। স্বভাব বিহিত ধর্মই সকলের আনন্দের কারণ হইয়া পাবে শ্রীতিম উক্ত হইয়াছে—

অধর্মো নিধনং ১০ : পরধর্মো ভয়াবহঃ ।

আবার ;—স্বভাব বিহিতো ধর্মঃ সত্য মেই ব্রহ্মভরে ? (ভাগবতম্)

কিন্তু আমরা মোটেই সে পথ ঘাইতে চাইনি। ভয়াবহ পরধর্মেই আমাদের প্রজ্ঞা অধিক। আমরা মনোহন ধর্ম পরিত্যাগ কবিয়া অধর্মশাধা বিধর্মে আশক্ত পরধর্মে প্রজ্ঞাবান ধর্মভাসে লাল্যবত, উপধর্মে লোলুপ, কলধর্মে ভক্তিমান কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন—

বিধর্মঃ পরধর্মন্ত আত্মম উপমাঞ্চলঃ

অধর্মশাধাঃ পক্ষমঃ ধর্মকোহধর্মভংগোহুতঃ ।

ধর্ম বাধো বিধর্মস্যোঃ পরধর্মোহন্যচৌদিতঃ

উপধর্মস্ত পাশাত্ত দম্বো বা শকতিচ্ছলঃ

যত্নিচ্ছ বা রতঃ পুত্রিরভাসোহাস্রমাঃ পৃথক্ ।

কিন্তু আমাদের ঐ সকল অসম্মত বিশেষ ধর্ম বুদ্ধি যুগ শ্রোতাবে এই সকল অধর্ম শাধাই ধর্মরূপে পরিণত হইয়াছে।

ভ্রাম্মণাদি বর্ণ চতুষ্ঠয় এখন আর অধর্ম্যে আস্থাবান্ নহেন, স্ব স্ব বর্ণ বিহিত কর্ম পরিচাল্য করিয়া সকলেই শখাচার পন্থায়ণ, অন্যধর্ম্যে আক্রাবান্ । এইত দেশের অবস্থা ।

শ্রেয়স্বর্য এতৌ, তৌমার পবিত্র সনাতন ধর্ম্মের স্পর্শ সুখ, এ জীবনে এ পাপ জগৎ অসুভব করিতে পারিলাম না । নিত্য অধর্ম্মে আশ্রয় হইয়া এ জগৎ নরজন্ম হেলায় কাটাইয়া দিলাম, মহতের পাদপঙ্কজ-স্পর্শেও মহাপাতকীর জীবন অমৃতময় হয়, কিন্তু দত্তে অভিমানে এ জীবনে তাহারও আশা শুদ্র পরাহত । আমাদেব গতি কি হইবে ? আর কোনই আশা নাই ভরসা নাই—

একমাত্র ভরসা, পরম মঙ্গল ঐহরিনাম সঙ্কীর্তন । তুমি, কলির পতিত জগৎ জনের অবস্থা বুঝিয়া এই সহজ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আজ ভক্তভাব অলীকাব করিয়া, অধম জীবের দ্বারে দ্বারে আবির্ভূত হইয়াছে, তাই আগম্ম হিমাতল এই সহজ ধর্ম্মে অসুপ্রাণিত হইয়াছে ।

‘ ঐ যে ভারতব বোজী কোটী অধম সম্মান তোমার ভুবন মঙ্গল নাম সঙ্কীর্তনে উন্নত হইয়াছে, করতাল মৃদঙ্গের পবিত্র ধ্বনিতে দিগ্‌মণ্ডল প্রাতিফলিত হইতেছে নামে গোমে মাতোয়ারা হইয়া সকলে দেহ গেহ আশ্ব বুজি ভাণিয়া, মঙ্গল নরনে তুমি লুক্কিত হইতেছে উহারাই ধন্য উহারাই কৃতার্থ । আজ সকলে বুঝিয়াছে—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয় লাম সঙ্কীর্তন—

এতদধে অবতীর্ণ ঐশচৌমদন ।

তাই অম্য ধর্ম্ম পরিচাল্য করিয়া তোমার শরণাগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি । তাই প্রকাশানন্দ সরস্বতীর দ্বার দ্বার মিলাইয়া বলিতেছি ।

ধর্ম্মাঙ্গ ষ্টঃ স নত শরণাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্ম

দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি ধর্ম্ম সত্যং সৃষ্টিং কালিনোসন

বদন্ত ঐহরিরস সুধাধাস মতোঃ প্রনৃত্য

জ্যৈষ্ঠায়তন বিলুপ্তি জ্যোতিঃ কলিনোদয়

নাম প্রভাব ।

—:—

পরিমার্জনীয়,—

শ্রীযুক্ত 'ভক্তি' সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীচরণ কমলেশু,—

মহাশয়,

নিম্নে শ্রীজীহরিনামের অন্যতম আনুসঙ্গিক গোণ মহিমার পরিচায়ক একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলাম । অনুগ্রহ পূর্বক ইহা আপনার "সুবিখ্যাত 'ভক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া নাম-কীর্তনের মহাত্ম্য প্রচার করতঃ কাব্যরপের উপকার সাধন করিবেন । নিবেদন ইতি ১৫৩১৭ শ্রাবণ শ্রীসত্য চরণ চন্দ্র । খিদিরপুর ।

(শ্রীশ্রীভগবদ্ব্যম কীর্তনের অন্যতম আনুসঙ্গিক গোণ প্রভাব ।)

'ভক্তি' পত্রিকার পাঠকবর্গ বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে খিদিরপুর, কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ দিকবর্তী একটি উপনগর । এখানে একটি হরিসভা ত্রিশবৎসরেরও অধিককাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, উক্ত সভায় সম্পাদক এক জন প্রাচীন গভর্নমেন্ট পেন্সেন ভোগী কর্মচারী, নাম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত মালীপাড়া গ্রামে ।

খিদিরপুরের মনসাতলায় তাঁহার একটি বাসাবাটা আছে । তথায় উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের পুত্রগণ কন্ঠোপলক্ষে পরিজনাদি সহিত বাস করেন । সম্পাদক মহাশয় কখনও স্বদেশে কখনও বাসা বাটাতে থাকেন । ঘটনার সময় তিনি দেশেই ছিলেন ।

সেটা রবিবার । গত ১৩২৩ সালের ২২শে মাঘ বেলা ২টার সময় অকস্মাৎ সম্পাদক মহাশয়ের উক্ত বাসাবাটাতে ইট পড়িতে লাগিল । বাসার অস্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, করিণ অবেষণ করিয়া কিছুই বাহির করিতে পারিলেন না ।

ইহার পূর্বে তারিখে উক্ত বাটার ছাদের উপরে ফুলের সুবাস অল্পকৃত হয় । উক্ত সুবাস এত অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল যে, উক্ত বাটার ও

পার্ব্বর্তী গৃহের বালকগণ অনেকেরই উক্ত ভ্রূবাস আশ্রয় করিবার জন্য ছানে উঠিয়াছিল।

একদা উক্ত ইট পড়িবার কোন কারণ কেহ বুঝিতে না পারিয়া লকলেই আশ্চর্য্যাবিভ হইলেন। উপদ্রব ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ভবিষ্য ও দেবীরা প্রতিবাদী সহস্র ব্যক্তিগণ উপদ্রব নিবারণ জন্য নামা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। আলিপুর জল আদালতের অনেক উকীল উক্ত হরিদভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তদীয় কর্মস্থল ও হাইকোর্ট হইতে দুইজন 'হিপ্‌নটীষ্ট' আনাইলেন, তাঁহারা বিবিধ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই উপদ্রব দ্বারা হইল না।

উক্ত সতীশ বাবু ও বর্তমান লেখক এবং আলিপুর জল কোর্টের অন্য একজন হিপ্‌নটীষ্ট বিদ্যাভিজ্ঞ উকীল বাবু দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বচকে উপদ্রব লক্ষ্য করার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কিছুকণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ একটা ছোট চুম্বকী বটি পড়িল। আর কিছুকণ পরে একটা জামা পড়িল। পরে উক্ত হিপ্‌নটীষ্ট উকীল মহাশয় ক্রিষ্ট জল মন্ত্রপুত করতঃ বাতীর গৃহিণী ও দুইটা বয়স গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। তার পরেই সেখানে থুতু পড়িতে দেখা গেল।

তখন উক্ত গৃহিণী ও বয়সকে গৃহের মধ্যে বাইরা বসিতে বলা হইল। তাঁহারা গৃহমধ্যে বাইবার পর একটা মিছরীর কোটা পড়িত হইল। কিছুকণ পরে একটা কিছুকণ উল্লসিত হইতে বয়ের মেঝেতে আসিয়া পড়িল। তাহা পরে সেই মন্ত্রপুত জলের গেলেশের ভিতর থুতু পরিতোষে তাহা লকলে উপস্থিত থাকিয়া দেবীরা ও ধরিতে পারিলেন না।

কেহ কেহ মনে করিলেন বাড়ীর বৌ দুইটিকে স্থানান্তরিত করিলে উপদ্রব শান্ত হইবে। তদনুযায়ী তাঁহাদিগকে পাড়ায় এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে রাখিয়া আসা হইল। কিন্তু কিছুকণ পরে সে বাড়ীতেও উপদ্রব আরম্ভ হইল। সে বাড়ীর কর্তৃপক্ষ গৃহদ্রব্যাদি তথ্য হইবার আশঙ্কায় বৌদুইটিকে তাঁহাদের আসল বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

উপজব বন্ধ হইল না। একটা গাছু পতিত হইয়া টোল খাইয়া গেল। একটা নারীকেল ভেলের বোতল একস্থান হইতে স্থানান্তরে আসিয়া পতিত হইল। কিন্তু একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল না কেবল মাত্র গলাটা ছাড়িয়া গেল। এমন কি ভিতরে যে নারীকেল ভেল শীতে জমাট বাধিয়া ছিল তাহাও পূর্ণরূপে লম্বাভীর আকারে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাঙ্গিল না। দ্রব্যাদি যখন বাহ্যপাড়ে কাহারও পায়ের উপর পড়ে না। কিন্তু স্থানান্তরিত হইবার সময়ে কেহ কিছুই দেখিতে পাননা। যখন ভূমিতে পতিত হয় তখন সেই শব্দ পাওয়া যায় ও কি পড়িল তাহা দেখা যায়।

সময়ে সময়ে যে দ্রব্য বরেক-ভিতরে চাবি বন্ধ আছে তাহাও আসিয়া দাওয়ার পড়ে। কেহ বলিলেন ঐ দ্রব্য দাওয়াতেই ছিল। সে জন্য দাওয়ায় কি কি দ্রব্য আছে-বস্তু পূর্ণরূপে দেখা হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল বাহা লেখানে ছিলনা বরেন্ন মধ্যে চাবি বন্ধ ছিল তাহাই আসিয়া দাওয়ার পতিত হইল।

এইরূপে তিন দিন কাটিয়া গেল, ২৫ এ মাস বুধবার প্রাতে একজন শুভা-কাজী প্রতিবেশী বিপর ভ্রাঙ্গন কল্যাণের তর ও-ক্রেস দেখিয়া একটা নাগপুরী রোজা ডাকিয়া আনিলেন। সে বলিল ৫৬ টাকা দিলে আমি ডাব, সিঙ্গুর, নেবু, কাপড় ২৫ প্রভৃতি ক্রয় করতঃ ভাল যেতালের পূজা করিয়া এই তৌতিক ব্যাপার শান্ত করিতে পারি। এবং এই ভূতকে একটা বোতলের মধ্যে পুরিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি। বোতলটি এত ভারি হইবে যে, আপনাত্মা কেহই তাহা উত্তোলন করিতে পারিবেন না।

এই সকল কথা শুনিয়া উক্ত হরিসম্ভার সহকারী সম্পাদক মহাশয় বলিলেন এই পূজা তামসিক ব্যাপার, আমরা প্রথমে সাংক্ষিক ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ ও হরিনাম কীর্তন করাইয়া দেখিব, হরিনামে শমন ভয় নিরাসিত হয়, ভূত প্রেতাদিতো অতি অল্প কথা। পরে অন্তমত দেখা যাইবে।

তদনুযায়ী আবশ্যক হইলে সংবাদ দেওয়া যাইবে বলিয়া সেদিনকার সত সেই রোজাটিকে বিদায় দেওয়া হইল। পরদিন বুধপতিবার প্রাতে উপজব অত্যন্ত দুর্জি পাইল। বাটার গৃহিণীর পদে একটা কাঠ খণ্ড অকস্মাৎ পতিত হইয়া তাঁহাকে ক্রুদ্ধিত আহত করিল। তরে কেহ রক্তনাদি করিতে সাহস করেন না। ইতি পূর্বে, পূর্ন দিবস সন্ধ্যাকালে নাগপুর রেল আফিস হইতে

একজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবীশিল্পী আসিয়া 'ঐ কৃত মেঘা বাইভেছে' বলিয়া চীৎকার করার বাতীর মহিলাগণ অতিশয় ক্ষীত হইরাছিলেন। এক্ষণে গৃহিণীর পক্ষে আশাও লাগার সকলেই সান্ত্বিত হইলেন।

সেইদিন অর্থাৎ দুহপাতিবার সন্ধ্যাকালে খিদিরপুর পল্লভপুর স্ট্রীটের ৩৯নং ভবনে শ্রীযুক্ত হীরালাল পট্টেল মহাশয়ের অসুস্থিত একটি হরিসভা হয়। তথায় খিদিরপুর হরিসভার পণ্ডিত শালিখা নিবাসী শ্রীযুক্ত জামকী লাল ভগবতভূষণ মহাশয় শ্রীমন্তাগবত ব্যাখ্যা করেন।

তাঁহাকে লইয়া বিপ্লব বাটীতে শ্রীমন্তাগবত পাঠ করাইবার ভদ্র খিদিরপুর হরিসভার সহকারী সম্পাদক মহাশয় সন্ধ্যাকালেই উক্ত ৩৯ নং ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাশয় হীরালাল বাবু নিজ বাটীতে পাঠ বন্ধ রাখিয়া পণ্ডিত মহাশয় সহ ঘটনাস্থলে গমন করিলেন।

তথায় "পুতনা মোক্ষন" লীলা পাঠ হইল। এবং পাঠান্তে স্বল্যম প্রসিদ্ধ নিত্যধামগত পণ্ডিতগণের দীপবজ্জু কাণ্ডীর্ষ বেনাশ্বর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত শশী ভূষণ দাস মহাশয় উক্ত কণ্ঠে সুমধুর তর্জিপুত স্বরে যুদ্ধ ও করতাল সঙ্গযোগে অন্যান্য এক ঘটাকাল ধরিয়া তালকব্জস সম্মিলিত করিলেন। রাত্রি আর ১১টার সময়গান সমাপ্ত হইল।

অতিশয় আনন্দের বিষয় পরদিন প্রাতে একবার মাত্র সেই গলাতলা নারীকেল ভেলের বোতলটি কিয়দ্দূর হানাত্তরিত হইবার পর হইতে অর্থাৎ বেলা ১টার পর হইতে সকল উপদ্রব শান্ত হইরাছে।

ঐ দিবস বেলা ১৪০ টার পর কনিঃ খৌটিকে কন্দাটায় তাঁহার ভাতি ভবনে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সেখানেও আর কোনও উপদ্রব হয় নাই। আর ঘটনাস্থলেও সকল উপদ্রব বন্ধ হইরাছে। অসম্মতি।

আমরা ঘটনাটি অবিকল প্রকাশ করিলাম এক্ষণে পাঠকগণ বিচার করণ এবং ব্যাখ্যা কি? আর লাম বলে যে অসন্তবও সম্ভব হয় তাঁহাও শুদ্ধ।

বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা ।

—:—

কলিকাতা “ভাগবত-ধর্ম-মণ্ডলের” ব্যাখ্যাক আচার্য্যগণ দ্বারা বিশেষরূপে পরিদর্শিত হইয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও লন ১০২৪ সাল ৪৩২ চৈতন্যাস্কের বৈষ্ণব-ব্রত-তালিকা প্রকাশ হইয়াছে, আমরা সাধারণের অবগতির জন্য ব্রত তালিকাটী নিম্নে অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিলাম । ভাগবতধর্ম মণ্ডলের সম্পাদক মহাশয় এই “নানামূনির নানামত” প্রচার রূপ যথার্থ ধর্ম কথের বিভ্রাট সময়ে এক্ষণ ব্যবস্থা সংগ্রহে পরিত্রাণ করিয়া সর্বসাধারণের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন । উক্তন্য তিনি যথার্থই ধন্যবাদার্থ । আমরা শ্রী শ্রীগৌর-ভগবানের নিকট তাঁহার সর্বদীন মঙ্গল প্রার্থনা করি । (ভঃ লঃ)

বৈশাখ ।

একাদশী	৫ই বুধবার ।
অক্ষয়তৃতীয়া, শ্রী শ্রীকৃষ্ণের চন্দন বাত্রা	১১ই মঙ্গলবার ।
সকল লগ্নমী (শ্রীজাহ্নবী পূজা)	১৫ই শনিবার ।
একাদশী	২০শে বুধস্পতিবার ।
নৃসিংহ চতুর্দশীব্রত	২৩শে রবিবার ।
শ্রী শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল বাত্রা	২৪শে সোমবার ।

জ্যৈষ্ঠ ।

একাদশী	৩রা বুধস্পতিবার ।
একাদশী	১৮ই শুক্রবার ।
শ্রী জগদ্বাধদেবের সান্নিধ্য বাত্রা	২২শে মঙ্গলবার ।

আষাঢ় ।

একাদশী	৭া শুক্রবার ।
শ্রী জগদ্বাধদেবের রথযাত্রা	৭ই বুধস্পতিবার ।
শ্রী জগদ্বাধদেবের পূনর্বাত্রা	১৬ই শনিবার ।

ମନମୋହନୀ (ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣସାଧ୍ୟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀହରିମ୍ବର ମହନ) ଚାତୁର୍ଦ୍ଧାତ ବ୍ରତାରତ	} ୧୧୧ ରବିବାର ।
ଏକାଦଶୀ	

୩୧ଶେ ରବିବାର ।

ଆଦ୍ୟ ।

ଏକାଦଶୀ (ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୂଳନବାହାରତ) (୧)	୧୫୧ ସୋମବାର ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହିମାପୋଷଣ	୧୫୧ ଯଜ୍ଞବାର ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୂଳନବାହାର ସମାପନ (ରାଧିକା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା)	୧୬୧ ଶୁକ୍ରବାର ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୟାଣ୍ଟିବ୍ରତ	୨୫୧ ଶୁକ୍ରବାର ।
ଏକାଦଶୀ	୨୬୧ ସୋମବାର ।

ଭାଦ୍ର ।

ଏକାଦଶୀ	୧୭୧ ବୁଧବାର ।
ଏକାଦଶୀ	୨୭୧ ବୁଧବାର ।

ଆଶ୍ୱିନ ।

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାଧାଣ୍ଟିବ୍ରତ	୮୧ ସୋମବାର ।
ମାଟିରକାନ୍ତନୀ (ବିଷ୍ଣୁଲ୍ୟା ଯୋଗ) ଶ୍ରବଣାବଦିନୀ (ନବ୍ୟାକାଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀହରିମ୍ବର ମାଟିରକାନ୍ତନୀ)	} ୧୧୧ ବୃହସ୍ପତିବାର ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାଧାଣ୍ଟିବ୍ରତର ଅନ୍ତ (ପୁରାଣି ଅନ୍ତେ ମାଟିରକାନ୍ତନୀ)	
ଏକାଦଶୀ	୧୨୧ ଶୁକ୍ରବାର ।
	୨୭୧ ବୃହସ୍ପତିବାର ।

କାର୍ତ୍ତିକ ।

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାଧାଣ୍ଟିବ୍ରତର ବିଜୟୋତ୍ସବ	୮୧ ବୃହସ୍ପତିବାର ।
ଏକାଦଶୀ	୨୧ ଶୁକ୍ରବାର ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟା ସମାପନ	୧୨୧ ସୋମବାର ।
ଏକାଦଶୀ	୨୫୧ ମଙ୍ଗଳବାର ।
ମୋକ୍ଷଦାଣ୍ଟିବ୍ରତ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ	୨୬୧ ବୃହସ୍ପତିବାର ।

ଅଗ୍ରହାୟଣ ।

ମୋକ୍ଷଦାଣ୍ଟିବ୍ରତ (ମୋକ୍ଷଦାଣ୍ଟିବ୍ରତ)	୮୧ ବୃହସ୍ପତିବାର ।
ଉପାସନାକାନ୍ତନୀ (ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ) ଚାତୁର୍ଦ୍ଧାତ ବ୍ରତ ସମାପନ , ଅପରାହ୍ଣେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀହରିମ୍ବର ଉତ୍ଥାନ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟା	} ୧୧୧ ରବିବାର ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের স্নানযাত্রা (ভীষ্মপঞ্চক সমাপ্ত)	১২ই বুধবার ।
একাদশী	২৪শে সোমবার ।
পৌষ ।	
একাদশী	১ই সোমবার ।
একাদশী	২৫শে বুধবার ।
মাঘ ।	
একাদশী	১০ই বুধবার ।
পুষ্যাতিথেক	১৪ই রবিবার ।
একাদশী	২৫শে বুধস্পতিবার ।
ফাল্গুন ।	
ষষ্ঠ পক্ষমী শ্রীকৃষ্ণার্চন	৩য় শুক্রবার ।
শ্রীশ্রীঅষ্টমপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব (মাকরী দপ্তমী)	৫ই রবিবার ।
তৈমী একাদশী	১ই বুধস্পতিবার ।
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব	১১ই শনিবার ।
একাদশী	২৫শে শনিবার ।
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ত্রত (২)	২৮শে মঙ্গলবার ।
চৈত্র ।	
একাদশী	১ই শনিবার ।
আমর্দকী ত্রত (শ্রীশ্রীগোবিন্দজন্ম)	১০ই রবিবার ।
শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা শ্রীশ্রীমদ্বৈপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব	} ১০ই বুধবার ।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা	

(এই দিবসে ৪৩৩ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ ।)

একাদশী	২৪শে রবিবার ।

উল্লেখ্য :—(১) "শ্রাবণে শুক্ল পক্ষেতু একাদশ্যাং পক্ষকে, হিন্দোলোৎসবনং কাধ্যং চতুর্দশং মতীপূনা ।" ইত্যাদিবচনানুসারে গজকর্কচরিত পূর্ণিমা প্রাপ্তি বিধি ধরিত্রা নিধিত হইল । এতদ্বশে ইহাই প্রচলিত ।

(২) শ্রীকৃষ্ণাবসনে বিদ্ধা না হওয়ার শিবরাত্রি ত্রত ২৭শে সোমবার হইবে ।

বিহু মত্রে নীকিতা (যতি ধর্ম পরায়ণা) বিধবা বিজ পত্নীগণের এই বিধানে উপবাস করাই একান্ত কর্তব্য ।

শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রেয়-প্রচার ।

(লেখক । — পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র ভূষণ বিদ্যাবিনোদ ।)

—:—

(১)

মরি কি মধুর নাম ।

কলিজীবকুল-পাবন কোটী ভক্তত শান্তিধাম ।

সেধে-কৈনে সুখা বিলাইছে দেশে কৃষ্ণাঞ্জলি রাম ।

ভুবন ভাসাল প্রেমের যে ঢেউ,

সে গোপত প্রেম জানিত কি কেউ ।

গোলোক-ভুলোক-চির-অনন্ত নিতাই বিলাস' নাম ,

নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি দেশ, প্রতি গ্রাম ।

(২)

ছুটিছে প্রেমের বান ।

নিতাই কঠে মুরজ-মন্ডে উঠিছে মধুর তান ।

সংকীর্তনানন্দ-মগন পুলকিত শত প্রাণ ।

সে অমিতা-পানে ভুবন ভুট,

ভক্তত-চকোর পরম পুট,

সকলি ছুট, কেবলি কষ্ট পরম কঠোর প্রাণ

অগাই-মাধাই আশ্রিত পাণ—অগতে মূর্তিমান ।

(৩)

মল মাধাই ভই !

কলক-বরে ভক্তক-করে হাঁকিছে—“অগাই কই !”

হতে দণ্ড অতি পাবণ মল মাধাই ভই ।

সীরধ পাখীর শাবী-শাখে পান,

ছুটে-আ হৃৎ পরশি' বিমান,

নীরব সকলি নদীরা-নগরে অগাই-মাধাই বই ।
নীবব নদীরা নীরবে কহিছে—“অগাই-মাধাই শুই ?”

(৪)

কঠিন কঠোর প্রাণ

যমের দোসর অগাই-মাধাই নাহি মানে ভগবান্ ।
লম্পটী ভীতি কল্মিষ-শত ভক্ত-ভজন পান ।

লভয়ে কাতরে বাঁপিল ধমনী,
নীরবে প্রকৃতি কাঁদিল অমনি,

নীরব তুর্ধ্য, নীরবে তুর্ধ্য অস্ত অচনে যান্ ।
কাঠন—কঠিন মাধাই যে তোর বজ্রকঠিন প্রাণ ।

(৫)

উঠে না আর গো রোল,—

মুরলী কণ্ঠে মধু নুপুংসে মধুমাধা হরিবোল ।
নীরব আজিরে মন্দিরে মধু-মন্দিরা বীণা খোল ।

তুই মে দয়াল-হরিনাম পার,
বাঁচিয়া মাধিয়া করুণা বিলাস,

পাতকী মাধাই করিছে প্রহার, নিতাই দিগ্ভেছে কোল ।
মাব খার আর করুণা বিলাস, মুখে বলে—“হরি বোল ।”

(৬)

স্বস্ত-মাখানো গা’ ।

স্মারিছে মাধাই,—ধরিছে নিতাই জড়ারে ভা’দের পা
বলে—“ও মাধাই ! দয়া ক’রে ভাই, একবার ‘নাম’ গা’ ।”

হৃকরে নিতাই—“স্মারিবি যে মাব—

মুখে ‘নাম’ শুধু বল একবার,

বলে বিদা-মূলে কিনে নে রে মোরে, একবার কিরে চা’ ।”
(তবু) বণ্ড হু’জনা দণ্ড লইয়া পুটে স্মারিছে বা ।

(৭)

অগাই বাশে অগং কাঁপে, হেথায় প্রভু দরদী
 নিতাই তরে উদ্ধাস্তরে উঠিল মরি কাঁদিয়া।
 আসিল তবে তথায় যবে পারক প্রেমপয়োবি,
 তখনো প্রেম বিলাতে ছিল নিতাই তারে মাখিয়া।

(৮)

আইল নিমাই, ভাই-দুইজন পাইল দিব্যশিক্ষা;
 হুটিল চক্ষু, হুটি বুড়ুক্ষু, পেল প্রেমমুখা তিকা।
 লভিল দীক্ষা, প্রেম, তিতিক্ষা, দুইটি পাতকী ভাই;
 দেখরে করে বিশ্বাস, নমি’ বিশ্বপতির পায়।

(৯)

বিশ্মিত হেন দৃশ্য দেখিয়া—মাখাই ধরিল পা’
 —গৌরবরণ “গৌর” অঙ্গে লেগেছে যতেক যা।
 —গোড়দেশের গৌরবরবি ভাঙিল নদীয়া গায়।
 তরু তখন মুক্তকণ্ঠে ‘নামের’ মহিমা গায়।

(১০)

মরি কি অছুত তব প্রেম-পরচার।
 হে দরদাল! নিতাই সুন্দর।
 মার ধেরে প্রেমখন বিলাইলে ছার।
 উদ্ধারিলে কত নারী মর।
 প্রেম সে পবনমণি পরশি ব’রেক
 কত লোহা হ’রে গেল মোনা।
 অগ’ই-মাখাই পাণী ভাই হ’জনার
 দুটাইলে তবে আনাগোনা।
 আমরি করুণা তব করুণাবতার।
 কীর্তি তব রহিবে অক্ষয়।
 মরি’ এ অপূর্ণ তব ‘প্রেমের প্রচার’
 বিশ্বতরি গাবে তই জয়।

কাম ও প্রেম ।

(লেখক ।—শ্রীযুক্ত দত্তোয় কুণ্ডার সরকার)

—:—

কাম ও প্রেম নামে যে দুইটা বিষয় আছে তাহার অর্থ ভিন্ন হইলেও আজ কাল অধিকাংশ স্থলে একসাত্র রমণ, ব্যাভিচার পূর্ব অন্ত্রীলতায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু প্রেম শব্দের অর্থ বাস্তবিক তাহা নহে। প্রেমের অভ্যন্তরে যে এক মধুর সাদ গুণ রস নিহিত আছে তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে সেই রসে চিত্ত দবিল্লিত হইয়া সমস্ত প্রকার ভেদ, ভ্রম, দবিল্লিত হইয়া যায়। আর কাম—কাম প্রেম হইতে এক পদতর বহু। মাদিক জনতে ইহাই ব্যাভিচার। ইহাই ততি অণে আজ কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাংসর্ষ্য এই ছরটা রিপু। ইহার মধ্যে কামই সর্কশপান। এই বাস প্রতিহত হইলে ক্রোধ পণে পরিণত হয়। কামনার আভিশযো লোভ, এই দুর্দমনীয় কাম হইতে জন আনবিত হইলেই দেহি বা মানব মোহ জালে আচ্ছন্ন হয়। ইহারই প্রাণেশ্য জীব মদগর্কে গর্কিত বা উন্নত হইয়া পড়ে। মদ হইতে মাংসর্ষ্য ভাব বা পনডীকাতরতা আমিয়া উপস্থিত হয়। এই দুর্জয় কামই ইন্দ্রিয়ের নেতা আর মানব ইহা হইতেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।

“কাম এয ক্রোধ এয বজোপণ সমুত্তর।

মহাপানো মহাপাপা বিজ্ঞান মিহ বৈরিণম ॥” (সীতা ৩৩৭)

“এই কাম ও ক্রোধ বজোপণ হইতে সমুৎপন্ন, ইহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না, ইহা অতিশয উগ্র (মহাপাপ) ইহাকেই এ সংসারের পরম শত্রু বলিয়া জানিবে।” এই কাম ও ক্রোধের প্ররোচনার জীব যাবতীয় পাপ কার্য করিয়া থাকে, ক্রোধ, কাম হইতে পূর্বক নহে, কারণ কাম বাধা প্রাপ্ত হইলেই ক্রোধ রূপে পরিণত হয়, তাহা আমি পূর্বে বলিয়াছি। ভগতে যত বল আছে সমস্ত সাইলেও কামনার উপর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। ইহা দুস্পৃণীয় ও মহাপাপ

ধরুন! যখন আমার কিছুই ছিলনা যখন হারিভের জীবন কথ খাও—কত বিকৃত দেখে সংসারে প্রবর্তিত হইয়াছিলাম—তখন মনে করিতাম যদি কোন প্রকারে পঁচিশটা টাকা আর হয় তাহা হইলে এককণ চলিতে পারে কিন্তু যেমন পঁচিশটা টাকা আর হইল, অমনি বাসনার লেলিহান শিখা ইন্ডের অন্য দীরে দীপ্ত জলিয়া উঠিল। আবার তখন মনে হইল যদি আর পাঁচ টাকা রুপি হয় তবে বেশ চলে, যদি তাহাও হইল—আরও পাঁচ টাকা—হার। ক্রমেই আশা রুপি পাইতে লাগিল। ক্রমে লক্ষপতি কোটিপতি হইবার বাসনা—আমনার নিম্নস্তি কিছুতেই নাই—সদাই অভাব। আকাঙ্ক্ষার পরিচিতি সাধন না হইলে ক্রোধের উদয় হয়। কামনার অনল প্রবল হইয়া উঠে।

এখানে কাম কি—তাড়াই ধারণা করা কর্তব্য। বিষয় ভোগের ইচ্ছা কামনা। জীবের মধ্যে যে সঙ্কল্প বিকল উঠে সে সঙ্কল্প বিকল বস্তুটাই মন। মনের গতি নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে। আধার ভেদে আধেয়ের পরিবর্তন হয়। মনের নিকটে যখন রূপ, রস গন্ধ শব্দ, স্পর্শ আসে তখন মন রূপ ভেদে আকার ধারণ করে। মনের বিষয়াকারে পরিণতি হওয়াকে রুচি বলে; ইহাই কাম। রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদির ভোগের ইচ্ছা বা মন, আহার নিজের দেহকে সুন্দর রাখা, ফিট্ ফিট্ রাখা শব্দ চন্দন, বসিতা বিলাসে রাখা ইহাও কামনা। জীবের যে এ ইচ্ছা হয় ইহার মূলে একটা অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা থাকে। এ অজ্ঞানের প্রভাব স্বরূপতঃ সুন্দর, বাহ্য অভ্যন্তরঃ রমণীয় দর্শন—অজ্ঞান তাহাকে ভুলাইয়া দেয়, বাহ্য সুন্দর নচে তাহাকে সুন্দর করিয়া চক্ষুর সন্মুখে ধরে তাই রূপ রস গন্ধ, স্পর্শ লভ্যাদি এত সুন্দর দেখায়। অজ্ঞানকে জীবের ভোগের যে ইচ্ছা তাহাই কাম বা কামনা। কামনা মনের ধর্ম, বহু প্রকারে মন বিষয়াকারে রূপান্তরিত হয়। অনবরত বিষয় চিন্তা করিলে বিষয়ে আশক্তি জন্মিবে, এই বিষয়শক্তি বড়ই মধুর বড়ই প্রীতিপ্রদ। এই আশক্তি হইতে কৃপা জন্মে—এই কৃপার নাম কাম বা কামনা। প্রতিহত হইলে যে আশা হয় সেই আশাই ক্রোধ। ক্রোধ জন্মিলেই মনুষ্য কাৰ্য্যকাৰ্য্য বিচার শূন্য হয় ইহাই মোহ; মোহ হইলে বুদ্ধি ব্রংশ হয়—তখন বিষয় ভোগ রূপ সংসারে পড়ন হয়।

“ধূমেনাত্রিযতে বহির্ধ্বাদর্শো মলেন চ।

যথোষ্মেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনৈলমাবৃতঃ।” (গীতা ৩।৩৮)

“যেমন বহিঃ ধূম দ্বারা, মল দ্বারা দর্পণ এবং অরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়
তদ্রূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে।”

মন বিষয় ভোগ রূপ সংসারে গিয়া পড়িলে বিষয়াদি অশুকল হয়, তখন
অমুরাগ জন্মে। অমুরাগ যে বস্তুর উপর জন্মায় তাহাকে লইয়া মনে মনে নানা
রূপ কল্পনা জন্মনা চলিতে থাকে—বুদ্ধি তখন বিষয় মগ্নে কলুষিত হইয়া নিশ্চয়
কল্পিয়াছিল—বিষয় লেবা করা কতব্য, জীব এই রূপে বিষয় কামনা করিল—
জামার জার, আমার চিত্ত, আমার প্রাণাদ হউক। এই তীর অভিলাষ যেতু যে
চিত্ত রুতি তাহাই কাম। কাম মনের ধর্ম—কাম মঙ্গল মূলক।

প্রথমে মঙ্গল পরে কাম। ইষ্ট সাধনের বাসনাকপ অজ্ঞান সত্ত্ব মঙ্গল
হইতে কাম বা ইচ্ছা—অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি সাধনে যে চিন্তা বুদ্ধি তাহাই
কাম। এই কাম হইতে রজ, ক্রোধ হইতে তম ওণের উৎপত্তি। কাম কর্ত্তব্য
কারণ এই জন্য কামের প্রাধান্য।

তুমি পরমা সুন্দরী কোন রমণীকে দেখিলে—তাহার রূপ দৌল, বিলাস
কটাক, হাস, ভাব, বিলাস, বিক্রম তোমার চক্ষে পড়িল, তখন তোমার ভোগের
আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। প্রথম দর্শনে আশ্চর্য্য হইলে—ক্রমে নিরন্তর
তাহাকে চিন্তা করিতে লাগিলে কিম্বা মথো মথ্যে আবার তাহাকে দেখিতে
পাইলে, ফলে কপল মোহের সৃষ্টি হইল, তখন তুমি পতঙ্গের মত সেই
রূপমিতে বাঁপ দিলে। এই মন মঙ্গল যোগ—এই মনসিজ যোগ রক্তির
নাম কাম। আমাদের পুরাণে কাম দেবতার একটা নাম মনসিজ। এই
কামের বাস্তবিক বস্তু উদ্ভূত নাই, আমাদের বস্তব্য বিষয় ভূত মড়িরপুর মথ্যে
অন্যতম বলবান। লংকৃত চন্দ্রোদয় নাটকে মোহের পক্ষে কামই প্রধান
সেনাপতি।

একণে তাবিয়া দেখ মানব। তোমার এই কামের পরিপূরণের জন্য কত
আগ্রহ, কত যত্ন। পরিণামের লাভালাভ বিচার কর বর্ত্তমানের সুবিধা
অসুবিধা বিবেচনা কর, যে বস্তুর জন্য তুমি লালায়িত সেই বস্তুর তত্ত্ব তন্ন রূপে
বিচার কর, দেখিবে কাম থাকিবে না—মন-মলিন হইতে উৎখিত হুঁ হুঁ

মন-সঙ্গিলে মিলাইয়া বাইবে। এই কাম বর্তমানে নানাকণ উৎকর্ষার জনক
বহুবিধ যন্ত্রণার কারণ; তাহা হুংখ কর্ত্ত' বটেই পরিণামে অমৃতপ্ত, যন্ত্রণাশ্রক
ও বিপদ জনক। অমৃতকে অমৃত ভাবা, হুংখকে হুংখ ভাবা, অজ্ঞানের
কাৰ্য্য; এই কাম অজ্ঞান সজ্জত। এই অজ্ঞান সজ্জত কামের উচ্ছিন্নই
মানবের দেবত্ব। কামই মানবকে ক্রমে নিচের দিকে টানিয়া লইয়া যায়—
নরকের দ্বার উন্মুক্ত করে।

কামই যখন প্রবল ভাব ধারণ করে, তখন কুন্তিল্লাদি সমাকীর্ণ কল্লোল-
মালায় নদ-তখন ইহা কি ভয়ঙ্কর। আবার ইহা যখন অপ্রবল ক্ষুদ্র তখন
ইহা পক্ষি পক্ষ মাঝ। আবার এই কামকে যথাস্থ কণ্ঠব্য বুদ্ধিতে সংবৃত্ত
ভাবে পরিচালিত করিলে পর ইহা সংশোধিত বিষের মত মানব জাতির ওষা
জগতের উপকারক বস্তু হইয়া থাকে। এই কাম আছে তাই সৃষ্টি প্রবাহ নষ্ট
হয় না—কাম না থাকিলে জীব, জন্তু, কাট, পতঙ্গাদি জন্মিত না—জীব না
থাকিলে সৃষ্টি ধারা থাকিত না—জগতে প্রলয়ের বিধান বাজিত। এই বথাস্থ
সংবৃত্ত ভাবে সেব্য সম্যক প্রযুক্ত কাম হইবে নহে। এট কামই আবার
চতুর্দিক্গেদ্ব মধ্যে অন্ততম।

কামের প্রাবল্য এতট অধিক যে, মানব কামকে আপনার আয়ত্তে আনিতে
পারে না বরং কামের আয়ত্তে আইসে, কামকে অত্যন্ত নেশার মত করিয়া
বসে। কামের আবাদ লবণাক্ত কিন্তু লবণ জগৎ শরীরের পক্ষে একান্ত
প্রয়োজনীয়।

প্রেম স্বচ্ছতোরা তটিনী। প্রেম তটিনীতে কল্লোলের ভীষণ পঙ্কজ নাই
হাস্য কুণ্ডীরের পললপলম নাই, ইহা নীরবে জলরে বহে, জলের অত্যন্তরকে
সরল-কোমল প্রবীভূত করিয়া দেয়। মালিন্য পাপ গুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার
করিয়া তুলে; সেই পরিষ্কৃত প্রবীভূত জলয়ে সহজেই পরমার্থ চ্যোতি বা
ভ্রমবৎ কৃপা পতিত হয়। কাম যেমন উৎকর্ষা-কঠোর-সংকল্প কুটিলতার
প্রকৃতির জনক বলিয়া বর্তমানে হুংখ কর, পরিণামে লান্না বাতলা ও কত
বিপদের হেতু হইয়া থাকে, প্রেম কিন্তু কি বর্তমানে কি পরিণামে সকল
সময়েই মধুরতাম্র—হুংখ যন্ত্রণার কোন অংশহাউই নাই, প্রেম নিরাশিল
জনন, অশ্রু শান্তি।

তবে 'পিরীত হৃৎকের করণ' বলিয়া করিয়া বলেন—তাহা আসল প্রেম নহে। সংসারিক প্রেম মাত্রেই কাম মিশ্রিত। অগ হউক বেশী হউক সম্পূর্ণ কাম মিশ্রিত প্রেম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। মানব নিকাম না হইলে তাহার প্রেম নিকাম হইবে কি রূপে? আর নিকাম না হইলে সে প্রেম কাম মিশ্রিত।

কাম মানুষকে স্বার্থপর করে। প্রেম স্বার্থত্যাগী করে যে প্রেম, প্রেমপাত্রকে চক্ষুর আড়াল করিতে চায় ন, প্রেম আরও দূরে থাকিলে জনং জীর্ণারণ্যং প্রতীত করায়, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম নহে। সে প্রেমে কাম-বাদ মিশ্রিত আছে। কাম যখন প্রেমের আসনে বসে আর আমরা কামের সেবক সেই কামকে প্রেম বলিয়া হৃৎকাত করি! কি অন্ধ ভ্রম—কি বিশ্বাস! তবে কদাচিৎ কাম-অদার স্তরের মধ্যে প্রেম-হীরকও পাওয়া গিয়া থাকে।

প্রেম ভোগ চায় না। নিজেকে ভুলিয়া নিজের হৃৎক, হৃৎক, হিত, অহিত, ভুলিয়া যে প্রেম তাহাই আসল প্রেম। গোপিকাদের প্রেমই প্রেমের চরমোৎকর্ষ। সেই প্রেমের কোন ব্যবধান নাই, লজ্জা, ঘৃণা, নারীহ কর্তব্য জ্ঞান সমস্তই প্রেম ষাড়ে পড়িয়া গিয়াছে। এ প্রেমে কামের পুতি, গন্ধ নাই আলায়ী ভাব নাই—কেবল মিত্র, চন্দ্রকরের স্তায় নির্মল ও মধুর। দাম্পত্য প্রেম সাধারণতঃ খাঁটি প্রেম নহে। তবে আদর্শ সতী সাধ্বী কখন কখন যথার্থ প্রেমের উচ্চাঙ্গ দাবী করিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত পুরাণে বিরল নহে। স্বামী ধৃতরাষ্ট্র অম্বাভ, তাই পরী গাঙ্গারী আপনায় চক্ষু অন্মের মত আবদ্ধ করিয়া অম্বাভ হটয়া রহিলেন। প্রেম সম্বন্ধে ভাবিতে, পুরাণে, বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক অমূল্য উপদেশ আছে। আমার স্তায় দীনেশচন্দ্র এই কঠিন বিষয় অধিক আর কি বুঝাইতে পারিবে! প্রেম যে কি তাহা বুঝান বাহানা, অমৃতত্বের জিনিষ। প্রেমরস যিনি অমৃতত্ব করিয়াছেন তিনিই জানেন ইহা কত মধুর, কত সুন্দর ॥ এই প্রেমকল যিনি লাভ করিয়াছেন তিনিই ধন্ত— তাহার জন্ম সার্থক। আমরা কেবল কামের সেবা করিতেছি, প্রেমের মাহাত্ম্য কি বুঝি? আর কি বা বুঝাইব।

ভারতে ধর্ম-বিপ্লব ও শ্রীগৌরান্দ-প্রভাব।

(লেখক।—শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র সরকার।)

—:—

আর্য্য ঋষিগণ বেদের বহু দেবতার মধ্যে বিষ্ণুকর্তৃ পরম দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বিষ্ণুকে পাইবার জন্য তাঁহারা উগাসনা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন :—

তদ্ বিশ্রাসো বিশন্যবো জাগ্‌বাং সঃ সমিদ্ধতে বিহোৰ্যং পরমং পদম্।

সামবেদ ২১০।২১

বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞ মূর্তি এবং যজ্ঞকেই বৈষ্ণব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বে যজ্ঞঃ স্বয়ম্বেনং। (ঐত্তরেয় ব্রাহ্মণ।)

শাস্ত্র হইতে আরও অবগত হওয়া যায়—“সর্গ কামো যজ্ঞেত”

আর্য্য যুগ্ময় স্বর্গধাম পাইবার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর। ইহার দ্বারা অনুমান হয় যে বৈদিক যুগে আর্য্য ঋষিগণ যজ্ঞিক বা বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গও ঈশ্বর প্রাপ্ত হইতেন। যজুর্বেদীয় একটা মন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সে সময় অহিংসক মত প্রচলিত ছিল, তজ্জন্য যজ্ঞাদিতে পশুবধ প্রচলিত থাকা সম্ভব পর মনে হয় না :—

“মা হিংসৌ পুরুষং জগং।”

এবং মাঘ তজ্জনও নিষিদ্ধ হইয়াছিল :—

ন মাধাণাম অশীর্ষাদ্ অযজ্জিয়া বৈমাধাঃ। (শৈবতায়নী সং (যজু))

ন মাধাণাম্ অশীর্ষাদ্ অনেধ্যা বৈ মাধাঃ। (কঠাসং (যজু))

মহাত্মারূপ হইতে অবগত হওয়া যায় যে প্রসিদ্ধ ভারত যুদ্ধের পর সমাজে কলি প্রবেশ লাভ করে। মহাযুদ্ধের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এজগতে বর্তমান ছিলেন, তিনি যুদ্ধদিন খীর পাদ পদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন তৎকাল কলি ধরাভাসকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—

ধাং ন পাদি পদ্মাত্ম্যে স্পর্শে মাং বহুকরাণ্য

তাবৎ পৃথী পরিস্রব্ধে সমর্থোনাভবৎ কলিঃ । (বিষ্ণু পুরাণ)

৫৭ দিন ভগবান স্বর্গে গমন করেন সেই দিনই কলি আদিয়া উপস্থিত হয় ।

যশ্বিন কৃষ্ণোদ্যবৎ যাত স্তম্বিনেব তদাহনি ।

প্রতিপল্লং কলিয়ুগং তস্য সংখ্যা নিবোধ মে ।

(বিষ্ণু পুরাণ ৪।২৪।৪০)

এই কলির প্রভাবে বিষ্ণু তরু যান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া বিপণ্য শ্রামী হইয়া পড়েন । এই সময় হইতে সমাজ অবৈদিক কার্যাদি এবং যজ্ঞাদিতে পশু হস্ত ইত্যাদি হিংসা প্রচলিত হয় । উহা নিবারণার্থে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হয় এক সমাজ প্রধানতঃ দুই প্রেক্ষিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে । এক দল জীব হিংসার সাপক্ষে এবং অপর দল উহার বিপক্ষে দাঁড়ায় । এই উভয় দলে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই যোগ ছিল । মহাত্মার ও বিষ্ণু পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কুরুবংশের সর কোণলে ইক্ষাকুগণ, উত্তর ভারত ও মগধে শিশুনাগগণ রাজত্ব স্থাপন করেন । ইহার পর ব্রাহ্মণী ধর্ম অত্যন্ত অবল হইয়া উঠে বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি লোপ পাইয়া তৎ পরিস্রব্ধে পশুপথ ও হিংসাদি কার্য রুদ্ধি পায় এবং বহু ধর্ম সম্প্রদায় গঠিত হয় । এমন সময় অহিংসা ধর্ম প্রচারের জন্য গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় । তাঁহার পিতা মাতা বৌদ্ধ ছিলেন । বুদ্ধ যমত প্রচার করিয়া তপ জপ যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি নিবারণ করেন । বুদ্ধের সম সাময়িক মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচার করিয়া কিংদ পরিমাণে বৌদ্ধ ধর্মের পোষকতা করেন । প্রায় ছয় শত বৎসর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত থাকে । বৌদ্ধ ও জৈনী প্রভাবে বৈদিক ও ব্রাহ্মণী ধর্ম শিথিল হইয়া পড়ে । বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ব্রাহ্মণগণ বড়ই নিরিহ তাব অবলম্বন করিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই নব প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ একাংশের অবসর পাইলেন । শিশু নাগ বংশের পতন হইবার পর লক্ষ্যবংশের নরজন রাজা প্রায় শতবৎসর রাজত্ব করেন তদনন্তর মোর্ধ্যবংশের আবির্ভাব হয় । মোর্ধ্যবংশের প্রথম নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত ৩৬৭ খঃ পূঃ সিংহাসনাক্রম্ হন এবং প্রায় ২৪৪বৎসর মগধে রাজত্ব করেন তাঁহার সময়ে দেশের সর্বত্র শিব ও বিষ্ণু মন্দির বিদ্যমান ছিল । চন্দ্রগুপ্ত হইতে বৃহদ্রথ পর্যন্ত নরজন

জৈষ্ঠ ও আষাঢ়. ১৩২৪।] ভারতে ধর্ম-বিপ্লব ও ঐগৌরব। ২৪১

মৌর্য নৃপতি ১৩৭ বংসর রাজত্ব করেন। মৌর্য সম্রাট অশোক একজন গোড়া বৌদ্ধ হইলেও সকল ধর্মের প্রতি সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তথাপি ব্রাহ্মণী ধর্মের নেতা ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, কারণ “বৎ সমতা” ও “ব্যবহার সমতা” এচার ও জীব তিংসা রচিত করিতাহিলেন। বলি দ্বৈর ব্রাহ্মণগণ বহু পুণ্যদ্বিতে জীব হিংসা করিতে পাঠিতেন না ও ব্রাহ্মণ তাহার প্রাণাধিত হইয়া মৌর্যবংশ ধ্বংসের ভয় বহু পরিত্যক্ত হন, কিন্তু অশোকের সময় তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবার সুযোগ ঘটে নাই। অশোকের মৃত্যুর পর যখন মৌর্য নৃপতিগণ হীন বল হইয়া পড়িলেন তখন ব্রাহ্মণগণ প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্রকে রাজত্বের লোভ দেখাইয়া রাজ্য বিচ্ছেদ উৎসেজিত করিয়া তুলিলেন। পুষ্যমিত্র বৌদ্ধদেবী ও পরম ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন, তিনি সিংহাসনাত্যক্ত হইয়া অহিংসা ধর্মের বিচ্ছেদ এক বিরাট অবশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

ভক্তবংশ প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের আধিপত্য বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ-গণ পুনরায় সমাজ, ধর্ম এবং আচার ব্যবহারের নেতা হইলেন। ভক্তবংশ ১১২ বংসর রাজত্ব করেন। শেষ ভক্তাধিপ দেবভূতি তাঁহার মন্ত্রী কার্বাশ্রমেব কর্তৃক নিহত হন।

কার্ববংশ। দেবভূতিকে চতুর্থ করিয়া কার্বমেব সিংহাসনে বসেন ও কার্ব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। দেবভূতির চতুর্কাণ্ড লইয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পৃথু বিবাদ আরম্ভ হইলেও ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল।

শকবংশ ও আক্ৰ নৃপতিগণ সাম্যবাদী ছিলেন ব্রাহ্মণ ও অধম উভয়কেই সমানর করিতেন।

নাগবংশ। শক সম্রাট কনিকের যত্নে “মহাবান” ধর্মের সূত্রপাত হয় এবং নাগাজুনের যত্নে মহাবান মতের প্রতিষ্ঠা হয়। সাতবাহন রাজা নাগাজুনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মহাবান ধর্মের নীতি ও উপনিষদের তত্ত্ব প্রচার থাকিতে আত্মজ্ঞান সাধারণ উহার আশ্রয় করেন। অহিংসা ও পুণ্যবাদ এই ধর্মের মূল মন্ত্র।

ভক্তবংশ। এই বংশের নৃপতিগণ ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিলেন। ৩১১-২০ খৃঃ পূঃ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে রাজব বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম-

চার্লস বৈদিক বিপ্লবের পটভূমি স্থাপন করেন। সমুদ্র গুপ্ত অর্থসঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়া ব্রাহ্মণী ধর্মের আধার প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্তগণ বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। ইহা-
দ্বিগের মধ্যে বিক্রমাদিত্য সর্ব প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ঐতিহাসিকগণ অনুমান
করেন যে, যশোবর্মাই চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ছিলেন। ইনি শৈব
হইলেও সকল ধর্মের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিতেন। গুপ্ত নৃপতিগণের
সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম হীনপ্রভ হইতে থাকে এবং তখন রাজগুপ্ত নৃপতিবৃন্দ
বৌদ্ধ ধর্মকে সমূল বিনাশ করিবার জন্য বহু পদক্ষেপ হন তজ্জন্য ব্রাহ্মণ্য-
ধর্ম সর্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল। এমন সময়ে ৭৮৮ঃ-অঙ্গে
জীশঙ্করাচার্যের আবির্ভাব হয়। প্রায় চরশত বৎসর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম
প্রচলিত থাকায় ও নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হওয়াতে সনাতন হিন্দু
ধর্ম ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদি প্রায়ই লোপ হইয়া আসিয়াছিল তজ্জন্য শঙ্কর
যেদন্তমত প্রচার দ্বারা বৌদ্ধ, জৈন, তাত্ত্বিক মত খণ্ডন করিয়া হিন্দু ধর্মের
পুনরুদ্ধারের ব্রত করেন।

জীশঙ্করাচার্যের আবির্ভাবে বৌদ্ধ প্রভাব শূন্য হইলেও বৈষ্ণব ধর্ম তখন
প্রবল হয় নাই। তাঁহার সময়ে এদেশে সাধারণতঃ ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব,
পাকুরাঠ, বৈষ্ণব ও কণ্ঠতীন এই ছয় সম্প্রদায় বৈষ্ণব ছিলেন :—

ভক্তা ভাগবতান্ধব বৈষ্ণবাঃ পাকুরাষ্টিনঃ।

বৈষ্ণবানমাঃ ধন্বহীনঃ ষড়্ বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ ॥ (শঙ্কর দিগ্বিজয়ী)

কিন্তু বৌদ্ধ ও শঙ্কর প্রভাবে এই সব বৈষ্ণব দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ
উন্নতি সংসাধিত হয় নাই। শঙ্কর দ্বারা বৈদ্য বিবোধী বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষ
হইতে সিক্রান্ত হইলে তাহার প্রভাবে শৈব মত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।
তদনন্তর দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ স্বামীরা আর্জিবে ভক্তি শাস্ত্র ও বৈষ্ণব মত
বহুল ভাবে প্রচার হয় কিন্তু তাঁহার শিক্ষা ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতিদিগের মধ্যে
আবদ্ধ থাকায় ও বহুকাল ধাবৎ হিন্দুগণ বৌদ্ধ, শূদ্ৰবাদী, মায়াবাদী প্রভৃতির
সংস্পর্শে থাকাতে সাধারণের গুরু হইলে ভক্তির প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে
নাই। অবশেষে প্রেমের অবতার জীগোয়াক্ষের পঞ্চদশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ
হইয়া উক্ত নীচ সকলকে প্রেম ও ভক্তি বিত্তরণ করিয়া জনগণকে মাতাইয়া তুলেন।

শ্রী শ্রীসৌর-ভগবান যে সময় আবির্ভূত হন তখন সাংসারিক লোক বিস্ময়-
মগ্নে বস্তু থাকিয়া তাত্ত্বিক আচার ও উপধর্মের অগ্রচর্চা করিতেন :—

“সকল সংসারি বস্তু ব্যবহার রসে ।
কৃষ্ণ কৃপা কৃষ্ণ ভক্তি নাহি কারো বাসে ॥
বাস্তবী পূজরে কেহ নামা উপহারে ।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক পূজা করে ॥

তখন বঙ্গদেশে ধর্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল :—

রমা দৃষ্টিপাতে সর্বলোকে সুখে বসে ।
ব্যর্থকাল যায় মজ্জা ব্যবহার রসে ।
কৃষ্ণনাম ভক্তি পুনা সকল সংসারি ।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥
ধর্ম কথ্য লোক সঙ্গে নাম মাত্র জানে ।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে আগরণে ॥
দণ্ড করি বিসংগি পুজে কোন্ জন ।
পুণ্ডরী করয়ে কেহ দিয়া বহু পন ॥
ধন নষ্ট করে কত পুত্রের বিবাহ ।
এই মত জনতের পাবকাল যায় ॥
যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব ।

* * * *

না বাখানে যুগ ধর্ম কঙ্কর কীর্তন ।
দোষ বাহি গুণ কারো না করে কখন ॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী ।
তা সবার সুখেই নাহক বরিধান ॥
অভিষেক মুখি সে স্নানের সময় ।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক নাম উচ্চারণ ॥
সীতা ভাগবত যে জন জানে বা পড়ায় ।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার বিহ্বায় ॥

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ নাম ।

নিরবধি বিজ্ঞানকূলে করিল ব্যাখ্যান ॥

প্রগৌরান্দেবের অবতার লইবার কারণ পাশ্চ ললস ও ভক্তি প্রচার :—

“পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ।

পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিষু প্রচার ॥” চৈঃ চঃ মৃঃ ।

পাষণ্ডী শব্দ বৌদ্ধ ও অনাচারীদের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে বৌদ্ধ
দিগের অবনতিকালে অশিক্ষিত ভিক্ষুক পুরোহিতগণ বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও উপদেশ
বিস্মরণ হইরা ধর্মের অপলাপ করিতে থাকেন :—

“The faith had grown corrupt in the hands of illiterate
priests. By the majority of the clergy and laity the ethics
of Buddha's teaching had been forgotten. The simple story
of his life had been so surrounded by legends and
miraculous tales, that its significance was *obscured*. The
divine honours paid to his relics, and the mysterious powers
attributed to them and to his image were idolatrous
practises utterly at variance with the true doctrine. In
short, to all but a few the spirit of the faith was dead,
and Buddhism, like Vedic Hinduism before it, had become
a mere husk of religion.”

DE LA FOSSE'S HISTORY OF INDIA.

ধর্মের গ্রান্থি ও অর্থের প্রাহৃত্য হইলে, সাধুদিগের পরিত্রাণের অস্ত
এবং হৃদয় ব্যক্তিগণের বিনাসের অস্ত এবং ধর্ম সংস্থাপনের অস্ত ভগবান যুগে
যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন :—

বদ্য বদ্য হি ধর্মস্য গ্রান্ধিবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং স্বজায়াৎম ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃদয়াম্ ।

ধর্ম সংস্থাপনাধায় সজ্জবামি যুগে যুগে ॥ গীতা ।

যত ধৰ্ম্ম বিপ্লবে হিন্দুধৰ্ম্মের মধ্যে আতি বিচ্যুত বর্ণবিচ্যুত ও ধৰ্ম্ম বিচ্যুত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল এমন কি লোক মধ্যে পরলোক ও ঈশ্বরের বিবাসও কম হইয়া পড়ে, প্রকৃত হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া বৌদ্ধ ও বনশ্ৰমণ ভাবাপন্ন হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এ ক্ষেত্রে নৈদিক যুগের ক্রিয়া কলাপাদি সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব ছিল তৎকালে শ্ৰীশ্ৰীগৌর-ভগবান অবতীর্ণ হইয়া তত্ত্ব-তত্ত্ব প্রচার করিলেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

পূৰ্বে আজ্ঞা বেদধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম যোগ জ্ঞান ।

সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্ ॥

এই আজ্ঞা বলে তত্ত্বের প্রজ্ঞা যদি হয় ।

সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥ চৈঃ চৈঃ যুঃ ।

এই বিশাল অগত কৰ্ম্মক্ষেত্র হইলেও এবং বেদোক্ত বহুবিধ কৰ্ম্ম কাণ্ডই প্রকৃত কৰ্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইলেও সে সময় লোক সমূহ কৰ্ম্মহীন হইয়া ঈশ্বরে তত্ত্ব ও বিশ্বাস হারা হইয়া ফেলিয়াছিল, এবং শ্ৰীভগবানের অমৃত বাণী :—

“সৰ্ব্বধৰ্ম্ম নু পরিত্যজ্য মায়েকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সৰ্ব্বপাপেভ্যো যাক্ষ্যম্যামি মা ভয়ঃ ॥” গীতা ১৮/৬৬ ।

বিশ্বরণ হইয়া বহু ধৰ্ম্মের ও উপধৰ্ম্মের সেবা পরায়ণ হইয়াছিল। তৃত্য যখন প্রভুর অস্ত কক্ষকরে সেইরূপ তৃত্য মনুষ্যানগিকে ভগবানের প্রীত্যার্থে কৰ্ম্ম করা উচিত, কিন্তু সে সময় তত্ত্ব ও বিশ্বাস হীন ব্যক্তিরা হৃদয়ে এতাব কি প্রকার উদয় হইতে পারে তৎকালে ভগবান সৰ্ব্বকৰ্ম্ম (অর্থাৎ কৰ্ম্মফল) ত্যাগের অমুমতি দিয়া প্রজ্ঞা ও তত্ত্বের দ্বারা কৃষ্ণ ভজনের উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রজ্ঞা সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

“আদৌ প্রজ্ঞা তত্ত্বঃ সাধু সঙ্গোহথ ভজন ক্রিয়া ।

অর্থাৎ প্রথমে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলে সাধুসঙ্গের সহজ বলবতী হইয়া থাকে।

প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস :—

“‘প্রজ্ঞা’ শব্দে বিশ্বাস কহে দৃঢ় নিশ্চয় ।

‘কৃষ্ণ তত্ত্ব কৈলে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম ত্যক্ত হয় ॥’ চৈঃ চৈঃ যুঃ ।

শ্রীশঙ্করের আবির্ভাবে হিন্দুধৰ্ম্ম পুনঃস্থাপিত হইলেও তাঁহার শিক্ষার পরমমাত্রাধীনে প্রেমময় সক্তিদানন্দ শ্ৰীভগবানের বিশাল মূর্তি মনুষ্য হৃদয়ে

অঙ্কিত হইতে পারে নাই । ঐগৌরানন্দেব এই ত্রিভঙ্গ হারিনী মূর্তি সাধারণকে দেখাইবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল প্রভৃতি সকলকে ভক্তি সাধনের অধিকারী করিলেন । ভক্তি শব্দের অর্থ :—

“সাঁ পরামুরক্তিরাগয়ে ।” শাণ্ডিল্য ।

অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক আগক্তিই ভক্তি নামে অভিহিত । যদি ঐতিগবান নবগ্রীণে অবতীর্ণ না হইতেন তাহা হইলে আজ হরত হিন্দুধর্ম্ম পত্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁরতে প্রভূত হিন্দুর সংখ্যা কম হইয়া পড়িত । এবং নাস্তিকতার এবল বস্তায় সমস্ত দেশ প্রাবিত হইত । ঐগৌরানন্দেব কেবল ৪৮ বৎসর মর্ত্ত্বধামে অবস্থান করেন । তন্মধ্যে ২৪ বৎসর গৃহস্থাজ্ঞমে, ১৮ বৎসর নীলাচলে, এবং ৬ বৎসর গমনাগমনে অতিবাহিত করেন । তাহার প্রভাবে বৈকব ধর্ম্ম বিস্তার, কৃষ্ণ প্রেম প্রচার এবং বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার হইরাছিল :—

‘আ-গিস্কুনদী-তীর আর হিমাগর ।
রুদ্দাবন মধুরা’দ যত তীর্থ রয় ॥
দুই লাখায় প্রেমফলে সকল ভাগিল ।
প্রেমফলা বাদে লোক উন্নত হইল ॥
পশ্চিমের লোক সব মুড় অনাচার ।
তাঁরা প্রচারিল দৌহে ভক্তি সদাচার ॥
শাক্ত দৃষ্টে কে । পুত্র তীর্থের উদ্ধার ।
রুদ্দাবনে কৈল ঐমুত্তি সেবার প্রচার ॥

যমুনার তটিন তটে মধুরা বা মধুপুরী অবস্থিত । ইহা অধিমুক্ত ধাম :—

“অযোধ্যা মধুরা মারা কানী কাকী অবস্থিকা ।
পুরী হারাবতী চেব লটুস্তা সিদ্ধি ব্যরিকা ॥”

বাগ্মিকের রামায়ণে উক্ত হইরাছে যে দেবানন্দেব মহাদেব মধুনৈভ্যের উপর আসন্ন হইয়া তাঁহাকে এক অজের শূলত্র প্রদান করেন । মধুনৈভ্য মহাদেবের বরে অজের হইয়া এই পুরীতে বাস করিতে থাকেন । এবং সময়ে উহা মধুপুরী বা মধুরা নামে প্রসিদ্ধ হয় । শক্রর, মধুর পুত্র লবণাহরকে বধ করিয়া মধুরা এবং তৎ সন্নিহিত স্থান সমুদ্রে আর্ঘ্য নিবাস স্থাপন করেন ।

এবং মধুসূদন লক্ষ্মী দেবীঃ শ্রীমদ্ভক্তম্ ।

তবং স্তবং লোহনুর শ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস হৃদয়ম্ ।

উত্তর কাণ্ড ৭৪।১৫

প্রভুবাচ মহাবাহুঃ শক্রঃ প্রবতাক্ষবান্ ।

ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুরা দেব নিমিত্তা ।

নিবেশঃ প্রাপ্তরাজ্যীভবমেব মেহন্ত বরঃ পরঃ ।

তং দেবাঃ শ্রীত মল্লো বাচসিত্যেব রাঘবম্ ।

তবিষ্যতি পুরী রম্যা শুরসেনা ন সংশয়ঃ ।

তে তথোক্তা মহাত্মানো দিবসংকং বহুতপঃ ।

উত্তর কাণ্ড ৮৩ অঃ ।

আর্য্য শুরসেন জাতি প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করার মধুপুরীর নাম শুরসেনা হয় কিন্তু মহাভাবতের সময় হইতে 'মধুরা' 'মথুরা' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন মথুরা শ্রীলঙ্কা ও উৎসাদিত হইয়া 'মথুরেন' পরিণত হয় কিন্তু রুকতক্ত শুরসেনাখ্য যাকবগণের সময় ঐ শৈব প্রধান স্থান বিহু তক্তিতে প্রাবিত হয়। সম্রাট অশোকের সময়ে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ লাভ করে এবং বাকরাজ বৌদ্ধ কালকের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবে মথুরার অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় হীনবল হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে বিখ্যাত পারত্রাজক ফা হিয়ান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তৎকালে ব্রজ মণ্ডলে ২০টা সম্মা রাম ও তিন সহস্র বৌদ্ধ ছিল।

সে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রজ মণ্ডলে বৌদ্ধ প্রভাব অক্ষয় ছিল। ৭ম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী হএন সাং-সাত বছর বৌদ্ধ প্রাধান্য উল্লেখ করিয়াছেন। ৮ম শতাব্দীতে কাণ্যকৃষ্ণাধিপতি বলাবদ্বার দ্বারা তথাকার বৌদ্ধ প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং সে সময় প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু সরলভিত্তিকের সাহায্যে ব্রজধাম পুনরায় স্বর্গধামে পরিণত হয় কিন্তু এ অবস্থা বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। তুর্ভাগ্য ক্রমে অর্থ পিণ্ডিত লুন্ড হুলতান মগধের রাজনী ১০১৭ খ্রীঃ অব্দে আক্রমণ করেন এবং প্রায় তুর্ভাগ্য বারং মন্দির এবং দেবদুর্গি ধ্বংস আরি সংযোগে গৃহ পল্লী লুণ্ঠ করণ, নরহত্যা এবং লুণ্ঠন কার্য্য চলিতে থাকে। তদন্তর ১৫০০ খ্রীঃ হুলতান সিকেন্দার লোদী মথুরাকে তদন্তর ও তদন্তর স্থাপিত

পরিণত করেন । মথুরা আবার মথুবনে পরিণত হইল । ব্রজবাসীগণ সর্বদাই
বন তরে শব্দিত থাকিত । ঐগৌরাজনবের সময়ে দেশ মধ্যে শান্তি স্থাপন
হইলেও ব্রজবাসীগণের হৃদয় হঠাৎ স্নেহ ভর্য বিদূরিত হয় নাই,—

অকুট নাথ-গ্রামে গোপালের হিতি ।
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ॥
একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল ।
তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুকধারী সাজিল ॥
আজি রাতে পলাই গ্রামে না রহ একজন ।
ঠাকুব লইয়া ভাগ্ আসিবেন কাল যখন ॥
তুমিরা গ্রামের লোক চিহ্নিত হইল ।
একমে গোপাল লঞা গাঁঠুগি গ্রামে ধুইল ॥
বিশ্র গৃহে গোপালের নিভৃত সেবন ।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্বজন ॥
ঐছে স্নেহ ভবে গোপাল ভাগে বাবেবারে ।
মন্দির ছাড়ি কুলে রহে কিবা গ্রামান্তরে ॥

* * * *

স্নেহ ভয়ে আইল গোপাল মথুরা নগরে ।
একমাস রহিল বিটর্ঠলেখর ঘরে ॥”

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ।

মুগতান মহাপ্রভুর অত্যাচারে বহু হিন্দু তীর্থ নষ্ট হইয়া যান উহার মধ্যে
সোমনাথ ও মথুরা প্রধান । সোমনাথ লুপ্তন সম্বন্ধে ইতিহাস পাঠকগণ সমস্ত
অবগত আছেন । এবং মহাপ্রভু স্বচক্ষে ভগ্ন চিহ্ন সকল দেখিয়া বিশেষ
পরিতাপ করিয়াছিলেন :—

প্রভাতে উঠিয়া মোরা সোমনাথে বাই ।
ছয় দিন পরে গিয়া সেখানে পৌছাই ॥
নাহিক পূর্বের শোভা নাহি সে মন্দির ।
হঃখের অবস্থা দেখি চক্ষে বহে নীর ॥

চিবি চাবা ভাঙ্গা চিহ্ন আছে সেইখানে।

দেখিয়া আখাত বড় লাগিল পরানে।

মন্দির বাড়ীর শোভা গিবাছে চলিয়া।

ইহা দেখি এতু মোর আহুল কাঁদিয়া।

কান্দিয়া আমার এতু বলিতে লাগিল।

দ্রুতস্বা যখন আসি কি দশা করিল।

কোথা লুকাইলে এতো স্বপনের ভবে।

একবার দেখা দিয়া জুড়াই হৃদয়ে।

হায় শায় ইহ দুঃখ করেন না যায়।

সোমনাথে উদ্দেশিয়া কান্দে গোরারায়।

গোবিন্দ দাসের কীর্তা।

মথুরা দিল্লীর নিকটবর্তী হওয়াতে প্রায়ই মুসলমান অভ্যুত্থানের অধীন হইত ওখাপি এখানে বৈষ্ণব সভাব কখনও নিশ্চত হয় নাই। মহম্মদের লুণ্ঠনের পর মথুরা আবার প্রধান বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেল্লাবহ গ্রাম নিবাসী গীত গোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব গোখামী বৃন্দাবন দর্শনে আগমন করেন। ১৫০২ হইতে ১৫১৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে পুন্নি বহু, দক্ষিণাপণ প্রভৃতি ভ্রমণ করিতে করিতে খ্রীষ্টোবাসিন্দেব ভ্রমণে গুলে আগমন করিয়া মথুরা পুন্নিতে মহা তীর্থে পরিণত করেন। তাঁহার আগমনে মধু পুরীর লোক সমূহ, বৃক লতা, স্বাবন ভ্রমণ কীট পতঙ্গ, পত পক্ষী আনন্দে বিভোর হইয়াছিল :—

তবে সেই বিপ্র এতুকে ভিক্ষা কবাইল।

মধু পুরীর লোক এতুকে দেখিতে আইল।

লক্ষ সখ্য লোক আঁসে নাটক গণন।

বাহির হইয়া এতু দিল দরশন।

বাহু তুলি বোলে এতু। বোল হরি হরি।

প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্যানি করি।

বমুনীর চক্ৰিশ ঘাটে এতু কৈল নাম।

সেই বিপ্র এতুকে দেখায় তীর্থ স্থান।

ধরতু, বিপ্রাধি, দীর্ঘ বিহু, তুণ্ডবর ।
 মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিল সকল ॥
 বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল ।
 সেইত ব্রাহ্মণ নিজ সঙ্গে করি লৈল ॥
 মধুবন ভাল-কুমুদ-বহলা-বন গেলা ।
 তাঁহা তাঁহা মান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥
 পথে গাবীষটা চরে—প্রভুকে দেখিয়া ।
 প্রভুকে যেচর আসি ছন্দার করিয়া ॥
 গাবী দেখি শুদ্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ।
 বাৎসল্যে গাবী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে ॥
 অহু হঞা প্রভু করে অঙ্গ কণ্ঠস্থন ।
 প্রভু সঙ্গে চল,—নাহি ছাড়ে খেয়গণ ॥
 কষ্টে-স্বষ্টে খেয় সব রাখিল গোয়াল ।
 প্রভু কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মুগী পাল ॥
 মুগ-মুগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে ।
 জয় সাহি করে সঙ্গে যায় বাটে বাটে ॥
 (অঙ্গের সোরভে মুগ-মুগী শব্দ উঠে ।
 কৃপা করি প্রভু হস্ত দিলা তার পিঠে ॥)
 পিক ভঙ্গ প্রভুকে দেখি পকম গায় ।
 শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যায় ॥
 প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ ।
 অঙ্গুর প্লক, মধু অঙ্গ বরিষণ ॥
 ফুল ফল তারি ডাল পড়ে প্রভু পায় ।
 বহু দেখি বহু যেন ভেট লঞা যায় ॥
 প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থান-অঙ্গম ।
 আনন্দিত-বহু যেন দেখে বজ্রগণ ॥
 তা-সভার প্রীতি দেখি প্রভু স্তাবাবেশে ।
 সভাসনে জৌড়া করে হঞা তার বশে ॥

এতি বৃক্ষ লতা এতু করে আলিঙ্গন ।
 গুপ্তাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
 অক্ষ কল্প পুঙ্ক প্রেমে শরীর অস্থিরে ।
 “কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল” বোলে উচ্চস্বরে ॥
 স্বাধর-জন্ম মিলি করে কৃষ্ণধনি ।
 প্রভুর গভীর স্বরে বেন প্রতিধ্বনি ॥

চৈঃ চঃ মৃঃ মধ্যলীলা ।

এই প্রেমের অবতার সাংক্য ভগবানকে দর্শন করিয়া ব্রজবাসীগণ উন্মত্ত
 হইয়া মধুর হরিনামে ব্রজ মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন । ব্রজধাম স্বীয়
 প্রভাব চিন্তায় তিনি শ্রীকৃষ্ণ গোপামীকে দীক্ষা প্রদান করিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ
 করেন । তদন্তর তিনি অগ্রণে (আগ্রা) ও কাশী ধামে যাত্রা করেন, এবং
 কাশী হইতে সনাতন গোপামীকে মথুরা প্রেরণ করেন :—

লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির ।
 বল ভক্ত কেন তাঁরে মথুরা-বাহির ।
 গজাতীর পথে লৈয়া অগ্রণে আটলি ।
 শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া প্রভুকে তাঁহাই মিলিল ॥
 দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িল ।
 পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥
 শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা করি পাঠাইলা বৃন্দাবন ।
 আপনে করিলা বারানসী জাগমন ॥
 কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিলা সনাতন ।
 দুইয়াস রহি তাঁর করাইল শিক্ষণ ॥
 মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া তত্ত্ব বল ।
 সন্ন্যাসীয়ে কৃপা করি গেল লীলাচল ॥

চৈঃ চঃ মৃঃ মধ্যলীলা ।

শ্রীকৃষ্ণ বাহুল্য চন্দ্রদীপ কঙ্করা বাদের অধিবাসী মুহুর্তের মধ্যম পূত্র
 সনাতন শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ এবং বদন্ত কনিষ্ঠ মহোদর ছিলেন । ১৪৮৮ খ

সনাতনের ও ১৪৮১ খ্রীস্টাব্দের অগ্নি হইল। ঐরূপ ও সনাতন গোড়াধিপ
হলেম সাহেব রাজ সরকারে উক্ত বন্দহ কর্মচারী ছিলেন :—

ঐরূপ সনাতন হই সনাতন।

উজীর আছিল দোহে গোড়িয়া পাংলায়।

দবীর খাল নাম আর সাকর মলিক।

বেতাব দোহার সর্কখেভাবে অধিক।

তত্ত্বমাল

ঐরূপ অমলিনহ রাজকাযে নিযুক্ত ছিলেন। বৈরাগ্যের উদয়ে তিনি
সংসার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তীর্থ পন্থাটানে বহির্গত হন এবং মহাপ্রভুর নিকট
দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রজ মণ্ডলে গমন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও লুপ্ত তীর্থ
উদ্ধার করেন। তিনি গোবিন্দপুত্রের বিগ্রহ ও বৃন্দাশ্রমীর মন্দির উদ্ধার
করেন। ভক্তি রত্নাকরে উল্লেখ আছে,—

লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র শ্রমাণেতে।

ঐরূপ গোস্বামীর এক চিন্তা হৈল চিতে।

ঐরূপ অগ্নি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য মিঞা তানাসনের দীক্ষা গুরু ছিলেন।
সত্রাট আকবর প্রায়ই ঐরূপ গোস্বামীর ঐচ্ছিক দর্শন করিবার জন্য বৃন্দাবন
গমন করিতেন এবং তাঁহার উপদেশের সারাংশ লইয়া “তোহেদে এসেছি” নামক
এক নুতন ধর্ম প্রবর্তন করেন। ঐরূপের পর সনাতন রাজকায ত্যাগ করিয়া
বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। তত্ত্বমালা উক্ত হইয়াছে :—

প্রথমে ঐরূপ গেল বিবর ছাড়িয়া।

বৃন্দাবনে গেল সঙ্গী বৃন্দাবনে গিয়া।

ঐল সনাতন সঙ্গী উৎকলিত মন।

বৈরাগ্যের পথে নিজ রাখিয়া নয়ন।

রাজ কর্মে নাহি জ্ঞান বিরলেতে বলি।

শাস্ত্র অণুশীলন করেন দিবানিশি।

পাত্ৰ সা ডাকিবানে লোক পাঠাইলে কহে।

কহ গিয়া তার কিছু পীড়া হয় দেহে ॥

পাড়া তলি পুন রাজা বৈদ্য পাঠাইলা।
 বৈদ্য আসি পরশিয়া মুহু দেখি গেলাঃ
 মুহু গুনিঞা রাজা উবিধ হইয়া।
 আপনি আইলা সনাতনের চাহিয়া।
 আন্তে ব্যস্তে সনাতন সন্মান করিয়া।
 বসাইল উপযুক্ত আসন অর্পিয়া।
 রাজা কবে তোমার মনের কথা কিবা।
 কার্যে নাহি যাহ ছুমি বুঝি কি করিবা।
 এক ভাই তোমার কর্কর হৈরা গেলা।
 ছুমিহ তাহাই বুঝি করিবে ভাবিয়া।
 তবে সনাতন কহে অন্তরের মর্ম।
 আমা চইতে আর নাহি চলিবেক কর্ম।
 তবু বুঝি সনাতনে রাখে কারাগারে।
 কবেদ রাখিল। কিন্তু বিবাদ অন্তরে।
 দৈবাত চলিলা রাজা দক্ষিণ দেশেতে।
 কোল প্রতিযোগি সনে বিবাহ করিতে।
 হেথা বশিষ্ঠানার যে প্রধান ষবন।
 তাহারে মিনতি করি কহে সনাতন।
 আমি তব আজন্ম যে উপকার কৈলু।
 তার অতুগকার মোর কিছু কর অলু।
 মোরে বশিষ্ঠান। হেতে যুগি ছাড়ি দেহ।
 গোসাঞি ততাবে তব বাগদাদী সহ।
 আর পাঁচ হাজার যে মুদ্রা আগে লহ।
 ধর্ম অর্থ লাভ হবে বল্যপি করহ।
 জমানার কহরে যে আজ্ঞা কর পারি।
 কিন্তু যে তত্বর হৈলে আগে পাছে মতি।
 তেঁহ কহে তরু কি বৃক্ষতি আছে ভাল।
 রাজারে কহিবে তেঁহ বলে প্রবেশিল।

গলাতে লইয়া গেছু মলি করাইতে ।
 কাঁপ দিরা কুবিরা মরিল বিবেকেতে ।
 এ দেশে না রব মুঞি হৈরা দরবেশ ।
 দেশান্তরে বাব রাণা না পাবে উদ্দেশ ।
 তখাচ যখন-মন এসম্ম নহিল ।
 তবে আর কিছু মনে যুক্তি করিল ।
 লাভ হাজার মুদ্রা আমি যখনের আগে ।
 ধরিলা যখন সেই মুদ্রা অমুরাগে ।
 খালাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিলা ।
 ঈশান নামেতে ভূতা লহিত চলিলা ।

সনাতন ঈশ্বরের ন্যায় বৈকুণ্ঠ ধর্ম্ম প্রচার ও লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের তার প্রাপ্ত
 হইরাছিলেন :—

পূর্বে প্রমাণে আমি রমের বিচারে ।
 তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে ।
 তুমিহ করিহ ভক্তি রমের বিচার । (প্রচার)
 মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ।
 বুদ্ধাবনে কৃষ্ণ সেবা বৈকুণ্ঠ আচার ।
 ভক্তি-স্মৃতি শাস্ত করি করিহ প্রচার ।

চৈঃ চঃ যুঃ মধ্যলীলা

সনাতন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বহু লুপ্ত তীর্থ ও বিগ্রহ আবিষ্কার
 করিয়াছিলেন :—

মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে ।
 প্রতিরুদ্ধে প্রতিরুদ্ধে রহে রাজি দিনে ।
 “মথুরা মাহাত্ম্য” শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ।
 লুপ্ত তীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া ।

চৈঃ চঃ যুঃ মধ্যলীলা

সনাতন মদন মোহনের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইরাছিলেন এবং মূলতান দেশীয়
 বলিক কৃষ্ণদাস দ্বারা এই বিগ্রহের মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন । ঐশ্বর্য্যাল-

চ্যোটে ও আখাট, ১৩২৪।] ভারতে ধর্ম-বিপ্লব ও শ্রীগৌরাজ। ২৫৫

দেব প্রেরিত রূপ, সনাতন, ও লোকনাথ-গোষ্ঠীসমীকৃত মণ্ডলে প্রায় সমস্ত লুপ্ত ভীর্ণ ও বিগ্রহ আধিকার করেন। ব্রজ মণ্ডলে যে সকল বন আছে তন্মধ্যে ১২টী বন প্রধান :—

প্রধানঃ বাদশারজঃ মাহাশ্ম্যঃ কবিভঃ ক্রমাৎ ।

তত্র ঐলোহ ভাণ্ডীর মহাতাল বদীরকাঃ ॥

বকুলঃ কুমুদঃ কাম্যঃ মধু বৃন্দাবনঃ তথা ।

বাদশৈতা বন সংখ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ॥

(পদ্ম পুঃ পাতাল ৩৮।)

এ সকল বন সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত হইয়াছে :—

বনং কুশুমিতং ঐশ্বর্যদচিত্র মৃগাঘিগম্ ।

গায়ত্রয়ুর ভ্রমরং কুজং কোকিল শাবকম্ ॥

অধুনা এসব বন প্রকৃত পক্ষেই মহারণ্যে পরিণত এবং পুরান বর্ণিত কাব্য রাজ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্বে বহু বন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ে ৩৩৩টী বন উদ্ধার করিয়া উহাদের স্থান নির্ণয় করা হইয়াছে। ব্রজ মণ্ডলে বোজ, জৈন, শৌর, শাক্ত, শৈব প্রভাবের পরও মুসলমান অত্যাচারে বহু হিন্দু কীর্তি লোপ পায় কিন্তু গ্রাউস সাহেবের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীগৌরাজ দেবের প্রভাবে ব্রজ মণ্ডল আবার ঐযুক্ত হইয়াছে।

"The first named community (Bengali or Gauriya Vaishnavas) has had a more marked influence on Brindaban than any of the others, since it was Chaitanya, the founder of the Sect, whose immediate disciples were its first temple builders." Page 183, Mathura a district Memoir by F. S. Growse, B. C. S. 1880."

মহাপ্রভু বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠ পোষক হইলেও তিনি সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি উদ্ভৃতা ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। নাম সাধনই তাঁহার উপদেশের মূল সত্র। তিনি—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব পতিব্রন্যথা ॥

উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল নামায়ত্ত বিতরণ করিয়া অগতঃ মুক্ত করিয়াছিলেন। এই নাম প্রভাবে বহু শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, বনল প্রভৃতি তাঁহার পদানত হইয়াছিল এমন কি দম্ভা, তন্ত্র, লম্পট, কপটও ছিল। দাক্ষিণাত্য তিনি যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে বহু সঙ্কটের মধ্য দিয়া বাহিতে হইয়াছিল। এক পাণ্ডুল নামক দস্যুপতিকে আর স্থলে এক চোনন্দী বনে গিয়া নারোজীকে মধুর হরিনামে উন্মত্ত করেন :—

পাপ কর্ম ছাড়ি পাম প্রভুর কুপার ।

হরিনাম করি সদা নাচিয়া বেচায় ॥

লইতে হরির নাম অঙ্গ পড়ে আসি ।

আনন্দে মাতিল সেই নবীন সন্ন্যাসী ॥

যত দম্ভা ছিল বনে সকলে মিলিয়া ।

হরি হরি ধ্বনি করে কুকর্ম ছাড়িয়া ॥

লবে মিলি সেই বনে আনন্দে মাতিল

এতু লাগি পাপ কর্ম সকলে ছাড়িল ॥

পাণ্ডুলে এইকপে পবিত্র করিয়া ।

চলে মোর ধর্ম বীর আনন্দে ভাসিয়া ॥

* * *

নারোজী কহিল সব তীর্থে দেখাংব ।

তীর্থে তীর্থে আপনার পেছনে বাইব ॥

এতদিন চলু অঙ্গ ছিল ভ্রান্তি গুমে ।

আজি চৈতে অঙ্গ ফেলিলাম ভূমে ॥

এই হন্তে কত নরহত্যা কবিয়াছি ।

এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি ॥

আর না রহিব মুই ডাকাতের পতি ।

কি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি ॥

জঙ্গলের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া ।

পাপে দেহ অর জর না দেখি আনিয়া ॥

(ভক্তি, পঞ্চদশবর্ষ, ১২শ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩২৪।

“বর্ষশেষে বক্তব্য।”

“ভাবুক কবি গাহিয়াছেন;—“দিন বাবে, রবেনা।

মুখে হুঃখে বাবে দিন, রবে মাত্র ঘোষণা।”

সময় হু হু করিয়া চলিয়া বাইতেছে, ব্যক্তিদের কাকূতি মিনতি, ধনীর প্রকৃত অর্থব্যয়, ভীম-পরাক্রমশালীর আন্দোলন এ সব কিছুতেই সময়কে ধরিয়া রাখা যায় না, কেহ তাহাকে দেখুক আর নাই দেখুক, কেহ তাহার সং ব্যবহার করুক আর নাই করুক, সে যে একটানা শ্রোতে চলিয়াছে তাহার আর বিরাম নাই। যাঁর হৃদয়ে সময় এমনি করিয়া চলিয়াছে তাঁঁর হৃদয়ে, তাঁঁর অপরিসীম করুণাবলেই তাঁঁর ঐশ্বর্যপ্রতিভা “ভক্তি” আজ নানারূপ বাধা নিষত্তির মধ্য দিয়া আর একটা বর্ষ পূর্ণ করিয়া ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন।

এখন আর “ভক্তি” নাবাগিকা নয়, পূর্ণ বয়স্ক। যদিও সেক্ষণ হাবতাব, সেক্ষণ বেশ পরিপাটী সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না, তথাপি তজ্জন্য সর্বদাই তিনি হুঃখিত। এবং তাহার সেবকবৃন্দকে সর্বদাই তজ্জন্য উৎপীড়ন করিতেছেন। আর তাহা হওয়াও উচিত।

কিন্তু করিলে হইবে কি, তাঁর সেবকবৃন্দ যে চিরকাল। ঐশ্বর্যদেবের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম “ভক্তি সর্ব-সম্পদ-দায়িনী।” এ সর্ব-সম্পদ অর্থে অন্যে বাহাই বুঝুন, বাহাই বলুন, আমি কিন্তু বুঝি সর্ব-সম্পদার্থের ঐশ্বর্যীন্দ্রী সেবিত, ব্রহ্মাদি দেব বাহিত সেই ধর্ম বজ্রাচ্ছন্ন চিহ্ন যুক্ত ঐক্য চরণ দু’খানি। ভক্তি-দেবীর সেবা করিয়া যদি এই সম্পদ পাওয়া যায় তবে আর অন্য সম্পদ বাহা করে কে?

আর এক কথা;—নিজে তজ্জন সাধন করিয়া উন্নত হইব সে আশাতো লাই-ই, তবে পাঁচজনের প্রাণের ভাব লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া যদি কিছু হয় সেই তরসায় অভিশয় অযোগ্য বীনাতিতীন হইয়াও হৃদয় প্রাণে ভক্তি দেবীর চরণ

প্রান্তে পড়িয়া আছি। পাঁচজনে ভালবাসিয়া, পাঁচজনে দয়া করিয়া যাহা দেন তাহা লইয়া যদি অবিরত তোলা পাড়া করা যায় নিশ্চয়ই কিছু হইবে এই ভরসাও যে প্রাণে নাই তাহা নহে। তবে মধ্য মধ্যে ভক্তির যথার্থ উপযুক্ত সেবকগণকে কৃপাদানে কৃপণ দেখিয়া প্রাণে বড় আঘাত পাই, তাই মধ্যে মধ্যে হতাশ হইয়া পড়ি।

ঘাউক, যাহা হইবার হইবে, এখন হু'টো কথা যা বলিবার জন্য উপস্থিত তাই বলিয়া আপনাদিগকে অবসর দিতে পারিলেই যথেষ্ট। দৈন্য করিয়া বা লোকের মনরক্ষার জন্য বণা নয়, প্রকৃত পক্ষেই আমরা দীন—কাজল। তার উপর আবার বর্তমান বঙ্গের যুদ্ধ বিভাটে কাগজ ও মুদ্রণ সরঞ্জামাদির হ্রাসল্যতার জন্য, ইচ্ছা থাকিলেও মনের মতন করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতে পারি নাই, তজ্জন্য অন্যান্য অনেক কাগজের ন্যায় একেবারে তুলিয়া না দিয়া তবুও যে চিহ্ন মাত্রও প্রকট রাখিতে পারি নাই ইহাই শ্রীভগবানের অপরি-সীম দয়া এবং ভক্ত গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টি। আশা করি একপ কৃপা বিতরণ করিতে ভক্ত গ্রাহকগণ কখনই ব্যস্ত হইবেন না। তারপর ১৫শ বর্ষ হইতে ভক্তির মূল্য বৃদ্ধির কথা।

আমরা দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিলাম যে, ভক্তি যতদিন চলিবে মূল্য বৃদ্ধি করিব না, কিন্তু যখন দেখিলাম কাগজের মূল্য তিন গুণেরও বেশী হইল, যে কাগজের দর পূর্বে ২৫০ আনা ছিল তাহা যখন ৮৭ টাকা ৮০ টাকা পর্যন্ত উঠিল তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। কয়েক জন ভক্তির গ্রাহককে জিজ্ঞাসাও করিলাম যে, “আরতো পারিনা সুতরাং এবারে ভক্তি বন্ধ কবিয়া দিব কি না?” তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন—“কখনই না, আপনি ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি করুন তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু ভক্তি বন্ধ করিতে পারিবেন না।” এইরূপ উৎসাহ পূর্ণ বাক্যে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া আমরা ১ এক টাকা স্থলে ১১০ দেড় টাকা বাৎসরিক মূল্য ধার্য করিয়াছি। এমন কি অনেক সহস্রদয় গ্রাহকবৃন্দ আপনাপন বন্ধুগণের মধ্যে বণ্টিত মূল্য ১১০ দেড় টাকাকে গ্রাহক সংগ্রহও করিয়া দিয়াছেন এবং দিতেছেন।

অবশ্য অন্য সময় হইলে এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি বোধ হয় হইত না। আর যদিও হইত তবে অন্ততঃ আর ২ ফস্ফা ভক্তির আকার বৃদ্ধি করিয়া লইতে

পারিতোষ, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ বিভ্রাট ষতদিন না মিটিয়া যায়, ষত দিন না আবার পূর্বের ন্যায্য মূল্যে কাগজ ও অন্যান্য মুদ্রণ সরঞ্জামাদি পাওয়া যায় ততদিন ইচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া আমরা ভক্তির কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারিতেছিলাম। তবে যখনই সুবিধা হইবে তখন হইতেই যে আমরা আকার বাড়াইয়া “ভক্তি” প্রকাশ করিতে পারিব এ আশা যথেষ্ট আছে।

পূর্বে যে ধরতে একমাসের কাগজ ছাপা হইত এক্ষণে কোন কোন মাস তাহার তিনগুণ ধরত দিয়াও ছাপিতে হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সকল সুধী ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে, আমরা কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গ্রাহকগণকে কাগজ দিয়া থাকি।

যদিও এ বৎসর ভক্তির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি আশা করি আমাদের অবস্থা বুঝিয়া ধর্মপ্রাণ ভক্তির পাঠকগণ ভক্তিকে রক্ষা করিতে কখনই কুন্তিও হইবেন না। আশা করি সকলেই আপনাপন দেয় আগামী ১৬শ বর্ষের সাহায্য অগ্রীম পাঠাইয়া আমাদের চিরবাবিত করিবেন। আর যদি কাহারও টাকা পাঠাইতে অসুবিধা বোধ হয় তবে আমাদের কাছে জানাইলে আমরা যথাক্রমে স্বাধীনভাবে ভিঃ পিতে পারকা পাঠাইতে পারি। যদি আপত্তি থাকে তিনি ১০ই ভাদ্রের মধ্যে আমাদের কাছে জানাইবেন নতুবা শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া অনর্থক এই ছুঃখের সময় আর ক্ষতি গ্রস্ত করিবেন না। আমরা ১০ই ভাদ্র পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যদি টাকা বা নিষেধ হুচক কোন পত্রাদি না পাই তাহা হইলে বুঝিব কোন আপত্তি নাই এবং ১১ই হইতে ভিঃ পি করিতে আরম্ভ করিব গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

সর্বশেষে গ্রাহকগণের নিকট আমাদের সান্নিধ্য নিবেদন তাঁহার। যেরূপ ভাবে এতদিন ভক্তিকে ভালবাসিয়া আসিতেছেন, যেমন ভাবে সাহায্য করিতেছেন আগামী বর্ষেও যেন তাঁহাদের ভালবাসা হইতে ভক্তি বৃদ্ধি না হয়। বর্ষশেষে সন্তোষ গ্রাহকগণের নিকট আমাদের ইচ্ছাই বক্তব্য। অলম্বিত।

বিনোদ—বৈক্য দাসমুদ্রাস

ভক্তি-কার্য্যাক্ষক।

ভারতে ধর্মবিপ্লব ও শ্রীগৌরান্দ্র ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সবকার ।)

(পূর্বানুষ্ঠিত)

—:—

এত বলি দক্ষ্য পতি সব ত্যাগিয়া ।

চলিল প্রভুর সঙ্গে কোণীন পরিয়া ॥

(গোবিন্দ দাসের করচা ।)

চওপুরছাড়িয়া প্রভু বধন দাক্ষিণাত্যের পার্শ্বত্যাগ পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন,
তখন এক ক্ষুদ্র জলাশয়ে একটা ব্যাঘ্র জল পান করিতেছিল, উহা দেখিয়া
গোবিন্দ দাস বলিতেছেন :—

ইঙ্গিত করিয়া ব্যাঘ্র প্রভুরে দেখাই ।

ভাল মন্দ প্রভু মুখে শুনিতে না পাই ॥

জল পান করিতেছে ব্যাঘ্র সেই স্থানে ।

প্রভু পার্শ্বে গুড়ি গুড়ি যাই সাবধানে ॥

চলিলা ডাইনে গোরা ব্যাঘ্র রাধি বামে ।

আবেশে অবশ অঙ্গ মত্ত হরি নামে ॥

ফিরে না চাহিল ব্যাঘ্র মোদিগের প্রতি ।

পিছনে তাকাই আর চলি দ্রুতগতি ॥

মোর জাবগতি দেখি ঐষং হাসিয়া ।

বলে প্রভু ভয় কর কিসের লাগিয়া ॥

হরিনাম বলিলে নাহি রহে যমভয় ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয় ॥

প্রভু বধন বৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন তখনকার কথা :—

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা ।

কটক ডাহিলে করি বনে অবৈশিলা ॥

নির্জল বনে চলে প্রভু কৃষ্ণ নাম লৈয়া ।
 হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ॥
 পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডারশুক্লগণ ।
 তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ॥
 দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয় ।
 প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয় ॥
 একদিন পথে ব্যাঘ্র করি আছে শয়ন ।
 আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥
 প্রভু কহে—“কহ কৃষ্ণ” ব্যাঘ্র উঠিল ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥
 আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান ।
 যন্ত-হস্তি যুথ আইল করিতে জলপান ॥
 প্রভু জল কৃত্য করে, আগে হস্তী আইল ।
 “কৃষ্ণ কহ” বলি প্রভু জল ফেলি যাইল ॥
 সেই জল বিন্দু কণা লাগে বার গায় ।
 সেই “কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে গায় ॥”

চৈতন্য চবিতামৃত ।

এইরূপ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক পরিচয় পাওয়া যায় । আমরা ক্ষুদ্র প্রবন্ধে
 আর কত বলিষ ইহাই তাঁহার প্রভাব এই প্রভাবে আজ সমস্ত অগণ্য মুক্ত ॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভুর পিতৃবিয়োগ ।

(শ্রীনবদ্বীপ-লীলা ।)

লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চরিতদাস গোস্বামী ।

—:—

ব্যাসাবতার ঐল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুরের
 তিরোত্তাবের কথা কিছু বিশেষ করিয়া বর্ণনা করেন নাই । কারণ ইহা বিশেষ
 হৃৎষের কথা । লিখিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়, তাই তিনি বলিয়াছেন :—

হুঃখ রস এ সকল বিস্তারি কহিতে ।

হুঃখ হয় অতএব কহিল সংক্ষেপে ॥

তিনি সংক্ষেপে এই হুঃখ কাহিনী তিনটি শ্লোকে লিখিয়া গিয়াছেন যথা :—

হেন মতে কথো দিল থাকি মিশ্রবর ।

অন্তর্ধান হইল নিত্য সিদ্ধ কলোবর ॥

মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিল বিস্তর ।

লশরধ বিজয়ে যে হেন রঘুবর ॥

হুনিবার ঐগৌরচন্দের আকর্ষণ ।

অতএব রক্ষা হৈল আইর * জীবন ॥

পিতৃবিয়োগে প্রভু বিস্তর কান্দিলেন । প্রভুর হুঃখ বর্ণনা করিতে কাহার সাধ হয় ? তাহ ঠাকুর বৃন্দাবন দাস এই হুঃখ কাহিনী বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিলেন না ।

ঠাকুর লোচনদাস প্রভুর পিতৃবিয়োগ কাহিনী কিছু বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন । কলিহুঙ্করীর হৃদয় বড় কঠিন । তাহাদের কঠিন হৃদয় দ্রব করাইয়া ঐগৌর-ভগবানের অপূর্ণ লীলারস-সমুদ্র মধ্যে তাহাদের মন ডুবাইবার জন্যই ঠাকুর লোচন দাসের এই চেষ্টা । লীলা লেখকগণ (ক) সর্বদা লীলা সমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন । তাহাদের হৃদয়ে ঐভগবানের সকল লীলারই সমভাবে ক্ষুর্ত্তি হয় । প্রভুর হুঃখময় লীলাবাদনে তাহাদের মনে হুঃখের উদয় হইলেও লীলার উদ্দেশ্যে সে হুঃখও সুখ বলিয়া বোধ হয় । প্রেমাক্ষ পতন

* আইর—ঐগৌরাক্ষ জননী শচীদেবীর ।

(ক) অধুনা অধিকাংশ লেখকই আপন আপন কল্পনাবলে লীলাবিবৃত্ত করিতেছেন ইহাঁদিগকেও অনর্থ লীলালেখক বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে সাধনের ফলে লীলা ক্ষুর্ত্তি হওয়া সম্ভব পর তাহা লোকান্তর জ্ঞান লভ্য ঐকৃষ্ণদৈর্ঘ্যের প্রেম-লক্ষণা মহাসমাধির ফলে ভগবন্তীলার ক্ষুর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সৌভাগ্য লাভ করা অতীব দুর্লভ । বর্তমান সময়ে লীলা লেখার অনেক কল্পনার সমাবেশ দেখিয়া, পাঠকগণের সত্যতাই অত্যন্ত ক্রেশের কারণ হয় । লেখকগণের উহা মনে রাখা কর্তব্য । (ভক্তি: সং)

শ্রুতের ন্যায় লীলা রসাবাদনে সমানমুত্তম হয়। তাহা না হইলে এ সকল লীলা মহাজনগণ কখনও লিখিতে পারিতেন না। প্রভুর লীলা কাহিনী দুঃখ হুঃখ পূর্ণ। সুখই দুঃখময় লীলা পাঠ বা শ্রবণ করিব দুঃখ কাহিনী ভাবনা বা লিখিব না এ কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বরুণরস পূর্ণ লীলারস কাহিনী যত ভক্তি উদ্বোধক ও তাবোধোধক, অন্যকথা তত নহে। প্রভুর সম্যাস কাহিনীতে জীবনের জন্ম যত দ্রব হয়, তত আর কিছুতেই হয় না।

নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রভুর উপনয়ন সংস্কার হয়। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্র অশ্রকট হন। শ্রীগোবিন্দ তখন নিতান্ত বাল স্বভাব সংসারে কিছুই বুঝেন না।

শ্রীপাদ জগন্নাথ মিশ্র জ্বর রোগে দেহত্যাগ করেন। পতি দেবতার বিষম জ্বর দেখিয়া শচীমাতা বড় ভীতা হইলেন। তিনি কান্দিতে লাগিলেন। জননীর ক্রন্দন দেখিয়া নিমাই চাঁদ কান্দিলেন না। কারণ এ সময় তিনি কান্দিলে জননীর শোক ও হুঃখ দ্বিগুণ বদ্ধিত হইবে; তিনি জননীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বালক নিমাইচাঁদ ওস্তাদ পণ্ডিতের ন্যায় জননীকে সর্বত্রাণী কালভঙ্গ বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি পিতার নিকটে বসিয়া জননীকে কহিলেন :—

মরণ সত্তার মাতা আছয়ে নিশ্চয়।

ত্রফা রুদ্র সমুদ্র পার্শ্ব হিমালয় ॥

ইন্দ্র বরুণ আশ্ব কালে সর্প নাশে।

মরণ লাগিয়া কেনে পাইছ তরাসে ॥ (চৈতন্য মঙ্গল)।

বালক নিমাইচাঁদের কথা শুনিয়া শচীমাতা বিস্মিত হইলেন। নিমাই চাঁদের মুখে তত্ব কথা তিনি অনেক বার শুনিয়াছেন। কিন্তু এই বিপদ সময়ে বালকের বৈধব্য ও সবিজ্ঞতা দেখিয়া শচী মাতা অবাক হইলেন।

দিন দিন মিশ্র পুরন্দরের গীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কথিতব্য বৈদ্যগণ বলিলেন তাঁহার জীবন সংশয়। শচীমাতা এ কথা শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার মস্তক বৃণ্ডিত হইল। তিনি মুচ্ছিতা হইলেন। প্রভু নিকটে বসিয়া মাতৃসেবা করিয়া জননীর মুচ্ছা অপনোদন করিলেন। শচীমাতা স্বামীর অবস্থা দেখিয়া হতাশাস হইয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু কিছু দৃঢ়ভাবে শোকাবেশ সংবধ

করিয়া জননীকে তৎকালোচিত উপদেশ প্রদান করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলঃ :-

তোর বন্ধুগণ যত আনহ এখন ।

সতেমিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ ॥

বাকবের কার্য মৃত্যুকালে সত্য জানি ।

স্মরণ করায় প্রভু দেব যাহুমানি ॥

শচীমাতা বালক নিমাইচাঁদের কার্য কলাপ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। হৃৎখে শোকে তিনি অভিভূত হইলেও তাঁহার কণ্ঠব্য জ্ঞান রহিত হয় নাই। তিনি উচ্চৈঃশব্দে কান্দিয়া কান্দিয়া প্রতিবেশী কুটুম্বগণকে ডাকিলেন। তাঁহারা সকলেই আসিয়া মিশ্র ভবনে উপস্থিত হইলেন। মিশ্র পুরুন্দরকে সকলে ঘেরিয়া বলিলেন। সকলেরই বদন শুক। (খ) মিশ্র পুরুন্দরের আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া একে অন্যের মুখের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বাহিরে আসিয়া গঙ্গা তীরস্থ করিবার যুক্তি করিতে লাগিলেন।

পরিণত যত যত বন্ধুগণ ছিল।

কাল লগ্ন্যসন্ন দেখি যুক্তি করিল ॥ (চৈতন্য মঙ্গল ।)

নিমাইচাঁদ সর্ব্বত্র তাঁহার আর বৃত্তিতে বাকি রহিলেন। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া জননীকে বলিলেন “মা! এসময়ে শোক করিলে চলবে না। ইষ্ট কুটুম্বের কাজের এই উপযুক্ত সময়।”

বিখস্তর বোলে আর না কর বিলম্ব।

এই কণে চাহিতে ইষ্ট কুটুম্ব ॥

এই বলিয়া পুত্র ও জননীতে মিশ্র পুরুন্দরকে ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতীরে আনয়ন করিলেন। (গ)

(খ) সকলেরই যে বদন শুক ছিল একথা বলা যায় না, কেননা বঙ্গ ও খন্ড অঙ্গ একেবারে শুক হয় নাই, মৃত্যুশয্যায় আত্মীয়ের শেষ বিদায় দিতে যাইয়া অতি বড় পাষণ্ড হৃদয়েরও নয়নজলে গুণ পরিষিক্ত হইয়া থাকে। (ডঃ সঃ)

(গ) বৃদ্ধা শচী মাতা ও তাঁহার শিশু পুত্রের পক্ষে এ গুরুতর ভার বহন অসম্ভব। অপরন্তু কুটুম্বগণই বা বহনে যোগদান করেন না কেন? (ডঃ সঃ)

ইহা বলি মায়ে পোয়ে ধরিলেন তারে ।

পিতার সহিত পেলেন আকৃষীর তীরে ॥

এত আক্সীয় খজন কুটুম্ববর্গ উপস্থিত থাকিতে প্রভু ও শচীমাতা কেন এই কার্যে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিলেন, ইহার একটু তাৎপৰ্য্য আছে । আক্সীয় স্বজনের অতিম কালের কার্য্য নিজ জন্মের স্বয়ং করা কর্তব্য । ইহাতে হৃদয়ে একটা সুখানুভূতি হয় । পুত্রের কর্তব্য নিমাইচাঁদ করিলেন, পত্নীর কর্তব্য শচীমাতা স্বয়ং করিয়া লোক শিক্ষা দিলেন । গঙ্গার উপরে মিশ্র পুরন্দরের গৃহ ছিল ।(৬) সেখান হইতে তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করা বড় পরিশ্রমের কার্য্য নহে । গঙ্গাতীরে ঘাইবার সময় মিশ্র পুরন্দরের সম্পূর্ণ জ্ঞান রহিয়াছে । তাঁহার নয়নদ্বয় প্রভুর বদন চক্ষের প্রতি যেন বিদ্ধ রহিয়াছে বোধ হইল । আক্সীয় কুটুম্বগণ হরি-লংকীৰ্ত্তন করিতে করিতে লগ্নে চলিলেন । গঙ্গাতীরে পিতাকে গঙ্গাতীরস্থ করিয়া প্রভু তাঁহার চরণতলে বসিলেন । তখন তাঁহার বিশাল কমল লোচনদ্বয়ে বারি ধারা লক্ষিত হইল । আর তিনি শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না—

পিতার চরণ ধরি কান্দে বিষস্তর ।

সঙ্গরিতে নারে কণ্ঠ গদ গদ স্বর ॥

প্রভুর বদনে শোকচিহ্ন লক্ষিত হইল । তিনি তখন বৈধ্য হারাইলেন । পিতৃ-শোকাতিভূত হইয়া বিকম্প হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন । যথা
শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে :—

আমারে ছাড়িয়া পিতা কোথা যাবে তুমি ।

বাণ বলি ডাক্ আর নাহি দিব আমি ॥

আজি হৈতে শূন্য হৈল এষর আমার ।

আর না দেখিব হুই চরণ তোমার ॥

আজি দশ দিক শূন্য অন্ধকার মোরে ।

না পড়াষে যত্ন করি ধরি নিজ কোরে ॥

মিশ্র পুরন্দর তখনও সম্পূর্ণ স্বজ্ঞান । তিনি পুত্রের স্নেহ বিলাপ ধর্ম্মিতানিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না । সেই আসন্ন কালেও তাঁহার চৈতন্যিকারের

(৬) এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করা কর্তব্য ।

কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইল না। (ঙ) তিনি নিমাই চাঁদের পদ্ম হস্ত বক্ষে ধারণ করিয়া বাম্পাকুল লোচনে কহিলেন “বাণ বিশ্বস্তর! এখন তোমাকে আর অন্তবের কথা কি বলিব? রঘুনাথের চরণে আমি তোমাকে সমর্পণ করিলাম বাণ। তুমি যেন আমাকে কোন কালে ভুলিও না।”

গদ গদ স্বরে বোলে শুন বিশ্বস্তর।

কহন না বাণ মোর যে হয় অন্তর ॥

রঘুনাথ চরণে সঁপিলুঁ আমি তোমা।

তুমি পাছে কোন কালে পারিবে আমা ॥ (১৫: মঃ)

পিতা পুত্রের নয়ন জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। প্রভুর বদন চন্দ্রের উপর মিশ্র পুরন্দরের নয়ন বন্ধ হইয়াই যেন হস্তিস্বরণ করিতে করিতে ‘জাঁহার প্রাণ গায়ু নির্গত হইবে। এই সময়ে সকলে হরি হরি ধ্বনি করিয়া তাহার গঙ্গা জলে নামাইলেন। তুলসীর দাম গলদেশে দেওয়া হইল। চতুর্দিকে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হরি সংকীর্্তন করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ পুত্ররূপী শ্রীমাদ্রাজাভৈরবের অধঃস্থর বদন চন্দ্র দর্শন করিতে করিতে, এবং মধুর হরিনাম করিতে করিতে শ্রীগোপাল অগম্য মিশ্র পুরন্দর বৈকুণ্ঠ গমন করিলেন।

ইহা বলি হরি হরি করয়ে স্মরণ।

গঙ্গা জলে নামাইলা সকল ব্রাহ্মণ ॥

গলার তুলিয়া দিলা তুলসীর দাম।

চৌদিকে তকত সব লয় হরিনাম ॥

চতুর্দিকে হয় করিনাম সংকীর্্তন।

হেনকালে, বিজ্ঞানমের বৈকুণ্ঠ গমন ॥ (১৬: মঃ)

শচীমাতার আকুল ক্রন্দনেতে ধরণী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি গঙ্গাতীরে পড়িয়া অঙ্গ আছাড়িয়া শোকাবেগে হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পতিদেবতার পদ ধারণ করিয়া পাষণ ভেদী কত কঠে বিলাপ

(ঙ) “স্বির থাকিতে পারিলেন না” “চিত্তবিকারের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইল না” আবার “বাম্পাকুল লোচনে কহিলেন” ইত্যাদি অত্যন্ত অসামঞ্জস্য পূর্ণ উক্তি। লেখক যাত্রেরই এই সকল দোষের উপর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। (ড: পঃ)

করিতে লাগিলেন । শচীমাতার হৃদয় বিদারক রোদন ধ্বনি শুনিয়া পুত্র পক্ষী
তৃণ লতা পর্ষ্যস্ত শোকে অলিত্ত হইল । ঠাকুর গোচন দাসের ভাষায় সে
বিলাপ কাহিনী শুনুন ।

পতির চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়া ।

মো যাব আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া ॥

এতদিন ধরি তোর সেবা কৈলুঁ মুঞি ।

বৈকুণ্ঠে চলিলা তুমি আগি আছি ভূঞি ॥

শয়নে ভোজনে মুঞি সেবা কৈলুঁ তোর ।

আজি দশদিক শূন্য অন্ধকার মোর ॥

অনাধিনী হৈলুঁ তোর ছোঁড়পুত লঞা ।

নিমাই থাকিবে কোথা কত হুঃখ পাঞা ॥

জগত হুল'ভ তোর তনয় নিমাই ।

সকল পাসরি বাহ আমার গোসাঁঞি ॥

জননী'র স্কন্ধে বিলাপধ্বনি শুনিয়া বালক নিমাইচাঁদের পিতৃশোক-
সিদ্ধ একেবারে উখলিয়া উঠিল । তিনি কান্দিয়া আকুল হইলেন । তাঁহার
হৃদয় নয়নে দর দরিত ধারা বহিতে লাগিল । নয়ন জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া গেল ।

মাথের কান্দনা দেখি বাপের সরণ ।

কান্দয়ে শচীর হুত অকো'র নয়ন ॥

গজমতি হার যেন গাঁথিল হুতায় ।

নয়নে গলয়ে অল বিশাল হিরায় ॥

আত্মীয় স্বজনের হাঠাকারে, জননী'র রোদনে- প্রভু ক্রন্দন সংবরণ করিতে
পারিতেছেন না । তাঁহার ক্রন্দনে যে জগত সংসার কান্দিতেছে বলিয়া বোধ
হইল ।

“প্রভুর কান্দনার কান্দে সকল সংসার ।”

তখন সকলে মিলিয়া প্রভুকে সান্তনা করিতে লাগিলেন । আত্মীয়
প্রতিবেশিনীপণ তাঁহার নয়ন মুছাইয়া দিয়া শচীমাতার নিকট লইয়া গেলেন ।
শচীমাতা পুত্র মুখ দেখিয়া সকল শোক সংবরণ করিলেন ।

“শোবা চান্দে'র মুখ দেখি সব পাসরিলা ।”

প্রভু ওখন আশ্বশোক সংবরণ করিয়া জননীকে প্রবোধ দিতে বসিলেন । জননীকে শান্ত করিয়া পিতার অত্যন্তিক ক্রিমা সমাধা করিলেন চকল নিমাই-চাঁদ একণে পরম শান্ত সুখীর বালক । কোন চপলতাই নাই ।

আপনে সুখীর প্রভু সর্ব সমাধিরা ।

কাল যথোচিত কর্ম করিল সঙ্ক্রিয়া ॥

তাহার পর গজাতীর হইতে জননীকে গাইয়া গৃহে ফিরিলেন । শূন্য গৃহ দেখিয়া শচীমাও শোক সিদ্ধ পুনরায় উৎপিয়া উঠিল । নিমাই চাঁদ জননীর কোলে গিয়া বসিলেন । বসনাকলে জননীর মুখ মুছাইয়া দিয়া তাহার শোক নিবারণ করিলেন । পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া শচীমাও পতিশোক সংবরণ করিলেন । প্রভু যথারীতি পিত্রাজ্ঞ করিয়া কুটুম ভোজন করাইলেন । যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে ভৈক্ষস পত্রাদি দান কার্য সমাধা করিলেন ।

তবে বেদবিধি মতে যে ছিল উচিত ।

করিল বাপের কর্ম কুটুম সহিত ॥

পিতৃভক্ত প্রভু পিতৃযজ্ঞ কৈল ।

ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণেরে দিল ॥

তোখাখার ভোজনাদি দ্রব্য বত বত ।

ব্রাহ্মণেরে দিলা প্রভু পিতৃ-ভক্ত ॥

প্রভু পিতৃহীন হইলেন । শচীমাতার অকলের ধন নিমাই চাঁদ পিতৃহীন হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন । বিদ্যারসে তিনি মত্ত হইলেন । শচীমাতা ভাবিলেন যদি বিদ্যাবসে পুত্র তাঁহার পিতৃশোক ভুলিয়া সংসারে কর্মাদি করে সেই ই পরম মঙ্গল ।

বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার ।

তবে মনোমুখে ত্র গোড়ার আম'র ॥

প্রভুর পিতৃবিয়োগ জীবার ফল প্রক্তি ঠ কর লোচন দাস লিখিয়াছেন :—

অদ্বাকৃত জন যদি এই কথা শুনে ॥

বৈকুণ্ঠ চলয়ে সেই গঙ্গার মরণে ॥

পিতৃশোক প্রভুব অনেক দিন পর্য্যন্ত স্মরণ ছিল । তাঁহার প্রথম বিবাহের সময় একবার এই শোক সিদ্ধ উৎপিয়া উঠিয়াছিল তাহা গ্রন্থে পাওয়া যায় ।

প্রভুর শুভ বিবাহের অধিবাসের দিন যখন প্রতিবেশিনী কুলনারী বৃন্দ প্রভুর
অঙ্গনে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে বরণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন
শচীমাতা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া দীনভাবে দুঃখিতাত্ত্ব্যকরণে কহিলেন :—

পতিহীন মুঞিছার পুত্র পিতাহীন ।

তো তবার সেবা কি করিব মুঞি দীন ॥

এই কথা বলিতে বলিতে শচীমাতার হৃদি ময়নে নীর ধারা প্রবাহিত হইল,
মুখে আর কথা বাহির হইল না। জননীর চক্ষে জল দেখিয়া নিমাই চাঁদ
মস্তক নত করিলেন। তাঁহার চক্ষেও জল আসিল। তাঁহার মনে পিতৃশোক
স্মৃতির উদয় হইল। তিনি মনে বড় ব্যাথা পাইলেন। পুত্রের চক্ষুতে জল
দেখিয়া শচীমাতার চৈতন্য হইল। তিনি তাড়াতাড়ি নখন মুছিয়া পুত্রকে
স্বাস্থ্যনা করিতে লাগিলেন যথা চৈতন্য মঙ্গলে :—

কেনে কেনে বাছা হেন বিরস বদন ।

এ হেন মঙ্গল কার্য্যে কান্দ কি কারণ ॥

সকল সংসারে মাত্র তুমি মোর ধন ।

তুমি বিয়ারস প্রাণ ছাড়িব এখন ॥

এ হেন শুভদিনে শুভক্ষণে শচীমাতা পুত্রের ময়নে নীরধারা দেখিয়া অমঙ্গল
আশঙ্কা করিয়া এই কথা বলিলেন। নিমাই চাঁদ কিছু স্থির হইয়া এবং
শোকাবেগ সংবরণ করিয়া জননীকে গভীর ভাবে কহিলেন :—

মায়েরে কহিলা প্রভু তন মোর কথা ।

কি লাগিয়া এত দূর ভোর মন ব্যথা ॥

কিবা ধন নাহি মোর কিবা পাইলে দুঃখ ।

দীন একাকিনী হেন কহ অতি রুখ ॥

পিতা অদর্শন মোর সোঙরাইলে তুমি ।

যেমন দতিছে হিয়া কি বলিব আমি ॥

এই বলিয়া প্রভু কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। পুনরায় নবীন দেহ পর্জনের
ন্যায় শব্দে জননীকে কহিলেন :—

এক অনে দু'বার দেহ গুণাক্ চন্দন ।

যথেষ্ট করিয়া দেহ বস্ত লয় মন ॥

সর্ব্বাঙ্গে লেপহ লভার মুগন্ধি চন্দনে ।
 বধেষ্ঠে করিয়া দেহ চিন্তা নাহি মনে ॥
 পৃথিবীতে কেহো ঘাহা নাহি করে লোকে ।
 ইন্দ্ৰিতে করিব তাহা কহিল তোমাকে ॥

প্রভু জননীর দীনতাব দেখিয়া এহকপ কহিলেন। এতলে তিনি জননীর নিকট ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিলেন। বিধি ব্রহ্মাওপাতির মত কথা কহিলেন।

শচীমাতা পুত্রের ভাব দর্শনে ও তাহার কথা শ্রবণে পুলকিত হইয়া মধুর বচনে নিমাই চানকে শাস্ত করিলেন। পুত্রের কথা মত সকল কার্য্য করিলেন। কিছুই অনাটন হইল না। শচীমাতার পুত্রের কল্যাণে অক্ষয় ভাণ্ডার হইল। (চ) -

প্রভুর লীলা কবার অম্ব নাহি। প্রভুর নবধৌপ লীলা হৃদ্ধাক্ষি সম।
 হাঁহার ঘেকপ তৃপা, সে তৃপামুকপ গৌরলীলা হৃদ্ধাক্ষি হইতে হৃদ্ধ উত্তোলন করিয়া
 পান করিয়া হৃদয় পরিভূপ করেন।

চৈতন্যলীলামৃত সিদ্ধ হৃদ্ধাক্ষি সমান।
 তৃপামুকপ ঝারি ভরি তেঁহো কেল পান ॥

ঐগোরাধের নবধৌপ লীলা নিত্য নূতন। শুনিতে শুনিতে প্রাণ শীতল হয়,
 শ্রবণ জুড়ায়। কবিরাজ গোপামী বলিয়া গিয়াছেন :-

চৈতন্য চরি গমুত যেই জন শুনে
 তাহার চরণ বুইয়া কৈরো মুঞি পানে ॥

এত দৈন্য কেহ কোথায়ও দেখিয়াছ কি? কবিরাজ গোপামীব পাদ পদ্ম স্মরণ করিয়া আশ্র শোভনেব জন্য প্রভুর লীলা অনুশীলন করিয়া যে আনন্দ পাই তাহা নিজ ভোগ করিয়া মুখ হইয়া না। তাহ আমার হৃদয়ের ধন গৌর-ভক্তবৃন্দের চরণে নিবেদন করি। হহাতেহ আমার মুখ। জয় গৌর।

(চ) পিতৃবিবাহ শ্রবণে এই বিবাহের অংশটি অপ্রাসঙ্গিক। পিতৃ ভক্ত পুত্রের পিতার কথা আজীবন আদায়রবীয়। (ভক্তি সম্পাদক।)

প্রাণের উচ্ছ্বাস ।*

[পুণ্ড্রাপাদ দাদা দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়ের বচিত "উপাসনামঙ্গল" পাঠে ।]

—:—

কুম্ম করিবা গেছে ; সৌরভ ত'হার—
এখনো চৌদিক্ ওই করে আগোদিত ।
ছিড়ে গেছে সুশাখা বীণার সে তার ;—
এখনো স্বাকার তার, শুধু মুখরিত ।
নাই দাদা "দীনবন্ধু", দীনের আশ্রয়
সিত্যসামে নিত্য লীলা সাগরে মগন ।
যে গীতি ধনিল কণ্ঠ, এখনে স্বতন্ত্র—
ভয়ক্তি সংসারী জনে, দেয় অশ্রুজল ।
'ভাগবতে' মহাকীৰ্ত্তি যাহার প্রকাশ,—
'ভক্তি' যার অমররব অপকপ ধন ।
'লক্ষ্মি দর্পণ' যাব প্রেমের আভাস,
পবিত্র "প্রার্থনা" যাব, ভাবে অতুলন ।
তাহারই বিমল চিত্র হৃদয়ে উথিত—
ঐশ্বর্য ভাবে ভরা মধুর এ "গীত" ॥

দীন — শ্রীরসিক লাল দে ।

* "ভক্তি"র পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, ভক্তকবি শ্রীযুক্ত রসিক লাল দে মহাশয় "উপাসনা সংগীত পাঠে" বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়া, তাহার পবিত্র "প্রাণের উচ্ছ্বাস" পাঠাইয়া দিয়াছেন ; অমরা অতি আনন্দ পূর্ণ চিত্তে, ভক্তের দান গ্রহণ করিয়া প্রকাশ কবিলাম ।—

"ভক্তি" সম্পাদক ।

অপূর্ব রামধনু ।

(গীতিকা)

[ভ্রমের মাখাল ভাবধারী প্রিয় শিশু গোপাল বিয়োগে,

এবং নিত্য গোপালের অমৃতময় সংযোগে

হৃদয়াকাশে অপূর্ব রামধনুর

বিকাশ ।]

—:—

ভীরু বিবহে, তপ্ত পরাণ বিষাদ জলদ ঝোর ।

দেখিতে, দেখিতে, ছাইল সমগ্র হৃদয় গগন মোর

ঝব্ ঝব্ ঝব্, করে আঁধি জল, ফি সজাপ । কি যাতনা ।

সন্ সন্ সন্, বহে প্রভঞ্জন, কিবা তার উদ্গাদনা ॥

হুড়্ হুড়্ হুড়্, মেঘের গর্জন্, হবে কি অশনি পাড় ।

সংসার সাগরে, জীবন তরণী, ডুবিলে কি অকস্মাৎ ?

না, না, ডুবিল না, প্রভুর ছলনা ও কি ও পশ্চাতে হেরি ।

বিচিত্র বরণে, কি চিত্র শোভন, কি হৃদয় মরি, মরি ॥

প্রেমের প্রোজ্জ্বল কিরণ সন্ধ্যাতে, অশ্রু বর্ষণ পড়ে ।

কি এ অপকণ্ গোন্দর্য অচুপ, মাধুর্যে মানস হয়ে ॥

এ যে রে প্রেমের পরম হৃদয় অপকণ ইন্দ্র ধনু ।

সপত কিরণে কিবা শোভা পায়, চিম্ময় ভাবের তনু ॥

ভাবনেক্র মেলি, হেরিহুরে আজ হিয়া মাকে পরকাশ ।

গোপাল বিয়োগে, নিত্য গোপালের এ বৃকি বাহ আভাস ॥

এই বৃকি বিষায়িত গোরা প্রেম, তপ্ত ইন্দ্র চরমণ ।

ধরি ধরি করি, পুনঃ ছাড়ি ছাড়ি, স্থখ ও দুঃখের কি মিলন ॥

বাক্য অগোচর, ভাবের গোচর, অন্তরে আবাদন ।

গোপাল বিয়োগে, নিত্য গোপালের এ বৃকিরে আগরণ ॥

দীপহীন—রসিক লাল দে দাস ।

কলিকালের মাহাত্ম্য ।

(লেখক—শ্রীযুক্ত ভবানীচন্দ্র সাহা ।)

—:~:—

কঠিন সে কলিকাল করহ শ্রবণ ।
পৃথিবীর সব লোক পাপ-পরায়ণ ।
কলি-মল-কলুসিত ধরম হইল ।
সাধু-শান্ত সমুদায় বিলোপ পাইল ।
কলিত অনেক পথ দান্তিকেরগণ ।
নিজমতি অহুসাবে করিল স্বজন ।
লোক যৌতবসে লোভে গ্রাসে শুভকর্ম ।
শুন হরিষক্ত কহি কিছু কাল-ধর্ম । ●
নাহি আশ্রম চারি ধরম বরণ ।
নাহি করে কেহ ঋতি-পথে বিচরণ ।
নিগম বঞ্চক দ্বিজ ভূপ প্রজাগণ ।
কেহ নাহি করে মান্য ঋতির শাসন ।
তার সেই পথ যার যাহা মনোনীত ।
বাচালে সকলে কহে জ্ঞানী মুণ্ডিত ।
মিথ্যারম্বর দস্ত রত হয় যেই জন ।
তাহারে সকলে কহে সাধু মহাজন ।
সে বড় চতুর যেই পরধনহারী ।
যে করিতে পারে দস্ত সে বড় আচারি ।
বহু মিথ্যা ঋণটতা করিতে যে পারে ।
কলিযুগে কহে সবে গুণবান তারে ।
আচার বিহীন যেই ঋতি-পথ ভ্রাণী ।
কলিযুগ মাঝে সেই বিদ্বান বিরাগী ।

জটাভার শিরে দার বিলাল লবর ।
 কলিযুগ মাকে সেই তাপল প্রবর ।
 করিয়া অন্তর বেশ ভূষণ ধারণ ।
 ভক্তাভক্ত নাহি মানে করয়ে ভোজন ।
 পূজনীয় কলিযুগ মাকে সেই হয় ।
 তারে লিঙ্গ বোণীবর সকলেই কর ।
 সব নর কামী লোভো অতিমানী ক্রোধি ।
 দেব বিপ্র গুরু সাধুগণের বিরোধি ।
 গুণের মন্দির পতি করিয়া বর্জন ।
 অভাগিনী করে পরপুরুষ ভজন ।
 ভ্রমণ বিহীন রহে রমণী সধনা ।
 বিভূষণে বিভূষিতা অভাগি বিধবা ।
 গুরু অর্থ শিষ্য বধির দ্বোহেতে সমান ।
 একের নাহিক আশি অপরের কাণ ।
 গুরু শিষ্য ধন হরে শোক নাহি করে ।
 লাক্ষণ নরক মাকে সেই গুরু পড়ে ।
 ব্রহ্মজ্ঞান বিদ্যা নর নাহি কহে আন ।
 কপর্দক হেতু বধে বিপ্র গুরু প্রাণ ।
 বিপ্রসনে বিসম্বাদ করে শূদ্রগণ ।
 মোদের হইতে বড় কিসে হে ব্রাহ্মণ ?
 পরত্নী লম্পট ছুই খল দ্রাশয় ।
 বিমোহে মমতা দেহ মনে অভিধম ।
 আপনি হইয়া নষ্ট নাশে অন্য নরে ।
 বদ্যপি বেদের পথ কেহ অনুসারে ।
 কলে কলে এক এক নরকে সে পড়ে ।
 তর্ক করি বৈদ্য পথ যে দূষিত করে ।
 রমণী ভ্রমণ ভূমি সম্পদ বিনাশী ।
 মন্তক মুণ্ডন করি সে হয় সম্যাসী ।

করায় ব্রাহ্মণ ঘারা চরণ পূজন।
নিজকরে ছুই লোক করে বিনাশন।
শূদ্র করে অপ তপ বজ্র ঝড় দান।
বরাসনে বলি করে পুরাণ বাধান।
কল্পিত অনেক পথ করিয়া স্বজন।
মোহবদে করে নর তাহাতে ভ্রমণ।

চন্দ্রশেখর প্রতিবাদের আলোচনা।*

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর।)

—:—

‘ভক্তি’ সম্পাদক প্রিয় ভক্তিনিধি ঠাকুর!

ময়মনসিংহ, সেরপুর টাউন হইতে শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ দাস মহাশয়ের প্রেরিত পত্রখানি গত পৌষের (১৩২৩) সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া ভক্তের অনুবোধ রক্ষা করিয়াছেন। ভালই হইল—এতদুপলক্ষে আমি অধম গুটিকতক কথা বলিবার সুবিধা পাইলাম। গুটিকতক কথা এই :—

- ১। আপনাকে ধন্যবাদ দেই আপনার দ্বিতীয় টিপ্সনী এক প্রকার যথেষ্ট।
- ২। লেখার আভাসে আমার বিশ্বাস, প্রতিবাদক দাস মহাশয় ভজন নিষ্ঠ বৈক্যব। ভজনের অতি উচ্চাঙ্গন হইতে ওকপ লিখিয়াছেন। কিন্তু হৃৎকের বিষয় তিনি অত দূর উষ্ণিয়াও চকোর হন নাই।
- ৩। “কথা নিয়া নাড়া চাড়ার অভ্যাস বা সমস্ত আমার নাই”—ইহা সত্য হইতে পারে কিন্তু নিন্দা কম করেন নাই। “নাড়া চাড়ার অভ্যাস” বস্তুতঃ কম হইলে প্রাচীন নবীন উভয় পক্ষেরই মঙ্গল হইত।

* “কি আনন্দ চন্দ্রশেখরে” প্রবন্ধের প্রতিবাদ পত্র পাঠ করিয়া প্রবন্ধলেখক আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সাধারণের অবগতির জন্য অবিকল মুদ্রিত করিয়া দিলাম। (ভঃ সঃ)

৪। দাস মহাশয় বিধির ফুলবাগানের এমার্ডে বাস করেন। নীষির জল টলমল। তাহাতে তিনি নিত্যস্বামী। “ভক্তিসাগর” মকভূমির ক্ষুদ্র ঘৌব সত্তত দক্ষ, কিন্তু বালুর তলে তিনি এক অফুরন্ত উৎস পাইয়াছেন। তাই নিরাভার এত বড়াই।

৫। “অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোররায়”—একধায় যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা প্রতিবাদ করিয়া থুথী চউন।

৬। “শ্রীএকাদশী দিবসে মহোৎসব কোন্ বিধি অনুসারে হইল?”—প্রতিবাদক মহাশয় সন্তুষ্টঃ সকলগুলি কথায় প্রণিধান করিবার সময় পান নাই। ওইটি শ্রীমান প্যারী মোহনের জলন্ত অনুরাগের চিত্র। প্যারীমোহন তো ব্যয়লনা, উপদেশ মানিল না।—কৃষ্ণের ইচ্ছার উপর মুখব্যাহান করিবার আমরা কে? যাহাবা সেদিনের জন্য প্যারীমোহনকে দেখিল তাহারা বুঝিল এর উপর বিধি নাই। যাহারা না দেখিয়াছে তাহারা দূরে থাকিয়া বিধির বন্দনা গাহিতে পারেন—দশটা গালিও দিতে পারেন। কিন্তু আমার গোরা তা বুঝিল কৈ? মহোৎসবের বিধি আছে, কিন্তু মহামহোৎসবের বিধি দেখি না। কতিপয় বৎসর মধ্যে আমার গৌরনিত্যনন্দের যোগব সাক্ষাৎ মহিমা-র্শন করিয়াছি, তাহাতে ও সব দিনকাণা বিধির কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

৭। নিতাই গৌরের নাম শুনিবে না এমন গোড়ীয় বৈষ্ণব না থাকিলেও, গোড়ীয় বৈষ্ণব হওয়া মুখে কথ্য নয়। কারণ সকলের দুঃখের গৌরনিতাই নাম প্রতিবাদক মহাশয়েরও ভাল লাগে নাই। যথা শিদ্ধচরণ দাস বাবার মুখের “গোপনিতাই” শুনিয়া তিনি কাণে হাত দিয়াছেন। বস্তৃতঃ সহস্র সহস্র লোক গৌরনামে ক্ষণিয়া উঠিয়াছিল, কেবল দুই চারিটি বেশ ভূষার অঞ্চল নিরক্ষর বৈষ্ণবভক্তমানী ব্যক্তির শ্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল। যাহার স্বার্থ আছে, বাবসা আছে, হিংসা, মহোৎসবে চুবি করিয়া ঝুণনা করে, বাহার আছে সব, নাই কাছা—সে হেন বৈষ্ণবের পক্ষ-সমর্থন করিয়া চরণ দাস বাবার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন মধ্যদার ব্যাঘাত।

৮। “জক্তকণী তপসান” এ মন্ত্র যিনি গ্রহণ কারিয়াছেন, তিনি চরণদাসের চরণ ছাড়িবেন কেন?

৯। অষ্টগ্রহর সঙ্কীর্ণনের যে প্রাণগৌ ভদ্রমুখায়ীই উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। অধিবাস কুঞ্জ ভাদ্রাদিও হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস দাস মহাশয় নিজের মূল প্রবন্ধটা পাঠ করিবার সুবিধা পান নাই।

১০। অরুণাচলের কীর্তন কীদৃশ জানি না। কারণ ঐহট্টকাছাড়ের কোনও উৎসবে আদৌ বাই নাই। জিপুরা ও ঢাকা জিলার বহুস্থানে “প্রাণগৌর নিত্যানন্দ” নাম কীর্তন হইতে শুনিয়াছি। বোধ হয় দাস মহাশয় উহাকেই আরি গান বলিয়া কদর্থ করিয়াছেন। দোষ কি?—ঐ নাম কীতনীরোগের প্রাণের আকুলতা একপ দোধি যে বাস্তবিক গৌরনিত্যানন্দ তাহাদের প্রাণই বটে। এমন মহাভাগ্যের নিন্দা কেন? তাঁহার প্রাণগৌর বলিবার যথার্থ অধিকারী। গৌর যত দিন প্রাণ না হন, ততদিন এ তর্ক উঠিবে মনি। আমরা দোধি এঁদের শুণেই দশবিংশতনে গৌর চিনেছে, ধরেছে। ইহা গৌরেরই ইচ্ছা। দাস মহাশয় ভদ্রমানন্দ, নিরিবিগি কাল কাটান ইহাও গৌরের ইচ্ছা। হুংখের বিষয় তিনি “প্রাণগৌরনিত্যানন্দ” নাম গান অসঙ্গত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কি উচৈঃস্বরে নাম গাহিবার মহিমা বাহা ঐহরিদাস কীতন করিয়াছেন, তিনি তাহাও বিক্রপ করিয়াছেন; তাঁহার ভাব কেহ নাম গাহিও না—গৌর লীলাকাণ্ড উঠিয়া যাউক। কেমনে নাম গাহিবে? যেমনে গাও তেমনে দোষ লাগা। কিন্তু জানি বাহাকে প্রাণগৌর আরিয়াছে সেই আরি গায়।

১১। নামে বিচার দেখি না, নাই হুংখের বিষয়; কিন্তু মালা গাঁথা নামে কুড় কলহ। বিবেচনর চক্রবর্তী মহাশয়ের গীত নাম ভাল চরণদাস ববাজি মহাশয়ের গীত নাম ভাল নয়, এ বিচারের তাৎপর্য্য বুঝি না। যদি ভাবকের ভাব প্রবাহেই নাম গুলি বাহির হয়, তাহার বিচার কি, তাহাই উত্তম। যদি ভাবই উহার ভিত্তি না হয়, তবে দর্শন যুক্তিই ভিত্তি। তবে দর্শন যুক্তির উপর আকিয়া দেখা যাউক :—ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাথা দর্শন।

১২। “নিভাইগৌর রাধেশ্যাম হরেকৃষ্ণ হররাম।”—“হরা” স্থলে “হর” প্রয়োগ আছে এবং “রাম” “কৃষ্ণ” প্রভৃতি অকারান্ত শব্দে বিনগ্ন নাই। এতদ্বারা উপমিত হয় যে এই নাম সকল সম্বোধন পদ। হুংহাং, তকিনিধি মহাশয়, আপনি “ভজ” “জপ” বোঝ দিয়া যে আপোষ মীমাংসা করিয়াছেন

তাহা সমীচীন হয় নাই। সম্বোধন পদের পূর্বে “হে”, “অরি” প্রভৃতি অব্যয়ের মাত্র প্রয়োগ হইতে পারে। “জপ হরে কৃষ্ণ” দ্বারা অর্থ এই হয় যে, হে হরেকৃষ্ণ, তোমরা জপ (জপ কর)। বিতীর্ণতঃ ধরুন—“জপ” প্রয়োগ দ্বারা কেবল মনকে বা জীবকে উপদেশ দেওয়া হইল। সুতরাং তাহা কেবল একবার বলিলেই যথেষ্ট—“হে মন, তুমি হরেকৃষ্ণ নাম জপ।” কিন্তু তা নয়, এ যে অহানিশ মুহুঃমুহু নিজেই গাহিবে! অর্থাৎ হরিকে যে ডাকা হইতেছে “হে হরে, হে কৃষ্ণ, হে রাধে, হে শ্যাম ইত্যাদি।” এই নামগুলি কেবল হরিশ্রবণ সম্বোধন সূচক। এই সব মূলনাম ধরিয়া কেবল হরিকে ডাকিতে হইবে।

১৩। নিতাইগৌর রাধেশ্যাম, হরেকৃষ্ণ হরে রাম।—

নিতাইর কুপায় গৌর পাওয়া যায়। গৌর ও রাধাশ্যাম অভেদ পরতন্ত্র। ইনি সর্বচিন্তাকর্ষক বলিয়া কৃষ্ণ এবং চিন্তে রমণ করিয়া থাকেন বলিয়া রাম বা আশ্চার্য্যাম। সুতরাং এই নামমালিকার ক্রম-পধ্যায় অতি সুন্দর ও তত্ত্ব ব্যঞ্জক এবং শৃঙ্খলভাবে গ্রথিত। তবু ছন্দবেশে যদি একান্তই দোষ দর্শন করেন, তবে প্রতিবাদক মহাশয় ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তি “জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত গৌরানন্দ” উল্লেখ করিয়া ভাল করেন নাই। কারণ দাসমহাশয় তাবুকের ভাবোক্তি সব সত্য—সুন্দর একথা স্বীকার করেন নাই। ঐ সব নামমালা ভাবশূন্যে রচিত স্বীকার না করিলে দার্শনিক তত্ত্ববিচারের উপর এবং লীলা সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ঐ নিত্যানন্দরূপ আসনে উপবিষ্ট ঐগৌরানন্দকে ঐ অদ্বৈত মস্তকে করিয়া আনিয়া নবদীপে নামাইয়াছেন। তাহা হইলে “নিত্যানন্দ” ও গৌরানন্দ এই দুই পদের মধ্যে “অদ্বৈত” পদ কেনমতে স্থাপিত হইতে পারে? মহাজন বাক্যেও যখন এসব ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তখন ওসব রচনা ভাবমূলক মানিয়া সমস্তা নির্দোষ মনে করাই সম্ভব, নচেৎ নানাবিধ সকল গঠি সমান নয় মনে করিয়া ধর্ম্মজগতে গ্রানি উপস্থিত করা নিতান্ত অবৈধ।

১৪। “বহু কাগজে নুতন নুতন বহু প্রকারে কথাই বাহির হইতেছে।”—
নেসর দাস মহাশয় এককাল সহ্য করিয়া আসিয়াছেন “কিন্তু” (ভক্তিনিধি মহাশয়, আপনার মত ভাল লোকের) “আপনার কাগজেও এইরূপ খেজাচরী প্রবন্ধ দেখিবা” দাস মহাশয়ের কিছুতেই সহ্য হইল না। ভক্তিনিধি ভ্রাতৃপ্রবর প্রতিবাদক মহাশয় তোমাকে কতই ফলাইয়াছেন। দেবতাও ভক্তির বস, তুমি

ভাই একটা প্রতিবাদ বোঝ আপত্তিসম্বন্ধে বাহির না করিয়া থাকিতে পারিলে না। ভাবিয়া দেখিও দাস মহাশয় তাঁহার নিজকে কতবড় এক উচ্চাসনে বসাইয়া সকলকেই অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন।

১৫। যথাকালে শেষরাত্রে নিশান্ত লীলা কুঞ্জ ভঙ্গাদি অষ্টকালীন সমগ্র লীলা গাম আরম্ভ করতঃ অহোরাত্র কীর্তন করিয়া———”এখানে ভাবার অর্থ ভক্তিनिधि তারা কি বুঝিয়াছেন জানিলাম। “আরম্ভ” কথা দ্বারা বুঝা গেল সমগ্রলীলা এক মুহূর্ত্তে গাহিয়া অহোরাত্র কীর্তন আরম্ভের ভিতর এতটা বা সবই থাকিল। পরে কি উল্লেখ নাই।

১৬। “বাবু সন্ন্যাসী” প্রভৃতি কথা লিখিতে ভক্তিनिধির যেন একই রস উৎপলিয়াছে কিন্তু আমার বিশ্বাস ভক্তিनिধি তারার স্তাবক দাস মহাশয় এ পর্য্যন্ত কোনও সমাজে বাহির হন নাই। তবে “বৈষ্ণব চিন্তিতে নারে দেবের শক্তি।” আমরা এমন অধম যে অটল দাস, বিটলদাস নিটোলদাস প্রভৃতি নাম স্মৃতির সঙ্গেই আমাদের মনে নেড়ী, দাড়ী ও উলরী (মোটা পেট) লাড়ায়। ইতি

“সাধুনিন্দা মহাপাপ।”

—:—

শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—“সংসঙ্গ সন্নিধানোহপি কণাঙ্গিমপি শযাতে।” আবার সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় ;—“সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসংসঙ্গে সন্দর্শন।” সবই ঠিক, কিন্তু আমরা কি একবারও ভাবিয়া দেখি যে, প্রকৃত সাধুসঙ্গ কি, আর প্রকৃত সাধুই বা কে? সাধুসঙ্গের অসীম মহিমা সকল শাস্ত্রেই কীর্তিত

“শ্রীকৃষ্ণদেবের কৃপার ও শ্রীভক্তি দেবীর অপরিমিত দয়াবলে আল ১৬ বৎসর ধরিয়া কত ভাবের কতলোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হইল। প্রতিবাদক মহাশয় যেভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন সম্পূর্ণ সে ভাব না বুঝিলেও উহার ভিতরে যে কিছু গোলমাল আছে তাহা আমরা পূর্কেই বুঝিয়াছি। তথাপি, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম নাম লইয়া চতুর্দিকে যখন আলোচনা হইতেছে তখন আরও কিছু বড়ক এই ইচ্ছাতেই প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দেখি কি হয়।

হুইরাছে। যদি পূর্বে অমোঘ স্মৃতি বলে কাহারও ভাগ্যে কৃণকালের অন্যতম পক্ষত সাধুসঙ্গ হয় তবে তিনিই বৃত্তিতে পাবেন যে, সাধুসঙ্গের কি অসীম ক্রমতা, কি অমোঘ ফল। শাস্ত্র বলেন ;—“সাধু সঙ্গতঃ সর্বভোগমোহমোহনঃ” অর্থাৎ, সাধু ব্যক্তির দর্শন, মহত্ত্বের রূপা যথার্থই সর্বভোগ, অগম্য এবং অমোঘ ।

“নশতোহি শাভিলাবৎ জাগরিত্যুতক চাতকঃ ।

জাতাতুতং বারিধর স্তোষেষ্যেত্যেব চাতকম্ ॥”

অর্থাৎ, চাতক বারি প্রার্থনা না করিলেও যেমন যেমন আপন উদার অভ্যন্তর গুণে চাতকে বারি বর্ষণ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে, মহৎ ব্যক্তি ও তদ্রূপ অব্যক্ত মনোগত ভাব বৃদ্ধি প্রার্থনার অপেক্ষা না করিয়াই আশ্রিত জনের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন । শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

“কণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ।

ভবতি ভগবৎ তরণে নৌকা ॥”

কৃণকাল সাধু সঙ্গ দ্বারা যে কি প্রকার অমানুষিকভাবে কত মহৎ কাণ্ড সাধিত হয় তাহার তুরি তুরি প্রমাণ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ।

রত্নাকর দম্ভাঙ্গিণ, একমাত্র সাধু সঙ্গের গুণে বাস্তবিক নাম ধারণ করিয়া জগতে অক্ষয় কীৰ্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন । বেশী দিনের কথা নয় ১৩২ বৎসর হইল পুণত্রয়ী শ্রীভগবান শ্রীগৌরানুরূপে নদীয়ায় যে প্রেমলীলা করিয়াছিলেন, তাঁহার পারিষদগণের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা সংশ্লিষ্ট হইয়াছে যাহা পাঠ করিতে করিতে বিষয়ে আত্মহারা হইতে হয়, আমরা উপসংহারে এ বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল । এক্ষণে সাধুগণের প্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক ।

সর্বশাস্ত্রমার পঞ্চম বেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, সাধু দর্শনতো দূরের কথা তাঁহাদিগের গুণাবলি আলোচনা দ্বারাও শত শত অশ্রুপাণ দূরীভূত হয় । যখন সাধুদিগের গুণ-কীৰ্ত্তনে এত ফল না জানি দর্শনে কত ফল । কিন্তু দর্শনোপযোগী চক্ষু চাই ।

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিভূত ভাপে ভাপিত মানবের একমাত্র শাস্তি স্থল “ভগবৎ প্রাপ্তি” সেই ভগবৎ প্রাপ্তির এক যাত্রা

উপায় “ভক্তি” আর এই ভক্তি লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় “সাদুগুণ” । সাদু ভক্তের সেবায় শ্রীভগবানের সেবা করা হয় । শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন :

“যে মে ভক্তজনঃ পার্থ নমেভক্তাশ্চ যোজনঃ ।

মদভক্তানাঞ্চ বে ভক্তা স্তেমেভক্তোত্তমামতা ॥”

অর্থাৎ, হে পার্থ । যে আমাকে ভক্তি করে সে আমার তত প্রিয় নয়, কিন্তু যে আমার ভক্তকে ভক্তি করে সে আমার ততোধিক প্রিয় । আরও বলিয়াছেন ;

“সাধবো হৃদয়ং মহং সাদুনাং হৃদয়ন্তুহং ।

মদন্যন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি ॥”

অর্থাৎ, সাদুগুণ আমার হৃদয় আমিও সাদুগুণের হৃদয় ; ভক্তগণও যেমন আমাকে ভিন্ন অন্য কিছু চায় না আমিও সেইরূপ ভক্তগণ ভিন্ন অন্য কিছুই চাই না । “অহং ভক্ত পরাধীন” আমি সম্পূর্ণ ভক্তের অধীন, ভক্ত আমাকে যখন যে ভাবে যেখানে রাখিবে আমি ভক্তের নিকট সেইভাবে সেইখানেই থাকিতে বাধ্য, ভক্তের নিকট আমার কোনই স্বাধীনতা থাকে না ।—

“ভক্তের হাতে প্রেমের ডোরি ।

যেদিক ফিরায় সেদিক ফিরি ॥”

ভক্ত ভগবানে যে কি অপূৰ্ণ সম্বন্ধ, কি অপূৰ্ণ প্রেমের বন্ধন, কি মধুরতর ভাব ভাষা ভাবিবার, বুঝিবার এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ।

সাদু ভক্তগণ যখন ভগবানের এত প্রিয়পাত্র তখন সেই ভক্তের নিন্দাবাদ করা যে কতদূর গহিত, কতদূর পাপজনক তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন । শ্রীশ্রীহরিভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল অপরাধের কথা উল্লেখ দেখিতে পাই তন্মধ্যে সাদুনিন্দাকেই সঙ্গপ্রথম ও সর্বপ্রধান অপরাধ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । এই সাদুনিন্দা বলিতে যে কেবল নিজের দ্বারা কোন প্রকারে নিন্দা করা বুঝাইবে তাহা নহে । শাস্ত্র বলেন :—“নকেবলং যো মহতোবক্তাবদন্তে শূনোতি তন্মাদপি দোহপি পাপ ভাকু ।” (কুমার সম্ভব) । নিন্দা করাতো অপরাধই অধিকন্তু অপরের দ্বারা মহতের নিন্দাবাদ শ্রবণ করাও অপরাধ ।

যে ব্যক্তি ভগবৎ নিন্দা অথবা ভগবন্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পুণ্যহীন হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় ।

যাহাতে কোনও প্রকারে উক্ত নিন্দা কর্ণমোচন না হয় সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিবে ।

শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা লাম্বু সিন্দার বিষয়ময় ফল বিশেষভাবে দেখাইতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া কেবল মাত্র ঐতিহ্যতত্ত্বাবৃত ও ঐতিহ্য চরিত্রমৃত । এক্ষণে বর্ণিত পরম তত্ত্ব হরিনাসের নিন্দা করিয়া হরিনন্দী গ্রাম নিবাসী কোন দুর্জ্ঞান ব্রাহ্মণের কি দুর্দশা হইয়াছিল তাহাই পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব । ঐতিহ্যতত্ত্ব ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

“হরিনন্দী গ্রামে এক দুর্জ্ঞান ব্রাহ্মণ ।

হরিনাসে দেখি ক্রোধে ঝোলয়ে বচন ॥

সে বিপ্রাধমে কত দিবস থাকিয়া ।

বসন্তে নাসিকা তাব পড়িল ধসিয়া ॥

হরিনাস ঠাকুরের করিলেক যেন ।

ক্লম তাঁহার শাস্তি করিলেক তেন ॥”

তক্ত কুল চুড়ামণি হরিনাস চাঁদপুরে বলরাম আচার্য্যের ঘরে থাকিবার সময় একদিন হিরণ্য গোবর্ধন মজুমদারের সভায় গোপাল চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার নাম মাহাত্ম্য লইয়া তর্ক বিতর্ক হয় । হরিনাস বলিলেন নামাভাসে মুক্তি হয় । ব্রাহ্মণ বলিলেন তাহা কখনই হয় না । এইরূপ বহু তর্ক বিতর্কের পর ব্রাহ্মণ বলিলেন ;—

“বিশ্রকহে নামাভাসে যদি মুক্তি হয় ।

তবে আমার নাক কাটা করহ নিশ্চয় ॥

হরিনাস কহে যদি নামাভাসে নয় ।

তবে আমার নাক কাটা এই নিশ্চয় ॥”

সভাসঙ্গণ উভয়ের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া হায় হায় করিয়া উঠিলেন, মজুমদার মহাশয় বিশ্রকহে বহু ভিত্ত্বার করিয়া বলিলেন তুমি হরিনাসকে অপমান করিলে তোমার নিশ্চয়ই সর্বনাশ হইবে ।

এদিকে হরিনাস ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া উঠিয়া চলিলে মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । হরিনাস, মজুমদার

মহাশয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, এই যে ব্যাপার সংঘটিত হইল হৃদয়ে তোমাদের বা ঐ তার্কিক ব্রাহ্মণের কোনও দোষ নাই দোষ কেবল ঐ ব্রাহ্মণের তর্কনিষ্ঠা মনের। নামের মহিম যে তর্কের গোচরি হৃত নয়। “বিখ্যানে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।” এই মহাজন বাক্য যে অদ্রোহ সত্য তাহা ঐ ব্রাহ্মণ কোথা হইতে জানিবে।

হরিদাস এইরূপে উহাদিগকে আশস্ত করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন মজুমদার মহাশয় সাধু নিন্দা, নাম মহাশয়্যে অবিশ্বাস প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিলেন। ক্রমে—

“তিন দিন রহি সেই বিধেয় কুষ্ঠ হইল।

অতিউচ্চ নাশাতার গলিবা পড়িল।

দেখিয়া সকল লোক হইল চমৎকার।

হরি দাসে প্রশংসি সবে করে নমস্কার।”

এখানে যদিও হরিদাস ব্রাহ্মণকে কোনও প্রকার অভিসম্পাত করেন নাই তথাপি তক্ত বাহ্মা কলতরু তক্তের অপমান সহ করিতে না পারিয়া হাতে হাতে প্রতিফল দেখাইয়া দিলেন। সুতরাং সকলেরই বাহাতে কোনও প্রকারে ভগবত্তক্তের নিন্দাবাদ না করা হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

তক্তকে নিন্দা করিলে কেহই যে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না তাহা দেখাইয়া বৃহৎ পাষণ্ড দলন গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

“বৈষ্ণব হেলন পাপ তারিতে নারিল।

মহামুনি দুর্জাদারে চক্রেতে দহিল।

সুদ্রজীব হ’য়ে করে বৈষ্ণব হেলন।

কার শক্তি আছে তায়ে রক্ষে কোনজন।

স্বপ্নপুরাণে উক্ত হইয়াছে;—

“নিন্দাং কুর্কৃতি যে মুঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।

পতন্তি পিভৃতিঃ সার্কিং মহারৌরব সংজ্ঞিতে।”

অর্থাৎ, যে মুঢ় মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে সে পিতৃপুরুষগণের সহিত মহারৌরব নামক নরকে গমন করে। কেবল বাক্য দ্বারা নিন্দা করিলেই যে অপরাধ হয় অন্য কিছুতে হয় না তাহা নহে। শাস্ত্র বলেন

“আমুজেরান্ বশোধর্ষং লোকানাবিনমেব চ ।

হস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহাবীজমহা ॥”

অর্থাৎ, মহৎ ব্যক্তির মর্যাদার হানিকর কোন কর্ম করিলে আর, বৃক্ষ, বর্ষও ইহ পরকালের গতি নষ্ট হইয়া যায় ।

ঐমতাপবতে লড়তরত বলিরাছেন ;—

“বহুগবৈত্তপস্যা ন বাতি

নচেজ্যা নিক্সিপনাদ্ গৃহাষা ।

নহন্দনানৈব জলাপি হৃদ্যা

বিদা মহৎ পাদরজোভিষেকম্ ।

অর্থাৎ, গার্হস্থ বা বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম দ্বারা কিম্বা হৃদ্যাদি দ্বৈ-
গণের পূজার দ্বারা বাহ্য লাভ করা যায় না কেবল মাত্র শুভ পায়ল বিলুপ্তি
হইয়া থাকিতে পারিলে তাহা অনার্য্যে লাভ হয় । শুভরাজ এছাদ আপন
পিতাকে বলিরাছেন ;—

“সৈব্যা মতিস্ত্য হুতুক্রমাজ্জিৎ

স্পর্শত্যানর্থীশপমো বদর্থঃ ।

মহীরনাং পাদরজোভিষেকং

মিক্কনানানং ন বুণীত বাবৎ ॥”

অর্থাৎ, হে পিতা ! মামবগণ যে পর্য্যন্ত অতিক্রম ভগবত্তের পদরজে স্তুতি
না হয় সে পর্য্যন্ত তাহারের মন কখনও ঐক্যের পাদপদ্ম স্পর্শের উপযোগী
হয় না । এইরূপ বহু বহু প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায় আর উদ্ধৃত করিয়া অবশেষ
কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা ।

অবশেষে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, কেহ যেন মহতের মিত্রা করিয়া
অপরাধি না হন । আহুন, সকলে মিলিয়া আমরা ঐতগদানের মিকট শক্তি
লাভের জন্য প্রার্থনা করি ।—ভাগবতের সহিত হুং মিলাইয়া বলি ;—

“বাক্তে মারিয়া পুষ্টা ভ্রাম ইহ কর্ম্মতি ।

তাবৎ ভবৎ প্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যারেভবেতবঃ ॥

তুলয়া মলবেদাপি ন স্বর্গঃ না পুন্ড্রবম্ ।

ভগবৎ সঙ্গি সঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাপিষঃ ॥

অর্থাৎ হে ভগবন । যে পর্য্যন্ত তোমার অশ্বটন ঘটন শাসিনী এই মার
হুং সংসারে থাকিয়া প্রাক্তন কর্ম্মকলে এই জনতে ভ্রমণ করিব ততদিন যেন
তোমার প্রিয়ভক্তগণের সঙ্গলাভে বঞ্চিত না হই, ইহাই প্রার্থনা ।

বৈকুণ্ঠ মাস্ত্রদান—হুংখী ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ।

ইযুভিঃ প্রতিবোৎস্মামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্ ।

ধর্ম-বুদ্ধ্যাবিবেকোহয়ং । দুর্ধ্যোধনাদিয়ু ভাতৃসু মচ্ছত্রগ্রহাণেণ মরিষ্যংসু কুপেরমিতি চেত্তরাহ কুদ্ভ্রমিতি । নৈতে তব বিবেককূপে । কিন্তু কুদ্ভ্রং লিখিষ্টং হৃদয়-দৌর্দল্যমেব । তস্মাত্ত্যক্তা যুদ্ধাধোস্তিষ্ঠ মজ্জীভব । হে পরতপ শত্রুতাপনেতি শত্রুহাসপাততাং মা গাঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ ।

অৰ্জুন । ক্ষত্রবজ্রের স্থায় কাতবতা কখন তোমার শোভা পায় না । যদি বল “আমার বল বীর্যের অভাব বশতঃ একপ কাতরতা নহে, কিন্তু পূজার্হ ভীষ্মাদি গুরুজনের প্রতি ধর্মগুদ্ধিপ্রাণাদিত বিবেক বশতঃ এবং দুর্ধ্যোধনাদি ভাতৃ-বর্গ আমার অস্ত্রগ্রহারে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে বলিয়া ভীষ্মদিগের প্রতি কৃপা প্রযুক্ত স্টূর্ণ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, আমি যুদ্ধের ভয়ে একপ হই নাই।” শ্রীভগবান্ যেন অৰ্জুনের এইপ্রকার ভাব অবগত হইয়াই বলিলেন—
‘সংখ্যে’ ইহা তোমার বিবেক বা কৃপা নহে, ইহা কেবল হৃদয়ের দুর্দল্যতা মাত্র, ইহা তোমায় শোভা পায় না । অবিবেকী সাধারণ ব্যক্তি যেমন নখর স্মুল দেহে গমতা বশতঃ শোক ও গোহে অভিভূত হইয়া থাকে, ইহাও সেই শোক প্রভৃতি মোহ, দেখে বিবেকী জানী পুরুষ কখন নখর স্মুল দেহের প্রতি গমতা করেন না, তাহা বা কিসে আত্মার মঙ্গল সাধিত হইবে তদ্বন্দেয়ে নিয়তই কর্তব্য কর্তৃ কর্তৃগা থাকেন । অতএব হে শূরশ্রেষ্ঠ । তুমি তোমার হৃদয়ের শোক-মোহজনিত দৌর্দল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও । হে শত্রু-তাপন ! এই ভীষণ যুদ্ধস্থানে তুমি শত্রুগণের নিকট ঈদৃশ ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের নিকট আর হাস্যস্পদ হইও না ॥ ২-৩ ॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্ ।

নহু ভীষ্মাদিসু প্রতিবোধ্যু সংহু তয়া কথং ন যোদ্ধব্যং । আহুতোন
নিবর্তেতেতি যুদ্ধবিধানাচ্চ ক্ষত্রিয়স্তেতি চেত্তদ্রাহ কথমিতি । ভীষ্মং পিতামহং
দ্রোণক বিত্তাশুরং ইযুভিঃ কথং যোঃস্তে । যদিমৌ পুজার্হৌ পুষ্পাদিত্বরত্যর্ক্যৌ
পরিহাসবাগ্ভিরপি যাভ্যাং যুদ্ধং ন যুক্তং তাভ্যাং সহৈযুভিস্তং কথং যুক্ত্যত ।
প্রতিবদ্যতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজ্যব্যতিক্রম ইতি স্মৃতেশ্চ । মধুসূদন নারিসূদনেতি
সম্বোধন পুনরুক্তিঃ শোকাবুলস্ত পুরোধারানুসন্ধিবিরহাৎ । তদ্ব্যবশ্চ ত্বমপি
শক্রনেব যুদ্ধে নিহংসি নতু গ্রাসেনসান্দীপত্যাদীন পূজ্যানিতি ॥ ৪ ॥

তাৎপর্যানুবাদ ।

শ্রীভগবানের এতাদৃশ বাক্যশ্রবনে অর্জুন বলিলেন হে মধুসূদন । যদি আপনি
বলেন, ভীষ্মাদি যখন প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ প্রার্থনায় তোমায় আহ্বান করিতেছেন,
তখন তুমি কি নিমিত্ত যুদ্ধে বিরত হইতেছ, যেহেতু ক্ষত্রিয় কখনই যুদ্ধে আক্লুত
হইয়া নিবৃত্ত হইবে না । ইহা আমি জানি, কিন্তু আপনি বলুন, আমি এই
পূজার্হ পিতামহ ভীষ্মের ও অন্ত্রবিছোপদেষ্ঠা দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের অঙ্গে
কিরূপে অস্ত্রাঘাত করিব? যেহেতু ইহারা পূজার্হ পরিহাস বাক্যেও যাহাদিগের
সহিত যুদ্ধবিগর্হিত কর্ম, পুষ্পাদি দ্বারা যাহাদিগের বন্দনা করা কর্তব্য, আজ
পুষ্পাদি উপচারের পরিবর্তে তাহাদিগের অঙ্গে কি প্রকারে অস্ত্র প্রয়োগ
করিব ।

স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত আছে “পূজ্য ব্যক্তির পূজ্য ব্যতিক্রম করিলে, শ্রেয়ঃ
প্রতিকল্প হইয়া থাকে” । অতএব হে অরিনিসূদন । আমি ইহাদিগের
সহিত কি করিয়া যুদ্ধ করিব? এখানে অর্জুন যে অতিশয় শোকাবুল
হইয়া ছিলেন, তাহা এই দুইটী সম্বোধন বাক্য হইতে বিশেষ উপলব্ধি
হইতেছে । এবং অরিনিসূদন এই সম্বোধনে যেন ভগবান্কে বলিয়া
দিতেছেন, কৈ প্রভু ! আমাকে আজ গুরু ও স্বজন হত্যা রূপ যে মহা-
পাতকে নিয়োজিত করিতেছেন, আপনি স্বয়ং কখন তো এইরূপ উগ্রসেন
বা সান্দীপনী প্রভৃতি গুরু জনের বধ কার্য্যে লিপ্ত হইবেন নাই; অগ্নিগণকেই
বধ করিয়া আসিয়াছেন । আজ আমার প্রতি এ বিপরীত বিধান কেন ॥ ৪ ॥

গুরুনহস্থা হি মহানুভাবান্

শ্রয়োভোক্তৃংক্ষ্যভৈমগীহলোকে ।

হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব

ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিক্তান্ ॥ ৫

বিদ্যাভুষণ ভাষাম্ ।

নহু স্বরাজ্যে স্পৃহা চেত্তব নাস্তি, তহি দেহযাত্রা বা কথং সেংস্যভীতি চেৎ
তত্রাহ গুরুনিতি । গুরুবধনকৃত্য স্থিতস্য সে ভৈক্ষ্যন্নং কত্রিয়াবাং নিশ্চ্যমপি-
ভোক্তৃং শ্রয়ঃ প্রশস্ততরং । ঐহিকদুর্ঘশোহেতুত্বেহপি পরলোকাবিদ্যাতিত্বাৎ ।
নরতে ভীতান্নয়ো গুরবোহপি যুদ্ধগর্জাবলেপাৎ ছন্ননা যুদ্ধভাঙ্গ্যাপহারং যুদ্ধদু-
দ্রোহক কুসৃত্যং দুর্ঘোষনাদিনাং সংসর্গেণ কার্য্যাকার্য্যবিবেক বিরহাচ্চ সংপ্রতি
ত্যাগ্যা এব। “গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজ্ঞানতঃ । উৎপথপ্রতিপন্নস্য
খরিত্যাগো বিদীয়তে।” ইতি স্মৃতেরিতি চেত্তত্রাহ মহানুভাবানিতি । মহান্
সর্ব্বোংকটোহনুভাবো বেদাধ্যয়ন-ব্রহ্মচর্য্যাদিহেতুঃ প্রভাবো ঘেষাং তান্ ।

তাৎপর্য্যানুবাদ ।

যদি বলেন তোমার রাজ্য স্পৃহা না থাকিতে পারে, কিন্তু রাজ্য ভিন্ন
দেহ যাত্রা কি প্রকারে নিস্কাহ হইবে” শ্রীমত্তগবানের এইরূপ উক্তির উদ্ভাবন
করিয়াই যেন পুনশ্চ বনিলেন,—দেখুন গুরু হত্যা হইতে বিরত হইয়া
কত্রিয়ার পক্ষে ভিক্ষাপত্র অন্ন অতি নিন্দনীয় হইলেও, ঐ ভিক্ষায়ে আমার
জীবন নিস্কাহ করিতে হয়, উহাও আমার পক্ষে পরম শ্রেয়স্তর বলিয়া
বিবেচনা করি। কারণ ইহাতে আমার ইহকালে দুর্দশা হইলেও পরলোকে
আমার অনিষ্ট হইবে না। যদি বলেন “তুমি বাহাদুরকে গুরু পরমাশ্রয়
বোধে অসম্মান করিতেছ না, ঐ ভীষ্ম দ্রোণাদি দুর্ঘোষনের পক্ষাবলম্বন
করিয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেক হারাইয়াছেন এবং যুদ্ধগর্জের ছল ক্রমে ইহারাও
ও তোমাদের প্রতি দ্রোহাচরণ ও রাজ্যাপহারণ করিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে
ইহারাও তোমার ভ্যাগের বোম্ব হইয়াছেন। বিশেষতঃ শাস্ত্র বলেন
“কার্য্যাকার্য্য বিচারাক্ষম পাপাদি অবলিপ্ত উৎপথপ্রতিপন্ন গুরুকেও ত্যজ

বিদ্যাভ্রমণ ভাষ্যম্ ।

কাল-কামাদয়োঃপি বদন্ত্যন্তেষাং তদোষসম্বন্ধো নেতি ভাবঃ । নবর্থম্ভা পরুষো দাসো দাসস্তথো ন কস্যচিৎ । ইতি সত্যং মহারাজ । বজ্রোহন্যর্থেন কৌর-বৈরিতি ভীষ্মোক্তেরর্থলোভেন বিক্রীতাত্মনাং তেষাং কুতো মহানুভাবঃ ততো যুদ্ধে হস্তব্যাস্তে ইতি চেষ্টব্রাহ্মহর্ষার্থকামানিতি । অর্থকামানপি গুরুনু হত্নাহমিহৈব লোকে ভোগানু ভুক্তীয় ন হু পরলোকে ভোগ্যবিষয়াদিত্যনু তজ্জিহ্বামিশ্রানেণ

ভোগ্যপ্যাবুদ ।

করিতে" অতএব কেন তুমি ইহাদিগের পরমার্থকে যুদ্ধে বিনষ্ট হইতেছ ? ইহাও বলিতে পারেন না ; কারণ, এই শাস্ত্র শাসন ইহাদের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না, যেহেতু ইহারা মহানুভব, বেদাধ্যক্ষ ও ব্রহ্মচর্যাগাণ্ডী অন্য অত্যন্ত বদ্ধিতপ্রভাব হইয়াছেন এবং সেই বলে কামাদিবিষয় এমন কি মৃত্যুকেও নিজবশে স্থাপন করিয়াছেন । সুতরাং ইহাদিগকে উক্ত পাপ স্পর্শ করিতেই পারে না । তথাপি আপনি, মহারাজ সুবিশিষ্টের প্রতি ভীষ্ম মহাশয়ের মুখোচ্চারণ "পুত্র্য অর্থেন দাস, অর্থ কাহাবও দাস নহে, হে মহারাজ । একথা সত্য যে আমি কুরুগণের অর্থেই বদ্ধ হওয়া অবস্থান করিতেছি" এই বাক্য অবগতন কবিয়া যদি বলেন যে, ভাগ্য যখন অর্থলোভে আসন্ন বিক্রয় করিয়াছেন, তখন তাঁহান আর মহানুভাবতা কোথায় ? কারণ লোভ অপর সকল গুণকেই নষ্ট করিয়া থাকে । অতএব এতদ লোভপদব্যা ব্যক্তি-হনন অযোগ্য নহেন এই সত্য করিত্ত আসক্তা অঙ্গ অর্জুনকে বিচলিত করিতে পারিল না, তাঁহান হৃদয় বর্কেও যেমন দৃঢ় ছিল, এখনও "আশ্রিত্যেব সবিদ্যোবা গুরুবেব চ দৈবতম্ । অমার্গহোহপি মার্গস্তো গুরুত্রেব সঙ্গা গতিঃ ॥" অর্থাৎ ওক যেমনই হউন বা কেন শিষ্যের নিকট তিন দেবতা । এই অমূল্য মুক্তি বলে তজ্জপই দৃঢ়, তজ্জন্য তিনি পুনশ্চ "গুরু" এই শব্দের উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—আমি অর্থকাম গুরুগণকে হনন করিয়া, ইহলোকেই বা কৈ তদ্ব ভোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হইতেছি ? যেহেতু উহাদের তিসাদ্বারা সমস্ত ভোগ্যই উহাদের রুধিরে প্রদীপ্ত হইতেছে, ঐ রুধির গুপ্ত ভোগ্য উপভোগে পাপই আশ্রয় করিবে, ইহাতে ধর্ম বা পরম পুরুষার্থ লাভ

ন চৈতদ্বিদ্মাঃ কতরনোগরীয়ো

যদ্বা জয়েম যদি বা নো ভয়েমুঃ ॥

যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-

স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

বিদ্যাভূষণ -ভাষ্যম্ ।

ন তু শুদ্ধান্ ভুঞ্জীয তদ্ধিংসয়া তন্নাভাং । তথা চ যুদ্ধকৰ্মাবলোপাদি মত্তেহপি
তেষাং মদুগ্ধরহমস্তোবেতি পুনর্গুরুগ্রহণেন সূচ্যতে ॥৫॥

নহু তৈজ্যভোজনং ক্রত্ৰিয়স্য বিগহিতং যুদ্ধক স্বধৰ্ম্ম বিজানন্নপি কিমিদং
বিভাষমে ইতি চেত্তত্রাহ ন চৈতদ্বিতি । এতদ্বষং ন বিদ্যাঃ-তৈজ্যযুদ্ধখোমধ্যে
নোহংসাকং কতরদৃগরীযঃ প্রশস্ততরং । হিংসা বিরহাভৈজ্যং গরীযঃ স্বধৰ্ম্মত্বা-
দুদ্বন্ধং বেতি । এতচ্চ ন বিদ্যাঃ সমাবেক্ষে যুদ্ধে বয়ং ধার্ত্তবাপ্তান্ জয়েম তে বা নো
হম্মান্ ভয়েমুরিত । নহু মহাবিক্রমিণাং ধাম্বিষ্ঠানাক ভবতামেব বিজয়ো
ভাবীতি চেত্তত্রাহ যানেবেতি । যান্ ধাওবাপ্তান্ ভীষ্মাদীন সন্ধান্ । ন প্রজী-
বিষামো অপিহুহপি নেচ্ছামঃ । কিং পুনর্ভোগান্ ভোক্তৃগিত্যর্থঃ । তথা চ

তাৎপর্য্যানুবাদ ।

হইবে না। অতএব আপনি আমার ইহলোক-নিন্দনীয় এবং পরকালে
অধোগতিস মূলাভূত এই ভয়াবহ নৃশংস কাণ্ড করিতে বলিবেন না; হহাপেক্ষা
আমার ভিক্ষাশন বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ॥৫॥

“ভিক্ষাগত্ব অন্ন ক্রত্ৰিয়ের পক্ষে বিগহিত, যুদ্ধ ক্রত্ৰিয়ের স্বধৰ্ম্ম, তুমি
ইহা বিশেষ অবগত থাকিয়াও কি জন্য একপ অন্যায় উক্তি করিতেছ”
ভ্রান্তগবান্ কর্তৃক ঈদৃশ প্রশ্নের উদ্ভাবন কবিস্যই যেন, জ্ঞান পথে অগ্রযাত্রী
অর্জুন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন; হায়! ভিক্ষাশন বা যুদ্ধ এতদ্-
ভয়ের মধ্যে কোনটী আমার বিশেষ প্রশস্ততর, তাহা আমি ধারণা করিতে
পারিতেছি না। একপক্ষে ভিক্ষাশনে হিংসাদি কোন অসৎ কাণ্ড নাই,
অথবা পক্ষান্তরে ক্রত্ৰিয়ের স্বধৰ্ম্ম বলিয়া যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ? এতদ্ভয়ের কোনটী
অবলম্বনীয়?

বিদ্যাভূষণভাষ্যম্ ।

বিজয়োহপ্যস্মাকং ফলভঃ পরাজয় এবোতি । তস্মাৎ যুদ্ধস্য ভৈক্ষ্যাৎ রায়স্বম-
প্রসিদ্ধমিতি । এবমেতাবতা গ্রহেন তস্মাদেবং বিচ্ছাত্তোদাত্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ
প্রক্কাষিতো ভূত্বান্নেন্যেবান্নানং পশ্যেদिति ক্রতিপ্রসিদ্ধমজ্ঞানস্য জ্ঞানাদি কারিত্বং
দশিতং । তত্র কিন্নোরাভ্যেনেতি শব্দমমো । অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যসোভ্যৈহিক-
পারিত্রিক ভোগোপেক্ষালক্ষণা উপরতিঃ । ভৈক্ষ্যং ভোক্তৃং শ্রেয় ইতি বন্দ-

তাৎপর্যানুবাদ ।

যুদ্ধে একপক্ষের জয় লাভ অবশ্যসম্ভাবী । হয় ধর্মে রাষ্ট্রগণের নিকট আমরা
পরাজিত হইব, অথবা উহার। আমাদের নিকট পরাস্ত হইবে ।

যদি বলেন ভোমরা মহাবলশালী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, তোমরা যখন ধর্ম্মযুদ্ধে
উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমাদের জয়ই অবশ্যসম্ভাবী, এবং ইহাই তোমাদের
ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠের পক্ষে প্রশস্ততর ।

কিন্তু হায় ! যুদ্ধে জয় বা পরাজয়ে কিছুই আসিয়া যায় না, যেহেতু জয়
বা পরাজয় এতদ্ব্যতীত আমাদের পক্ষে তুল্যই হইতেছে । যে ভাষ্য প্রভৃতি
ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিয়া আমরা আর জীবন ধারণেরই বাসনা করিনা,
সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে বধ করিয়া
যদি আমরা জয় লাভে সক্ষম হই, উহার পরিণাম পরাজয় অপেক্ষা অধিক
কষ্টজনক হইবে, কারণ এই ভাষণ স্বজন হত্যা হুঃখানলে আমরণ দক্ষীভূতের
পক্ষে রাজ্যভোগস্পৃহা সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব ভিক্ষাশন অপেক্ষা যুদ্ধ যে
আমাদের পক্ষে প্রশস্ততর নহে, ইহা স্থির নিশ্চয় ।

অর্জুনের এতাবৎ উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে “শান্ত,
দাত্ত, উপরত, তিতিক্ষু, ও প্রক্কাষিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করিবে।”
এই ক্রতিসিদ্ধ জ্ঞানের অধিকার, তৎকালে অর্জুনের উপস্থিত হইরাছিল ।

অর্থাৎ “কিং নো রাজ্যেন” (১।৩২) এই শ্লোকে শম, দম । “অপিত্রৈ-
লোক্য রাজ্যস্য” (১।৩৫) এই শ্লোকে ঐহিক ও আনুষ্টিক ভোগের উপেক্ষা
লক্ষণ উপরতি । “ভৈক্ষ্যং ভোক্তৃং শ্রেয়ঃ” এই বাক্যে সুখ, হুঃখাদি বন্দ
সহিষ্মতা লক্ষণ তিতিক্ষা এবং “কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ” এইবাক্যে

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমুঢ়চেতাঃ ।

যচ্ছেয়ঃ স্যাম্মিশিচতং ক্রুহি তন্মে

শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

বিদ্যাভূষণ ভাষাম্ ।

সহিষ্ণুত্বলক্ষণা তিত্তিকা। গুরুবাক্যদৃঢ়বিশ্বাসলক্ষণো প্রজ্ঞা তুস্তরবাক্যে
ব্যক্তীভবিষ্যতি ন খলু শরাদিশূন্যস্য জ্ঞানেহস্ত্যধিকারঃ পঙ্গুদেহিরিব কথ্যনীতি ॥৭॥

অথ তত্ত্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমা-
চার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাদিষ্কৃতিসিদ্ধাৎ গুরুপসম্বিং দর্শয়তি কার্পণ্যোতি । .যো
বা এতদক্ষয়ঃ গাগ্যাবিদিত্বাস্বাম্লোকাৎ প্রৈতি নরুপণ ইতি—শ্রবণাদ্ ব্রহ্মবিত্ত্বং
কার্পণ্যং । তেন হেতুনা যো দোষো যানেব হত্বেতি বন্ধুবর্গমমতালক্ষণ-

তাৎপর্য্যানুবাদ ।

গুরু বাক্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষণ প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হইয়াছে । ইহা
হইতে পঙ্গু প্রভৃতির কথ্যে অক্ষমতার ন্যায় শম, দমাদি প্রজ্ঞা বিরহিত
ব্যক্তির যে তত্ত্ব জ্ঞানে অধিকার নাই, তাহা দেখান হইয়াছে । এবং জ্ঞান-
মার্গে অজ্ঞানের ক্রোধান্ধতার বিষয় ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে ॥৭॥

পূর্বে অজ্ঞানের চিত্তবৈকল্য হইতে ক্রত্রিয়ের স্বধর্মরূপ যুক্ত উপলক্ষ
করিয়া সংসারে জীবের শোক মোহাদি বিবিধ দুঃখের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।
এবং পরবর্তী ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেয়স্করতা হইতে, ভোগে বিরাগ, এবং ইহলোক
কণ্ড পরলোকের নশ্বরতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

“সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বিধিপূর্বক সমিদ্ গ্রহণ করিয়া শোত্রিয়
ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে । আচার্য্যবান্ পুরুষই তত্ত্বজ্ঞান লাভ
করিয়া থাকেন ।” এই ক্রটি প্রতিপাদিত, বিষয় ভোগ বিরত শম, দমাদি
সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন প্রমাতাই যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া
সদ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং উক্ত অবস্থায় যে অজ্ঞান
উপনীত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত হইতেছে;—সৌভাগ্যবান অজ্ঞান

বিদ্যাভ্রূষণ ভাষ্যম্ ।

স্তেনোপহতস্বভাবো যুদ্ধস্পৃহালক্ষণঃ স্বধর্মো যস্য সঃ । ধর্মে সংযুতং কত্রিয়স্য
মে যুদ্ধং স্বধর্মস্তদ্বিহায় ভিক্ষাটনং চেতোবৎ সন্ধিহানং চেতোযস্য সঃ ।
দৃদশঃ সমতং ভামিদানীং পৃচ্ছানি তস্মান্নিশ্চিতমৈকান্তিকং আত্যন্তিকং যন্মে শ্রেয়ঃ

তাৎপর্যানুবাদ ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, আনন্দ চিদ্ৰূপ বিগ্রহ পরম কারুণিক ভগবান্
ক্রৌঞ্চের শরণাপন্ন হইয়া শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিয়া বলিলেন, আমি কার্পণ্য
দোষে উপহতস্বভাব ও ধর্মাবসন্নচিত্ত হইয়া আপনার নিকট দ্বিত্বাসা
কবিতেছি, আপনার পক্ষে কেন্‌টা শ্রেয়স্তর পথ, তাহা নিশ্চয় পূর্বক বাবুন,
আমি আপনার শিষ্য ও শরণাপন্ন, আমাকে কতব্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন ।

অর্জুনের বাক্যে তাহার তিনটি দোষের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। কার্পণ্য,
উপহতস্বভাব ও ধর্মাবসন্নচিত্ত । প্রথমত কার্পণ্য শব্দের আলোচনা করিলে দেখা যায়
যে, কার্পণ্য লৌকিক ও বৈদিক ভেদে দুই প্রকার । যে ব্যক্তি কোন প্রকারের
নিজ ক্ষতি স্বীকার করিতে পারেন না, তিনিই কৃপণ ।

আজ আত্মীয় স্বজনের মমতা পাশ্ছেদনে অক্ষম হওয়ায় লৌকিক নিয়মে
কৃপণতা আসিতেছে ।

বৈদিক কৃপণের লক্ষণে দেখা যায় “হে গার্গ! যিনি অক্ষর পরব্রহ্মকে না
জানিয়া, এই লোক হইতে শ্রয়াণ করেন তিনিই কৃপণ,” অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের
অজ্ঞতাই কার্পণ্য ।

এখানে অজ্ঞান যখন পাকভৌতিক দেহকেই আত্ম স্বরূপে কল্পনা করিয়া
সেই নখর দেহের প্রতি মমতা প্রকাশ করিতেছেন, দেহাতিরিক্ত আত্মা
বা সেই আত্মার কার্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে পারিতেছেন না, তখন
তৎকালে তাঁহার পর ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান যে সম্যক্ পরিষ্কৃত হয় নাই, তাহা
বেশ প্রতীত হইতেছে । সুতরাং উক্ত উভয় লক্ষণেই তৎকালে কৃপণের
ভাব রূপ কার্পণ্য অজ্ঞানে আপত্তিত হইয়াছিল ।

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্ ।

সত্যং জ্ঞং ক্রিহি । সাধনোত্তরমবশ্যং তাবিত্তমৈকান্তিকং । তুণ্ডস্যাধিনাশিত্ব-
মাত্মান্তিকত্বং । নহু পরবাগতসোপদেশস্তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুষেবাভিগচ্ছে-

তাৎপর্যানুবাদ ।

এবং উক্ত কার্পণ্য হেতু যে দোষ অর্থাৎ বাহ্য "যামেব হস্তা" এই
শ্লোকে বদ্ধবর্গের প্রতি সমতার, যুক্তস্পৃহাকপ বাহ্য কত্রিরের অতঃসিদ্ধ ধর্ম,
সেই ধর্ম হইতে বিরত হওয়ার প্রভাবের বিচ্যুতি ।

ততীয় ধর্মবিমুচ্যিত্ত, তাহার কারণ তিনি কত্রিয় হইয়া বধন, নিজে
ধর্ম, যুক্তাদি পরিত্যাগ করিয়া, কত্রিরের অযোগ্য ভিক্ষাশনকে জেয়ন্ত
বলিয়া সান্নিধ্যচিহ্ন হইয়াছেন, তখন যে সম্পূর্ণ ধর্মবিমুচ্যবস্থায় আপতিত
হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য ।

ঈদৃশাবস্থায় পতিত অর্জুনের প্রায়ে তাঁহার ঐকান্তিকত্ব ও আত্মান্তিকত্বেরই
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ।

জীব, সাধন পথে অগ্রসর হইলে, তাহার পরবর্তী ফল ভাল হইবে কি
মন্দ হইবে, তাহার বিচার করে না, তখন আমার কতব্য কর্তব্য-সাধন, ফল
বাধা হইবার তাহা হইবে । এই দৃঢ়তার সাধন গাথে অগ্রসর হইলে তদন্তর
ঐকান্তিকত্বের দ্বারা অবশ্যস্তাবিত জ্ঞান হইলে, আর বিচলিত হইবার
সম্ভাবনা থাকেনা ।

এবং জীবের অবিনশ্বর অবস্থাই আত্মান্তিকাবস্থা, অর্থাৎ যতদিন বেহে
আত্মবুদ্ধি থাকে, ততদিন আত্মান্তিক কল্যাণ বুঝিতে সক্ষম হয় না । বেহাতি-
সিক্ত জীবাত্মা আছেন সেই জীবাত্মার মঙ্গলই দেহের মঙ্গল, বিনশ্বর দেহের
কল্যাণ কামনা অকিঞ্চকর, এইরূপ জ্ঞান উপস্থিত হইলেই আত্মান্তিক অবস্থা
আসিয়া থাকে । ঐ সময় সমস্ত প্রাণের প্রতি যে অবিনশ্বর ভাব হয়, উহাই
আত্মান্তিক ভাব ।

একবে সাধন পথে আরুঢ় হইয়া অর্জুন সেই অবস্থার আশ্রয় পড়িয়াছেন
বলিয়াই তিনি প্রাণ খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মান্তিক মঙ্গলের প্রশ্ন করিলেন ।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ

যচ্ছোকমুচ্ছাষণমিন্দ্রিয়ানাং ।

অবাণ্য ভূমাবসপত্ত্বদ্বকঃ

রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্ ।

দিত্যাদি ক্রতেঃ । সখায়ং তাং কথমুপদিশামি ইতি চেত্তত্রাহ শিষ্যন্তে ২৫
মিতি । শাধি শিক্ষয় ॥৭॥

নহু তৎ শাস্ত্রজ্ঞোহসি স্বহিতং বিচার্যামুত্তিষ্ঠ । সখ্যার্মে শিষ্যঃ কথং
ভবেমিতি চেত্তত্রাহ ন হৌতি । যং কথ্য মম শোকমপনুদ্যাদ্ দ্বীকুর্থাভ্যুদয়ং
নপ্রপশ্যামি । শোকং বিশিনষ্টি ইন্দ্রিয়ানুচ্ছাষণমিতি । তস্মাচ্ছোকবিনাশায়
ত্বাং প্রপনোদ্যমীতি । ইত্থক যোহহং ভগবঃ শোচামি তৎ মাং ভবান্ শোকস্য
পারং তারয়ত্বিতি ক্রত্যাৰ্থোদশিতঃ । নহু ত্বমধুনা শোকাকুলঃ প্রপদ্যসে

তাৎপর্যানুবাদ ।

কিন্তু এ তত্ত্বোপদেশ সবলকে করা যায় না । ক্রটি বলিয়াছেন “তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে
গুরুর নিকট গমন করিয়া তাঁহার শরণ লইতে হয়, এবং গুরু শরণাগতকেই
উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন ।” সুতরাং তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে
উপযুক্ত শিষ্যের আবশ্যক । তুমি আমার সখা, বন্ধু তোমার আমি এ বিষয়ে
উপদেশ কিরূপে করিব ? এই বাক্যের উদ্ভাবন করিয়া যদি আজ
শ্রীভগবান্ উপদেশে পরাভূষ হইয়েন, তজ্জন্ত বলিলেন ;—প্রভু । আমার আপসি
কৃপা করিয়া যাহাই বলুন না কেন, আমি আপনার শিষ্য ও শরণাগত, হে
শরণাগত বৎসল ! শরণাগত শিষ্যকে গুরুর কিছুই অদেয় থাকেনা, আপসি
কৃপাপরবশ হইয়া আমার প্রকৃত কণ্ঠব্য বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন ॥৮॥

অজ্ঞান মনে করিলেন শ্রীভগবান যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ
ও মূণ্ডিত, নিজের হিতসাধন বিষয়ে স্বয়ং বিচার পূর্বক অনুষ্ঠান কর, তুমি
আমার সখা, সখার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ কিরূপে হইতে পারে ? তুমি এক্ষণে
এরূপ শোকাকুল হইতেছ, কিন্তু যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যখন সুখ সমৃদ্ধি লাভ

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্ ।

যুদ্ধাং সুখসমৃদ্ধিলাভে বিশোকঃ ভবিষ্যসীতি চেত্তত্রাহ অবাপ্যেতি । যদি যুদ্ধে
বিজয়ী স্যাৎ তদা ভূমাবসপত্নং নিষ্কটকং রাজ্যং প্রাপ্য যদি চ তত্র হতঃ স্যাৎ
তদা স্বর্গে সুরাণামপ্যাধিপত্যং প্রাপ্য স্থিতস্য মে বিশোকঃ ন ভবেদিত্যর্থঃ ।
তদ্ যথেষ্ট কৰ্ম্মজিতো লোকঃ ক্রীয়তে এবমেবাযুত্র পুনাজিতো লোকঃ ক্রীয়তে

তাৎপর্যানুবাদ ।

করিবে তখন এই আত্মীয় স্বজনের বৈনাগ জন্ম শোক অগ্নীত হইবে ।
এইরূপ ভগবৎকৃতির কল্পনা করিয়াই যেন অধিকতর কাতর ভাবে বলিলেন,
হে শরণাগত বৎসল প্রভু । হায় কি কৰ্ম্ম করিলে যে আমার শোক দূরীভূত
হইবে তাহা আমি আদৌ বৃত্তিতে সক্ষম হইতেছিলাম, শোকে আমার ইন্দ্রিয়-
গণকে বিশেষিত করিয়াছে, মানব ইন্দ্রিয়বলে দর্শনাদি করিয়া, অন্তরঙ্গিয়
মনের সাহায্যে বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সদস্য কাণ্ডে প্রবর্তিত হইয়া
থাকে, আজ আমার সে অবস্থা নাই, ইন্দ্রিয় পরিশোধক এই শোকের নিবারক
উপায় দেখিতে পাইতেছিলাম, তজ্জন্যই আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি
আপনি আমায় উপেক্ষা করিবেন না । ইহা দ্বারা “হে ভগবন । আমি শোক-
যুক্ত হইয়াছি তুমি আমাকে এই হস্তর শোক-সমুদ্ভের পরপারে লইয়া চল ।”
ইত্যাদি ঋতির তাৎপর্য প্রকাশ করা হইয়াছে, যদি বলেন যুদ্ধে বিজয় লাভ
করিলেই শোক দূরীভূত হইবে, তাহাও মনে হয়না, কারণ যুদ্ধে জয়লাভ
করিলে অসাপত্ন্য নিষ্কটক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও শোক আমার পরিত্যাগ
করিতেছেন, কিম্বা যদি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হত হই, তাহা হইলে
স্বর্গ রাজ্যে দেবতাদিগের আধিপত্য লাভ করিয়া অবস্থান করিলেও শোক
পরিহারের সম্ভাবনা দেখিলাম, কারণ তখনও স্বর্গভোগের অবস্থানে আবার
কোন লোকে আসিয়া জন্ম লইতে হইবে স্বর্গ অবিনশ্বর নহে ঋতি বলেন
ইহী অগতে কেবল কৰ্ম্মের দ্বারা লব্ধ বস্তুর যেমন ক্ষয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ
পুণ্যার্জিত স্বর্গাদি লোকেরও ক্ষয় হইয়া থাকে ।” সুতরাং যুদ্ধ লব্ধ-কি ঐহিক,
কি পারত্রিক কোন সুখই আমার শোকাপনোদনে সক্ষম হইতেছে না ।

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তা হৃষীকেশঃ গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ ।

ন যোৎস্ন ইতি গোবিন্দমুক্তা তুম্বীং বভূব হ ॥৯॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্ ।

ইতি ক্রতেনৈহিকং পারত্রিকং বা যুদ্ধলব্ধং সুখং শোকাপহং তন্মাতৃদৃশমেব
শ্রেয়স্তং ব্রহ্মীতি ন যুদ্ধং শোকহরং ॥৮॥

ততোহজ্ঞানঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্তেতি । গুড়া-
কেশো হৃষীকেশঃ প্রতি এবং নহি প্রাপশ্যামৌ-ন্যাদিনা যুদ্ধস্য শোকানিবর্ত-
কত্বমুক্তা পরন্তপোহপি গোবিন্দং সর্ক্সবেদজ্ঞং প্রতি ন যোৎস্ন ইতি চোক্তেতি
যোজ্যং । তত্র চবীকেশবাদ্ এতদ্বিৎ যুদ্ধে প্রবর্তিষ্যতি । সর্ক্সবেদবিদাদ্ যুদ্ধে
স্বধর্ম্মং গ্রাহয়িত্বাতীতি ব্যজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রহৃদি সংজ্ঞাতা পুত্ররাজ্যাংশা নিরস্যতে ১৯

তাৎপর্যানুবাদ ।

অতএব আপনি আমাকে এমন কোন শ্রেয়স্কর উপায় বলিয়া দিন যাহাতে
আর আমাকে-শোকের বশীভূত হইতে না হয় ॥৮॥

অজ্ঞানের এই উক্তি শ্রবণে যদি রাজ্যলোলুপ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণের
রাজ্যাংশ মনে মনে কল্পনা করেন, তাই সঞ্জয় মহাশয় তৎপরবর্ত্তি ঘটনার
বিবরণ প্রকাশান্তিমানে বলিলেন,—পরন্তপ জিতেন্দ্র অজ্ঞান, প্রথমে রাজ্যাপহারী
আত্মীয়বধে হতবাক্যের পুনরুদ্ধার কর্তব্য মনে করিয়া যুদ্ধোজ্জ্বল হইয়াও, পরি-
শেষে পর্যালোচনা দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্বোক্ত প্রকারে যুদ্ধে শোক
অপরিসীম জ্ঞাপন করিয়া একেবারে যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ পূর্বক “হে গোবিন্দ !
আমি যুদ্ধ করিব না” বলিয়া তুম্বীন্তাব অবলম্বন কবিলেন ।

এখানে শত্রুতাপী ও জিতেন্দ্র এই বিশেষণ হইতে অজ্ঞানের সংঘম ৭
ক্ষমতার বিষয়, এবং গোবিন্দ ও হৃষীকেশ এই উভয় পদ হইতে যেন দ্রুত
রাষ্ট্রকে বলিয়া দিলেন, হে পুত্র ! তুমি বুধা আশায় আশস্ত হইও না, সর্ক্সবেদ
তত্ত্ববেত্তা হৃষীকেশের পক্ষে অজ্ঞান সদৃশ সংঘমী যোদ্ধাকে যুদ্ধই যে তাহার স্বধর্ম্ম-
তাহা বুঝাইয়া যুদ্ধে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে অধিক বিলম্ব হইবেনা ॥৯॥

তমুবাচ জয়ীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তুমিদং বচঃ ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশোচ্যান্মশোচন্তুং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।

গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

বিদ্যাত্মবণ ভাষাম্ ।

ব্যঙ্গমর্থঃ প্রকাশয়রাহ তমুবাচেতি । তং বিষীদন্তুমর্জ্জুনং প্রতি জয়ীকেশো ভগবান শোচ্যানিত্যাদিকমভিগন্তুরাৎ বচনমুবাচ । অহো তবাপীদৃগ্ বিবেক ইতি সধ্যভাবেন প্রহসন্ অনৌচিত্যভাবিভেন ত্রপাসিকৌ নিমজ্জয়ম্ভিত্যর্থঃ । ইবেতি ভগব শিষ্যতাং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাসানৌ চিত্তাদিবদধরোজ্জ্বলং কুর্ক-
ম্ভিত্যর্থঃ । অজ্জুনস্য বিষাদো ভগবতো তস্যোপদেশশ্চ সর্বসাক্ষিক ইতি বোধয়িতুং সেনয়োরুভয়োরিত্যেতৎ ॥১০॥

এবং অজ্জুন ভুক্তোং স্থিতে তদবুদ্ধিমান্ধিপনু ভগবানাহ অশোচ্যানিতি হে অজ্জুন ! অশোচ্যান্ শোচিতুমযোগ্যান্ এব ধাতুরাষ্ট্রাংস্ত্বং অবশোচঃ শোচিত্তে তাৎপর্য্যানুবাদ ।

সঙ্কল্প মহাশয় হস্তরাষ্ট্রকে এই ব্যপোক্তি দ্বারা ভাবি বিষয়ের অবতারণা করিয়াই যেন বলিলেন, উভয় পক্ষীয়সৈন্য মধ্যে সকলোক সমক্ষে বিবাকে মুহূর্ত্তান অজ্জুনকে তৎকালে শ্রীভগবান্ সংগত হইয়া যেন বলিলেন, এখানে ভগবানের হাস্যের তাৎপর্য্য যেন—অহো ! কি আশ্চর্য্য তোমারও এমন বিবেক আসিয়া উপস্থিত হইল যে, বিবেকের বশীভূত হইয়া তুমি এমন অযৌক্তিক কথার অবতারণা করিতেছ । এই বলিয়া অজ্জুনকে লজ্জা-সিদ্ধিতে নিমগ্ন করিয়া গিলেন । ভগবান হাস্য না করিয়া হাস্য ভাবই যেন, প্রোকেয় এই “ইব”র তাৎপর্য্য । অজ্জুন এখন আর কেবল সধা নহে শিষ্য, শিষ্যের নিকট হাস্য করা গুরুত্ব কর্তব্য নহে, সে কারণ ঈষৎ অধরের উল্লাস দ্বারা তাহাকে লজ্জিত করাই এখানে ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে ॥১০॥

অর্য্য মরণাদি শোক পরিক্রিষ্ট মানব এই জগতে নিরত নব নব আশার কুহকে গতিত হইয়া অধের পরিবর্তে কতই না দুঃখ ভোগ করিতেছে ? আশা দ্বারা

বিদ্যাত্মক ভাষ্যম্ ।

বানসি । তথা হাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতামিষ বচনানি দৃষ্ট্বেয়ং স্বজনমিত্যা-
দীনি, কথং ভীষ্মমিত্যাদীনিচ ভাষ্যে । ন চ তে প্রজ্ঞালেশোহপ্যন্তীতি ভাঃ
যে তু প্রজ্ঞাবত্তন্তে গতাস্থন্ নির্গত প্রাণান্ স্থূল দেহান্ অগতাস্থংচানির্গত
প্রাণান্ হৃদদেহান্ চ শকাদাস্থান্চ ন শোচন্তি । অয়মর্থঃ । শোকঃ স্থূলদেহ
বিনাশ নিমিত্তঃ । হৃদদেহবিনাশ নিমিত্তো বা । নান্যঃ স্থূলদেহানাং বিনাশি

তাৎপর্যানুবাদ ।

স্থূলের বলিয়া আকাজ্জার বশে তাহার অবেষণে ধাবিত হইতেছে পরক্ষণে আবার
তাহাই মহাহুঃখে পর্যাববিত হইতেছে, কিন্তু আশার বা আকাজ্জার নিবৃত্তি নাই।
এই ভ্রমাক মানবকুলকে প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়া তাহার হৃথ কি ? কিম্ব এই
হুস্পার দুরাশ। সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আকাজ্জিত প্রকৃত স্থখ লাভে সক্ষম হইতে
পারে, তাহার উপাধি বিধান জন্য যে গীতা শাস্ত্রের অবতারণা, এই শ্লোক
হইতেই তাহার সূচনা। শ্রীভগবান এই শ্লোক হইতে তাঁহার উপদেশানুসৃত
বর্ণন করিয়া ত্রিভাপ দক্ষ জীবের জ্ঞান। নিবারণ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ যখন দেখিলেন অর্জুন বিষাড়ে তুষ্ণীভাবাবলম্বন করিয়া
যথার্থই যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ করিলেন, তখন উহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,
হে অর্জুন ! যে ধ্বংসাত্তনয়গণ শোকের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তুমি তাহাদের বিষয়ে
অনুশোচনা করিতেছ কেন ; কেবল শোক নহে, আমাব উপর প্রকৃষ্ট জ্ঞানী
ব্যক্তির ন্যায় জ্ঞানগর্ভ বাক্য প্রয়োগও করিতেছ। কিন্তু আমি দেখিতেছি
তোমার জ্ঞান দূরের কথা, জ্ঞানের দেশ যাত্রাও নাই। দেখ প্রকৃত জ্ঞানী
ব্যক্তি বিগত-প্রাণ স্থূল দেহ বা অবিগত-প্রাণ হৃদ দেহের এবং আত্মার বিষয়ে
শোক করেন না। কারণ স্থূল বা হৃদ কোন দেহের বিনাশ অন্য শোক ?
যদি স্থূল দেহের বিনাশ অন্যই এই শোক বল, তাহা সঙ্গত হয় না, যেহেতু
স্থূল দেহ যে অবিনাশী নহে, ইহার বিনাশ যে স্থির নিশ্চিত তাহা আপামর
সাধারণের পরিজ্ঞাত। যদি হৃদ দেহের বিনাশ অন্য শোক উপস্থিত হইয়া
থাকে, তাহাও অসঙ্গত হইতেছে কারণ মূর্তির পূর্বে হৃদ দেহেরও বিনাশ
হইয়া থাকে, নতুবা জীবের মূর্তিই হয় না। তৃতীয় আত্মা ; যদি আত্মার

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন হং নেমে জনাধিপাঃ ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বৈ বয়মতঃ পরম্ ॥১২॥

বিদ্যাভ্রুষণ ভাষাম্ ।

তাই। নাস্ত্যঃ হৃদ্যদেহানাং মুক্তেঃ প্রাগ্‌বিনাশিত্বাৎ । তদ্বতাং আত্মনাং তু
ষড়্‌ভাববিকারবর্জিতানাং নিত্যত্বাৎ শোচ্যতেতি । দেহাস্ত্বস্বভাববিদ্যাং ন
কোহপি শোকহেতুঃ । স্বদর্থশাস্ত্রাদ্ব্যর্থশাস্ত্রস্য বলবত্ত্বমুচ্যতে তৎ কিং ততোহপি
বলবত্তা জ্ঞান শাস্ত্রেণ প্রত্যাচ্যতে । তন্মাদিপোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পামরসাধারণঃ
পণ্ডিতস্য তে ন যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥১১॥

এবমস্থান শোচিত্বাদপাণ্ডিত্যমর্জুনিম্যাপাদ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুং নিয়োজিতাশ্চলিং
তৎ প্রতি সৰ্বৈশ্চরো ভগবান্ নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং
যো বিদধ্যতি কামানিতি ঋতিসিদ্ধং স্বম্বাজ্জীবানাক্ পারমার্থিকং ভেদমাহ, ন
ত্বেবাহমিতি । হে অর্জুন ! অহং সৰ্বৈশ্চরো ভগবান্ ইতঃ পূর্বস্মিন্নাদৌ

তাৎপর্য্যানুবাদ ।

জন্য শোক উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাও হইতে পারেনা, যেহেতু আত্ম-বিকার-
শূন্য, দেহের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণতি, ক্ষয় ও বিনাশ রূপ (জায়তে অস্তি
বর্দ্ধতে পরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি) ষড়্‌বিকার আত্মার নাই, আত্মা নিত্য
অবিনাশী । সুতরাং দেহ বা আত্মার স্বভাব যিনি পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহার
শোকের কোন কারণই নাই । পূর্বে ছুমি আমাকে অর্থ শাস্ত্র ও ধর্ম শাস্ত্রের
দৃষ্টান্তে ধর্ম শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছি, কিন্তু আমি তোমার যে জ্ঞান শাস্ত্রের
কথা বলিলাম এই জ্ঞান শাস্ত্র অর্থ বা ধর্ম শাস্ত্রের উভয় বাক্যেরই নিরাস
করিতেছে । তোমার মত ধী-শক্তিসম্পন্ন কর্মী পুরুষের এই অজ্ঞজানোচিত
শোকের অবিষয়ে শোক করা সম্পূর্ণই অযোগ্য ॥১১॥

এই রূপে সেই সৰ্বৈশ্চর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোকের সম্পূর্ণ অযোগ্য বিষয়ে
শোক করার অর্জুনের অজ্ঞতা ব্যাপন করিয়া, তত্ত্বজ্ঞান পিপাসু নিয়োজিতাশ্চলি
অর্জুনের লক্ষ্য করিয়া, বহুনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য, বহুচেতনেরও যিনি
চেতন, এক হইয়াও যিনি বহুর কামনা পূরণ করিয়া থাকেন, এই ঋতি

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্ ।

কালে জাতু কদাচিৎসামমিতি ন অপিত্যমগেব । তথা তুমচ্ছুনো নানীরিতি ন
কিঙ্কায়ীরেব । ইমে জনাধিপা রাজানো নামমিতি ন কিত্তাসমেব । তথেষঃ
পরশ্মিন্নন্তে কালে সর্কে বয়ং অহং তৎ ইমে চ ন ভবিষ্যাম ইতি ন কিত্ত
ভবিষ্যাম এবোত । সর্কেবরবজ্জীবানাক ত্রেকালিকসত্যযোগিত্বাভাবরকো ন

তাৎপর্যানুবাদ ।

প্রতিপাদিত বহু চেতনের চেতিয়তা ত্রিগুণতের সর্কবিধ কামনার পুন্নপ কর্তা;
ত্রুপাদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর আমি, এহ আমার সহিত জীবের ভেদ নিত্য পার-
মাণিক ভেদ । জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ কজিত ভেদ নহে । এই বিষয়
প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—হে অর্জুন ! এই
সর্কেশ্বর ভগবান আমি যে ইহার পুরুষও কালে ছিলাম না, এমন নহে, কিন্তু
আমি পূর্বেও ছিলাম, “পূর্বে মেবাহামহাসং” এই প্রাতি আমার পূর্ক কালের
অবস্থিতির বিষয় ঘোষণা করিতেছে, “অজরো বহুত্ব্য” ইত্যাদি প্রতীত আমার
অজরাতের ও বিগতনাশের বিষয় বলিয়া দিতেছে, সুতরাং পরবর্তী কালেও
আমি থাকিব । এইরূপ তুমি যে অর্জুন অর্থাৎ তোমার যে জীবাত্মা আজ
অর্জুন আখ্যায় আখ্যাত হইতেছে এই আত্মা যে, কোন দিন ছিল না, তাহা
মনে করিওনা, তুমিও ছিলে, আর এই যে সমুদয় রাজন্য বর্গকে অবলোকন
করিতেছ ইহারাও যে ছিলেন না তাহা নহে । এবং হহার পরবর্তী কালে আমি
তুমি সা ইহারা সকলে যে হইব না, তাহা নহে, আমরা সকলেই পুনরায় হইব ।
অতএব সর্কেশ্বর জীব নিয়তা আমার ন্যায়, জীবও পূর্কে ছিল এখন আছে এবং
ভবিষ্যতেও থাকিবে, সুতরাং ত্রিকালেই স্বাহার সত্তা বিদ্যমান, এমন জীবের
জন্য শোক করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারেনা ।

যদি বল জীবের এই ভেদের কথা ভগবান্ বাহা বলিলেন, ইহা ব্যবহারিক
জ্ঞানের অবিদ্যা বিজৃড়িত কজিত ভেদকে অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে, ইহা
কজিত ভেদ । অর্থাৎ ইহার অবিদ্যা জন্য ভেদের কল্পনা করেন তাহার বলিয়া
থাকে ।

“ভক্তি-গ্রন্থাগার।

—:০৪—

আমরা সর্বসাধারণের মধ্যে সাহায্যে ধর্মতাব বিশেষ ভাবে
জাগরিত হইয়া উঠে, তজ্জন্য নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ কেবলমাত্র
সামান্য মুদ্রণব্যয় লইয়া গ্রাহকগণকে দিয়া থাকি। অর্থাভাব
প্রযুক্ত এতদিন ইচ্ছামুরূপ কার্য্য করিতে পারি নাই এক্ষণে
ধীরে ধীরে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহার উন্নতি
বিধান-জন্ম ধর্মপ্রাণ বঙ্গবাসীর দ্বারে সাহায্য প্রার্থী। গ্রন্থা-
গারের উন্নতি বিধান-কল্পে যিনি সাহা কিছু দান করিবেন তাহাই
‘আমরা সাদরে গ্রহণ করিব এবং যথাকালে “ভক্তি” পত্রিকার
অনুপ্তি-স্বীকার করিব। বিশেষ বিবরণ নিম্নলিখিত পত্র
লিখিলেই জানিতে পারিবেন। সাহায্য দাতাগণ নিম্নলিখিত
ঠিকানায় যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়া আমাদেরকে উৎ-
সাহিত করুন, ইহাই বিনীত নিবেদন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা,—ম্যানেজার “ভক্তি-গ্রন্থাগার”

কোড়হাট “ভক্তি-নিকেতন”

পোঃ আন্দুল-মোড়ী, বাণ্ডা।

“ভক্তির ১৫শ বর্ষের নিয়মাবলী।”

—:—:—

“ভক্তি” বর্ষ-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। প্রতি বাংলা মাসের প্রথমেই যথা নিয়মে প্রকাশ হয়। বাৎসরিক মূল্য সভাক সর্বত্র ১৪০ দেড়টাকা ছিঃ পিতে ১৪/০ একটাকা নয় আনা; নমুনা একখণ্ড ৮০ তিন আনা, ১০২০ সাল ভাদ্রমাস হইতে “ভক্তি”র ১৫শ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

২। “ভক্তি”তে রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ হয় না। বর্ষ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, সম্পাদকের আদেশানুসারে ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রবন্ধ প্রকাশ জন্ত কেহ অনুরোধ করিবেন না। ক্রমশঃ প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধের সমগ্র পাণ্ডুলিপি হস্তগত হইলে তবে প্রকাশ আরম্ভ হয়। প্রবন্ধ লেখকগণ প্রবন্ধের নকল রাখিয়া দিবেন, কারণ অমনোনিত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়ার নিয়ম নাই। পত্রের উত্তর প্রার্থী রিপ্লাইকার্ড বা টিকিট পাঠাইতে ভুলিবেন না।

৩। “ভক্তি”তে বিজ্ঞাপন প্রকাশের বিশেষ বিবরণ পত্র দ্বারা অথবা সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হউন। সাধারণতঃ কভারের ৪র্থ পেজ প্রতিবারে ৩ তিন টাকা, ৫র্থ ও ৬র্থ পেজ প্রতিবারে ২৪০ আড়াই টাকা তদুত্তর ক্রমের প্রতি পেজ ২ হই টাকা, অর্ধপেজ ১০ এক টাকা চারি আনা। বৈশীদিন হারী ~~সমগ্র~~ বিজ্ঞাপনের পরিমাণ বেশী হইলে পৃথক বন্দোবস্ত করা হয়। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিয়া সর্বিশেষ অবগত হউন।

৪। ভক্তি-সম্বন্ধীয় টাকাকড়ি, প্রবন্ধ, চিঠি পত্র এবং বিনিময় ও সমা-
লোচনার্থ পুস্তকাদি সমস্তই দিয়া লিখিত নূতন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ঠিকানা,—ম্যানেজার “ভক্তি”

ঝেড়েহাট “ভক্তি-নিকেতন,” পোঃ আম্দুলমোড়ী, হাওড়া।

দি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে,—

শ্রীঅবোধচন্দ্র কুণ্ড দ্বারা মুদ্রিত।
